মৌন নূপুর

সুশীল ঘোষ

মিত্রালয়
১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র
শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' নামে তরুণের স্বপ্নে
প্রকাশিত হয়েছিল

লেখকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ এই দিনটি
শ্রীমালবিকা দত্ত
শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
শ্রীসুনীলকুমার ধর
শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য
শ্রীদয়ালচন্দ্র দাস

মৌন নূপুর

শীলা মজুমদার নিজের নামটা বাঁকিয়ে বানান করত—ইংরেজের কেতায়। 'শীলা'র দীর্ঘ ঈ কারটা ই-আই দিয়ে, মজুমদার সুরু করত এম ইউ জেড আর শেষ করত ডি ই আর। নামের বানানে যার অতো কলা কৌশল—সে এই হিসেবটা ভুলে যেতো যে জু বানান দাঁড়ালো জেড আর দুটো 'ও'তে। যা আমাকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—ওটার সঙ্গে আলীপুরের সম্পর্ক নিবিড়। সেখানে খাঁচায় বন্দী বাঘিনী আছে—কাচের ওপাশে নাগিনী। আবার এও মনে করিয়ে দিত, দুটো 'ও'—মানে দুটো শূন্য। শূন্য দুটো নাম্বার ওয়ান বরাবর। মানুষটার মাথায় যেমন একটা শূন্য আর হার্ট যদি বুকে থাকে সেখানে আর এক।

পরিচয়ের শেষের দিকে একদা শেষের ডি-ই-আর এর মধ্যে একটি 'এ' বসিয়ে দিয়েছিলাম। আর বিপদে পড়েছিলাম। সে কথা থাক।

নামের বানানটা অনাবশ্যক দীর্ঘ করে রেখেছিল বলে দু' একটা জিনিষ ছেঁটে বাদ দিতে হয়েছিল ওকে। সেও মেয়ে-ইংরেজের কেতায়। যেমন চুলের ঝুল। ওটা শীলা ঘাড়ের নিচে নামতে দিত না।

সাবান শ্যাম্পু পড়ে সে কেশ সবদা কেশর হয়ে থাকত। মুখের চারপাশে রচনা করে রাখত কালো চিকন জ্যোতির্বলয়। দেবীর জ্যোতির্ময়তা নাকি! কে জানে।

ইংরেজের অনুকৃতিতে আর একটা জিনিষ যা ছেঁটে ফেলেছিল ও—সেটা হচ্ছে শাড়ীর আঁচল। ছেঁটে ফেলেছিল বলা ঠিক হল না—ওটা ওর ছিলই না। শাড়ীই পরত না তার আঁচল থাকবে কি। বাইরে স্ল্যাকস কোট আর টুপি—বাড়ীতে ঢিলা পায়জামা, নয় শালোয়ার আর পাঞ্জাবী। অতিথি অভ্যাগত এলে তাদের খাতিরে উড়ুনী একখানা। কালো রং-এর। নইলে হাল্কা কোন রং। এ কাঁধ থেকে ও কাঁধে যাবার পথে বুকের ওপর চওড়া 'ভি'-এর রচনা।

জিজ্ঞেস করবার অবকাশ হয়েছে, জিজ্ঞেস করেছি : বাঙালিনী আপনি, বীতরাগ কেন এতো বাঙালীর পোশাক-আশাকে। ছাঁটাই কেন চালে-চুলে?

বলত না সহজে কিছু—হাসত বা অল্প। বিশেষ জোর করলে হয়তো

কিছু বলত—সেটা উত্তর হত না, হত ভদ্রতা রক্ষা। বস্তুত : বাহুল্যই বা কেন—তাও তো লেখে নি বেদ কোরাণে! বাড়তি খানিকটা আঁচল দুলবে কেন হাওয়ায়!

সঙ্গে সঙ্গেই বলে ফেলেছিলুম মনে পড়ে : আশ্রয় দেবার জন্য কারোকে—

কৌতুক না কালো জহর জানি না—কিছু একটা নেচে উঠেছিল ওর চোখে। আগুন কালো হতে জানে, থাকতে পাবে তার শিখা—ঐ দেখলুম। সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরি দেখি নি ওর চোখে।

বললে : কাকে? কানা খোঁড়া অন্ধ আতুরকে?

: না—এই, নিরাশ্রয়কে। নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ, আর কি!

এর পর—অবশ্যই উত্তর পাবার কথা নয় আব।

আরো একদিন চুলের কথা জিজ্ঞেস করে জবাব পেয়েছিলাম : কি হবে তেল, সময়, পরিশ্রম, যত্নের অপব্যয় করে! প্রতিদিন দুবেলা এর যে কোন একটার ঘাটতি পড়লেই তো জটের নিমন্ত্রণ। বেখে ওব আদিখ্যেতা বাড়তে দিয়ে কোন চতুর্বর্গ ফল তো দেখি নে—

: সৌন্দর্য একটা জিনিষ, যার চর্চা মা ঠাকুমারা করে আসছেন—সেই উর্বশীর যুগ থেকে।

: মা ঠাকুমাকে ডাইরেক্ট হিট করতে চাইনে, তবে উর্বশী নামটার মধ্যে কায়দা করে লুকিয়ে আছে বশীকরণ কথাটা। এটা মানবেন নিশ্চয়ই। সমস্ত দিক থেকে সরিয়ে এনে পুরুষের চোখ আর আকর্ষণ নিজের এই দেহটার খোপে খোপে কেন্দ্রিত করা। লাভ? পুরুষের কাজ নষ্ট, তামাম দুনিয়ার অগ্রগতির পথে সৃষ্টি করা প্রতিবন্ধক। আর নিজেরও সদাসর্বদা চেষ্টা—কি করে আরো লোভনীয় করে তোলা যায় নিজেকে। চেষ্টা মানেই সময়, অর্থ, চিন্তার বাজে খরচ! দরকার?

নিজেকে লোভনীয় আকর্ষণীয় করতে চায় না কেউ—তা আবার মেয়ে এবং অল্পবয়সী!—এই প্রথম দেখলাম। অবাক হয়ে বলেছিলাম : একদিকে এই লোভ আর আকর্ষণ। আর একদিকে তাতে আকৃষ্ট হওয়া। এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে সৃষ্টির রহস্য। আর সৃষ্টির বীজ। সৃষ্টির আদি থেকেই এই লীলা চলেছে। কিন্তু সবাই যদি ভাবেন আপনার মতো, লোপ পেয়ে যাবে যে সৃষ্টি!

হেসে অভয় দিয়েছিল শীলা : চিন্তা নেই। আমার মতো ভাববেন না

কোনো মেয়ে। আশ্রয় আপনি পাবেনই—কারো না কারো আঁচলের ছায়ায়। কতো আঁচল তৈরী আছে আপনার মতো কৃতীকে আশ্রয় দেবার জন্যে। নাও যদি থাকে, টেনে টুনে আপনিই নেবেন জোগাড় করে—

এমনি করে বাহুল্য বর্জনের বহু আভাসই অনেক দিন থেকে পেয়ে আসছিলাম। জামায়-কাপড়ে, কেশে-বেশেই নয় শুধু। জীবনেও।

যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত—তাই বাহুল্য, এই ছিল ওর মত।

কিন্তু প্রয়োজনের সংজ্ঞাটা তৈরী করে যে-মন, সেটা যে বদলশীল। তার যৌবন আছে, বার্ধক্য আছে, হয়তো জরাও আছে—এই খবরটা জানা ছিল না বলেই মনেও ছিল না শীলার।

সে কথাও থাক।

এ সব জিজ্ঞাসাবাদ হত বেশী অপিসে বসেই।

ডান করতলে ভাগ্য রেখাটা পরীক্ষা করতাম মাঝে মাঝেই। দেখতাম—বেশ মোটা স্টার্ট নিয়ে সরু হয়ে গেছে শেষের দিকটায়। লাইফ লাইন না কি বলে—ধাক্কা খেয়েছে তাতে। সেখানেই ধারাটি নষ্ট হয়েছে। প্রস্থে শীর্ণ হয়েছে। বয়েছে অন্যখাতে—আরো সরু হয়ে।

মনে মনে তাই স্থির জানতাম—প্রোমোশান আর আমার ভাগ্যে নেই। ছেলেবেলায় হরিদ্বারের এক সাধু আমায় দেখামাত্রই ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন কিছু। আশ্বাস দিয়েছিলেন অনেক কিছুর। আশা ছিল, কিছুও যদি ফলে—ফলে যদি একাংশও। ফলে নি। ফুলই ধরে নি। তার ফল ফলবে কি। কপাল চকচক করছে টাকের প্রশস্ততায়। ঐ পর্যন্তই।

যে কোন সাধুই বাংলাদেশে আসতেন, নেহাত আসানসোলের ওপার থেকে এলেই বলতেন—আসছেন হরিদ্বার থেকে। এই দেখেছি ছেলেবেলায়। আর তাঁরা যে কোন কারণেই ভিক্ষা যদি গ্রহণ না করতেন তবে তো কথাই নেই। লিখে রাখো তাঁর বাণী মনের খাতার পাতায়। জেনে রাখো ফলবেই। মিলিয়ে নিও বছরের পর বছর।

আমিও যদি তাই জেনে রেখে থাকি, অসাধারণ কাজ করি নি কিছু।

তাঁর গোটা কতক কথার একটি হচ্ছে—বুড়ো বয়সে স্ত্রী-ভাগ্যে ধন প্রাপ্তি। সব ফলের আশাই বিনাশ হয়েছে অঙ্কুরে। যাচাই করে নেবো এই একটিকে, সব শেষটিকে। ইচ্ছাটা তাই। ফ্যামিলি কোয়ার্টার পাবার যোগ্য হলাম না আজো। পড়ে আছি ব্যাচিলার্স মেসে।

কাজেই শীলার সাথে কথাবার্তা হত অপিসে বসেই।

মজুমদারের বাংলোতেও কালে ভদ্রে। সন্ধ্যেবেলায়।

শীলা কিন্তু আসামাত্রই বাংলো পেয়ে গেল। দেখুন পক্ষপাত! আমি পড়ে পচছি—দু-রুমওলা ফ্ল্যাটে, তা বছর দুই হল! মেয়ে কিনা! এসেই ও পাঁচ-রুমওলা আলাদা বাংলো পেয়ে গেল। হাতাওয়ালা পাঁচ কামরার বাড়ী। কি করবে ও অতোবড়ো বাংলো দিয়ে! তবু কম্পেনী ওকে দিল অথচ অফিসার হিসেবে ও তো মোটে আমার একটি ধাপ ওপরে। আর সিনিঅর হিসেবে আমি ওর দু-বছরের।

অবশ্য ওপরে বলতে আবার বসে আমারই মাথার ওপরে। আমার ভাগ্য রেখার মাথার ওপরে বসে আমার ন্যায্য দাবীকেও দাবিয়ে রেখেছে যেন। মাথা তুলতে দেবে না আর।

তাই যদি না হবে তবে এতো ডিপার্টমেণ্ট থাকতে আমার মাথার ওপরেই বা বসিয়ে দেবে কেন শীলাকে। ভেকেন্সি তো আরো দু-একটা অপূর্ণ আছে হেথা হোথা। আমার মতন অপূর্ণ-সাধওয়ালা লোকের সংখ্যা অবশ্যই ভেকেন্সির সংখ্যার চারগুণ। ভেকেন্সির অপূর্ণতা পুরোবার জন্য আমরা তো বসে আছি হাত ধুয়ে! দিচ্ছে কৈ? এতোই অযোগ্য আমি! মোটেই নই—

তাই বলছিলাম, ভাগ্যরেখার দৌড় জেনেছি ভালো করেই। অবশ্যই প্রোনোশানের পরিপ্রেক্ষিতে! এখন বাকি আছে দেখা, স্ত্রী-ভাগ্যে ধন প্রাপ্তির ভবিষ্যৎ বাণীর দৌড়।

সেখানে শীলার নিজের জীবনেই তো ভেকেন্সি আছে।

আমি ওর নিচে, শীলা আমার ওপরে—এ এক অসহনীয় পরিস্থিতি। আমি পুরুষ, ও মেয়ে—আমার সব কিছু ভুল চুক ত্রুটি ভুলে থাকতে পারি, ভুলতে পারি না এই কমপ্লেক্স। ও মেয়ে হয়ে ওপরে, আমি বেটাছেলে হয়েও নিচে। আর তাও কিনা লাইনটা পুরোপুরি মদ্দা। শীলাই এই লাইনে প্রথম এবং এখনও অদ্বিতীয়।

এই থেকে ভুল বোঝাবুঝির উৎপত্তি হত বড়ো কম না। যেমন—

আমি বলতুম: অপিসে বসেই কাজ করুন, সই করুন কাগজপত্র। বাইরে বেরোবার দরকার নেই। মানে—আমার মত যদি নেন, মানেন যদি আমার কথা—

বাঁকা চোখে তাকিয়ে খানিক চুপ করে থাকতো শীলা। তারপর শুধোত : কেন বলুন তো ?

আমি দেখতুম, কালো চোখে কিসের যেন সন্দেহ! মনে মনে ভাবছে বোধহয় শীলা—আমার আশা-করা প্রোমোশান কেড়ে নিয়েছে বলে আসল কাজ থেকে দূরে রাখতে চাই। পর-নির্ভর করে আড়ালে রাখতে চাই। রাখতে চাই আঁধারে। আর অমনি করে ঠকাতে চাই। কর্তৃপক্ষ জানতে চাইলে যাতে ও কাজের হদিস না বলতে পারে, যাতে আমি পুরনো লোক আমার কাছে জানতে চাইতে হয়—

ভেবে না বসে যে, আমি নিচে থেকেও বড়ো হয়ে থাকি, ও ওপরে হয়েও পুরনোর কাছে পরনির্ভর হয়ে থাক।

তাই বলতুম : এমনি। কিছু মনে করে বলিনি।

একটু থেমে, ভেবে নিয়ে বা ভাবনার ভান করে বলতুম : মানুষের চোখ এখনো তৈরী হয় নি কিনা! আমাদের দেশে এখনো ওগুলো আছে পুরুষের চোখ—বিলেতের মতো মানুষের চোখ হয়ে ওঠেনি। তাই বলছিলাম। অন্য কোন কারণে নয়। অবশ্যই আপনার যদি ইচ্ছে না হয়, সে কথা আলাদা। আমি সাজেশ্যান দিতে পারি মাত্র। আপনি ওপরওলা—যা ভালো বুঝবেন, করবেন।

গলার স্বরে যতোটা সম্ভব তাচ্ছিল্য ঢেলে টেনে টেনে বলত শীলা : ও—এই কথা। আমি মনে করলুম, মেশিন-পত্রের কাছ দিয়ে যাওয়া-আসা করার কৌশল জানিনা আমি, তাই ভেবেছেন আপনি। আর তাই সাবধান করে দিচ্ছেন। না জেনে শুনে মেশিনের কাছ দিয়ে যাতায়াত করবার বিপদ তো আছে। ধরুন চলন্ত বেল্টের চামড়ায় বা ঘুরন্ত চাকার গিয়ারে টেনে ধরল হয়তো আমার স্ল্যাক্স বা ট্রাউজার। তাই আপনার ও সাবধান বাণী।

: না, মানে—আমাদের দেশের লোক তৈরী হয় নি এখনো, একথা মানেন তো! তারা তৈরী হয়নি, তৈরী হয় নি তাদের মন আর চোখ। এখনো মানুষের মধ্যে পুরুষ আর স্ত্রী ভেদাভেদ করে দেখে ওরা। দু'দলই যে মানুষ এইটুকু ভাবতে শেখে নি আমাদের দেশের লোক। কোনো কারণেই—সে যতো বড়ো প্রয়োজনই হোক—এক ছাতের তলায় একটি অল্পবয়সী ছেলে আর একটি মেয়েকে যদি রাত কাটাতে হয়, তো ব্যস হয়ে গেল। জাত গেল সেই মেয়ের।

—হো হো হো হো—পুরুষের মত বলিষ্ঠ কণ্ঠে জায়গাটা উচ্চকিত করে হেসে উঠল শীলা।

: যা বলেছেন, জাত গেল সেই মেয়ের। বেশ বলেছেন! কিন্তু জাত যায় না! বজ্জাতের চোখেই যায়। বজ্জাতের চোখেই জাতটা মেটে কলসীর মতো ঠুনকো। আর কারো চোখে নয়।

তারপর কি কারণে বা অকারণেই হয়তো গম্ভীর হয়ে যেতো হঠাৎ। বলত : ওদেশে কিন্তু যায় না। জাত যাওয়া তো দূরের কথা, কিছুই হয়না। আমি আর অটো গ্রুবার্ট এক বাড়ীতে কতোদিন থেকেছি! আমার জাত যায় নি!

আমিও হাসতুম। বলতুম : গেছে কি যায় নি, জানলেন কি ক'রে? আমি যদি বলি—গেছে! 'না' প্রমাণ করবেন কি করে?

শীলা বলত : বয়েই গেছে। প্রমাণ করতে যাবো কোন দুঃখে? ভাবলে ভাববেন। যার যা ইচ্ছে—ভাববেন। ভেবে আনন্দ পাবেন। আমার কি যাবে আসবে?

আমি বলতুম : আপনার জাত গেছে অনেকদিন। গ্রুবার্টের সঙ্গে এক সঙ্গে থাকার ব্যাপারের কথা বলছি না। তার অনেক আগেই জাত গেছে আপনার।

: ও বুঝেছি। হাসত শীলা। বুঝতে পেরেছি এবারে। শোর গোরু খেয়ে জাত খুইয়েছি, এই তো বলছেন? বিলেত গেছি যেদিন, সেইদিনই জাত গিয়েছে আমার—এই তো বলবার কথা আপনার!

বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়তুম। সামনে চায়ের বাটি—ধূমায়মান। চামচে দিয়ে ঘটাং ঘটাং চিনি নাড়তে নাড়তে ভাবতুম—এই যা! ধরে তো ফেলেছেন। কিন্তু ধরা দেবো না অতো সহজে। কি বলা যায়! ঘোরাই কি দিয়ে কথাটা।

বলতুম : উঁহুঃ। পারলেন না তো। ভেবেছিলাম পারবেন! বলছি শুনুন। জাত গিয়েছে সেদিন, যেদিন বিসর্জন দিয়েছেন জাতিধর্ম।

দেখাদেখি কিনা জানি না চামচে নাড়ছিল শীলাও। হাত থেমে যেতো তার। আশঙ্কা ঘনাতো চোখের মণিতে। একটু দুশ্চিন্তাও বোধ হয়, কি জানি আমি কি বলে বসি! তবু তরল হবার চেষ্টায় মৃদু হেসে বলত : ছেলে-মানুষের মতো হয়ে গেল কথাটা। কেন গেল সেটা বললেন না।

বলতুম : যেদিন থেকে নরম নমনীয় নম্র কোমলতার রাজ্য থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন আমাদের মর্দ্দানাদের মদ্দা রাজত্বে—

কথাটা মুখ থেকে কেড়ে নিত শীলা : মিনমিনে-ঘ্যানঘেনে-প্যানপেনে। ইওর মোষ্ট ওবিডিএন্ট সারভ্যাণ্ট। বলুন না আরো দু-একটা। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব। পুরুষ সহকারকে জড়িয়ে জড়িয়ে পর-নির্ভর হয়ে বাঁচা। শ্রীচরণের লাথি খেয়ে বাঁচা। লক্ষহীরার আদর্শ নিয়ে বাঁচা। সাবিত্রী বেহুলার মতো বাঁচা। ও আমাব দ্বারা হবে না। আর যাই হোক ওটি হবে না।

আমি হয়তো বলতুম : বেশ। সেটা বুঝতে পারি। কারো ওপর নির্ভর না করে বাঁচতে চান। স্বাধীন ভাবে স্বাধীন জীবিকা নিয়ে। কিন্তু তাব জন্যে এই মন্দা কাজের দিকে ঝুঁকলেন কেন? হাতুড়ি পেটা, মেশিন চালানো, কালি কয়লা আগুন জল শব্দ নোংরা। পরিশ্রম পরিবেশ কোনাটাই মেয়েলী নয়। আর আপনিই বোধ হয় প্রথম মেয়ে এই লাইনে, ঠিক জানিনে।

: দাঁড়ান—দাঁড়ান, দম নিতে দিন অনুপম বাবু। এক এক করে, আস্তে আস্তে। আচ্ছা, আবার সুরু করুন।

বলতুম : ধরুন, প্রথম কথা—স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে চান যে সব মেয়েরা, তাঁরা গবর্নেস, টাইপিস্ট হন। স্টেনোগ্রাফার হন, টেলিফোন অপারেটর হন। নার্স হন, ইস্কুল মাস্টার হন। বড়ো জোর প্রফেসার ডাক্তার হন—ইঞ্জিনিয়ার হন না। আপনি সে সব না হয়ে ইঞ্জিনিআর হলেন কেন?

শীলা গম্ভীর হয়ে যেতো যেন। বলতো : ঠিক জানিনে। তবে, বাড়ীতে বসে যে সব কলকব্জা দেখেছি, ছেলেবেলা থেকে বাড়ীর ভেতরই যে সব মেশিনপত্তর আমরা দেখতে পাই সে সবই আকর্ষণ করতো আমায়। সেলাইর কল—টুক টুক করে মাথা নাড়ে, কি রকম সুন্দর সেলাই করে। নিখুঁত একেবারে। সমান সোজা সুন্দর। আর কি দ্রুত। পারবে আমার মা দিদিরা অতো তাড়াতাড়ি সেলাই করতে? অতো সুন্দর তো পারবেই না। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতুম ছেলেবেলায়। একটু বড়ো হয়ে আরো অবাক হতুম। হাতল ঘোরার সঙ্গে বা পা চলার সঙ্গে কি আশ্চর্য সমন্বয়ে ওপরের ছুঁচ আর তলার ববিন সিনক্রোনাইজড। ছুঁচের ওঠানামা আর তলায় ববিনের কি অদ্ভুত সময়জ্ঞান। ধাক্কাধাক্কি নেই—পারম্পর্য বজায় আছে ঠিক।

এমনি করেই সাইকেলও অবাক করে দিত আমাকে। দুটো চাকা প্রায় একই প্লেনের। তার ওপর চেপে একটা লোক কাৎ হয়ে মাটিতে পড়ে না গিয়ে এগিয়ে যেতে পারে। আবার বাঁক ঘুরতে গিয়ে যথেষ্ট কাৎ হয়েও পড়ে যায়

না, এ কি কম উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়! তারপর টাইম পিস! মেইন স্প্রিংয়ের কুকুর কুণ্ডলী সারাদিন চলার পাথেয় সঞ্চয় করে রাখে। হেয়ার স্প্রিংয়ে তালে তালে চলার, পা ফেলার তাল রাখা। থাক এসবের ফিরিস্তি। আপনাকে নতুন আর কি বোঝাব! আপনি তো মেকানিকাল ইঞ্জিনিআরও। এ সব এককালে আপনাকেও বিস্মিত করেছে নিশ্চয়। এমনি করে বন্দুক, মোটর গাড়ী, জল-তোলা ইলেকট্রিক পাম্প, ঘরের সিলিং ফ্যান—প্রত্যেকটি জিনিষ মুগ্ধ করত। ছেলেবেলায় হাঁ করে তাকিয়ে দেখা, একটু বড়ো হলে নাড়াচাড়া, আরো বড়ো হয়ে মেরামতে বাবাকে সাহায্য করা। আর সবাই মদ্দা-মেয়ে বলে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইলেও—বাবা চাইতেন না। বাবা দূরে রাখতে তো চাইতেনই না, কাছে টেনে নিতেন। প্রিন্সিপ্‌ল্‌ বুঝিয়ে দিতেন। সহজ সহজ বই দিতেন। ইলেকট্রিক ফিউজ বদলাতে পারতুম আমি সাত আট বছর বয়সে। শক লাগবে ভয়ে কখনও দূরে সরিয়ে দেন নি বাবা। এপ্রন বা বয়লার সুট পরে গাড়ীর তলায় শুয়ে বাবাকে মোটর সারাইয়ে সাহায্য করেছি তখন বয়স আমার কতো—

বলি : আপনার বাবাও ইঞ্জিনিআর ছিলেন নিশ্চয়!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ত মজুমদারের। চুপ করে থাকত খানিক। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি জানি কি ভাবত! পরে বলত : বাবা যে কি ছিলেন না! বাবার কথা থাক—

যেন রসভঙ্গ হত সেদিন। আর জমত না গল্প।

না বুঝে কোথায় ঘা দিয়ে বসেছি যেন। রাতও হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের মতো বিদায় নিয়েছিলাম।

একদিনে একজায়গায় বসে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি ওর ইতিহাস। কখনো ওর বাংলোয়, কখনো আমাদের অপিসে বসে, কখনো শপের ফ্লোরে। কখনো চায়ের টেবিলে, কখনো বা খবরের কাগজের ওপর। টুকরো টুকরো কুড়োতে হয়েছে—ওর জীবনীর ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম।

শীলা বলত : কনভেণ্টে পড়া মেয়ে আমি। সিনিঅর কেমব্রিজ অবধি অসুবিধে হয়নি। তারপর সাধারণ কলেজে পড়তে গিয়ে সায়েন্স নিলুম যখন ইণ্টারমিডিয়েটে—মৌচাকে ঢিল পড়ল। গুনগুন গুঞ্জরণ ফিসফাস গুজগাজ।

ছাত্রমহলে, অধ্যাপক মহলে। নানারকমের আলোচনা। বিস্ময়ের কৌতুহলের তো আছেই, অন্য রকমেরও আছে। সিটি কলেজ স্কটিশে কো-এডুকেশান ছিলই। আমার আগেও সায়েন্স পড়ে গেছেন অনেকেই। তাঁরা ছিলেন নিছক বাঙালী—গুডি গুডি গার্ল। কেশে বেশে বিজাতীয় ছিলেন না আমার মতো। ট্রাউজার স্ল্যাকস পরে কলেজে যান নি কেউ আমার আগে। পরেন নি শার্ট আর বো-টাই। পরে কেউ গেছেন কি না, ক'জন গেছেন জানি না। চুলও তাদের বেণী বাঁধা থাকত, নয় থাকত খোঁপা। লম্বা চুল ছিল তাঁদের। আমাকে দেখে অবাক হল সবাই। এ কে রে বাবা! ড্রাইভ করে কলেজে আসে। শফেয়ার বসে থাকে পাশে—এ মেয়ে নেমে কলেজে ঢুকলে গাড়ী নিয়ে চলে যায়। আবার আসে সময় মত। আবার স্টিআরিংএ বসে মদ্দামেয়েই, গাড়ী চালিয়ে বাড়ী যায়। দেওয়ালে বোর্ডে বুঝতেই পারছেন তাকাবার উপায় ছিল না আমার। আমার নাম দিয়েছিল 'বেবী অস্টিন' কেন জানিনা। আর তাই নিয়ে—

বাধা দিয়ে বলতুম: আমার দেশের লোকেরা বড়ো অসভ্য।

একটু যেন অসন্তুষ্ট হল শীলা। বলত: আমাদের দেশ, আমাদের দেশ, বলে নিন্দে করেন কেন খালি! সভ্য অসভ্য সব দেশেই আছে। সাধারণ নিয়মে যৌবনের চেহারাটা প্রায় সব দেশেই এক। তবে সমাজ ব্যবস্থার জন্যে বাইরের চপটা কিছু পৃথক। ওদের দেশে ঘোমটা ছেড়ে বেরিয়েছে কতো যুগ আগে! আমাদের দেশে তাই যাদেরকে ঘোমটা পরে ঘরে বসে থাকতে দেখে অভ্যাস, তারা পথে বেরোলেই বিস্ময়ের চমক লাগে। তাকায় পুরুষেরা। আমাদের দেশে এটাও চোখসহা হয়ে এলে কেউ ফিরে তাকাবে না আর মেয়েদের দিকে। অবলীলায় মেয়ে পুরুষ পাশাপাশি চলবে ফিরবে, ওদের দেশেরই মতো। যাক না আর গোটা কয় বছর। দিল্লীতে অনেকটা এগিয়েছে, কলকাতা বেশ পিছিয়ে এখনো। ঠিক হয়ে যাবে সব। সময় দিন, সময় দিন।, কলকাতায় বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী যে! তাই এই প্রবলেম। . আর প্রবলেমই বা কি! বেকারের মধ্যে আবার অধিকাংশই যুবক। ব্রেন তাদের আইড্‌ল। তাই একটু এই রকম।

: তাই বলে এ কথা মানতেই হবে আপনাকে ওদের দেশের লোকেরা সম্মান দিতে জানে মেয়েদের। আর তাই থেকেই চাল চলনেও যথেষ্ট সভ্য,. ভদ্র, রুচিবান—

হেসে বলত শীলা : সত্য না ছাই।—কথাটা উঠেছিল, ব্ল্যাকবোর্ডে আর দেয়ালে অশ্লীল মন্তব্য লেখার ব্যাপার নিয়ে।—ওদের দেশেও ট্রেণের কামরায় সাদা জায়গা পেলে মনে করেছেন পেন্সিলের দাগ পড়ে না। তবে, ট্রেণের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সচেতন। বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে দেয় না সে দাগকে। এই যা তফাৎ।

ছেঁড়া সূত্র জুগিয়ে দিতুম : বলুন কলেজের গল্প।

: হ্যাঁ কি যেন বলছিলুম। হ্যাঁ—কলেজের ব্ল্যাকবোর্ডে সরাসরি না তাকিয়েও পড়ে ফেললুম। ওগো বেবী অষ্টিন, তুমি আমায় চাপা দিয়ে চলে যাও। তোমার চাকার তলায় চাপা পড়ে মরি। আমি তাতেও ধন্য।

বলে হাসতে লাগল শীলা। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। বলল : কাকে জানিনা—যিনি চেয়েছিলেন তাকেই কিনা—প্রায় ধন্য করেই ফেলেছিলুম একদিন। যিনি লিখেছিলেন, তিনি নিশ্চয় সিরিয়াসলি লেখেন নি। সিরিয়াস হলে ওভাবে লেখা চলে না। প্রেম নিবেদন করা চলে না ওভাবে। করে না কেউ। এই ইয়ংম্যানটি যেন ডেলিবারেটলি গাড়ীর সামনে এসে পড়ল। ড্রাইভার রাম চরিত্তর ছিল খুব হুঁশিয়ার, খুব য়্যালার্ট। আমার হাতে হাল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারত না কিছুতেই। বেশ কয়েক বছর আগে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছি আমি। তা সত্ত্বেও। সামনে লোক এসে পড়ায় পাশে বসে ঘ্যাচ করে হ্যাণ্ড ব্রেক টেনে দিল রাম চরিত্তর। আমার হাত সুদ্ধ ষ্টিআরিং ঘুরিয়ে দিল ডান দিকে। কয়েক ইঞ্চির বেশী এগুতে পেল না গাড়ী। হঠাৎ থেমে দুলতে লাগল আমার হৃদপিণ্ডের দোলকটার মতো। রক্তের সমুদ্রে বাজনা বাজছে তখন ছলাৎ ছল—

আমি রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় বলে ফেললাম : আর ছেলেটার? কি হল তার?

: না, না মরেনি। কিচ্ছু না—হয়নি কিছুই। সামান্য ব্রুজেস্, ছড়ে গিয়েছিল হেথা হোথা। কিছু সামান্য রক্তপাত।—বাইরে, শরীরের রক্তপাত বা কাটা ছেঁড়া উল্লেখযোগ্য ছিল না।

আমি হেসে ফেললাম এবারে। বললাম : মনের ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছিল তার।

: কি জানি তার মনে কি সাধ ছিল। আমি কি করে জানব? কার মনে কি সাধ, কি করে জানব?—তারপর আমার দিকে এক অদ্ভুত চোখে তাকালো শীলা।

আমি বললুম : এই—আপনি টেনে তুলবেন হাত ধরে, গাড়ীতে নেবেন। একটু ছোঁয়াছুঁয়ি—তারপর সেবা-যত্নের মাধ্যমে স্পর্শ প্রভাব বিস্তার করবে। এইটুকু আর কি! অনেক সময় সহানুভূতির মধ্যে দিয়েও দল মেলে হৃদয়। 'আহা'র সুরু দিয়ে বাহার খোলে মনের—

: মূর্খ, মূর্খ! যে কোন মেয়েই লজ্জাবতী নয় কিছু। ছোঁয়া পেলেই চোখ বুজে ভাববে বসে বসে। আচ্ছা পুরুষরা কি বলুন তো! একটু ছোঁয়া লাগলে, বিশেষ করে রোগে সেবা করলে, ব্যস ধরে নেয় অমনি ও মেয়ে প্রেমে পড়ে গেছে। সেবা এক জিনিষ। পীড়িতকে, অসুস্থকে ব্যারামে আরাম দেয়া। আমি মনে করি—অসুস্থ লোক শরীরের ক্লেশে কতো অসহায় হয়ে পড়ে। সেই ক্লিষ্টর কাছে যে আনে আরাম বা আরামের আশ্বাস, সে কি সোজা সহায়! শরীরটা অসুস্থ থাকাকালে নির্ভর করেছি যাতে—সুস্থ হয়ে আর ভর দিতে পারবো না, ভরসা রাখতে পারব না তার ওপর! এ কেমন!

শীলা আমার ধারণার ধারা ধরেই এগিয়েছে। অবিকল। তাই ঠিক ঐ আলোচনাটা এগোতে দিতে ভালো লাগল না। অন্ততঃ ঐ রূপে আর ও আকারে।

জিজ্ঞাসা করলাম : ছেলেটা কে? চিনতেন নাকি?

মুচকে হাসল শীলা : তা কিছু কিছু চিনতুম বৈ কি! কলেজে এগারো নম্বর ঘর ছিল আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের কমন রুম। দোতলায়। উত্তরে হস্টেল। অবশ্যই অন্য বিল্ডিংয়ে। কমন রুমের উত্তরের জানালায় কাঠের পার্মানেন্ট খড়খড়িওলা ঢাকা। হস্টেল থেকে না দেখা যায়। দক্ষিণে টানা বারাণ্ডা। ক্লাসরুমের সামনে দিয়ে ভাইস প্রিন্সিপালের ঘরে এসে ঠেকেছে। এই বারাণ্ডার পূবে টানা রেলিঙ। সেই রেলিঙ ধরে বিষাদের প্রতিমূর্তি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতুম একে-ই। প্রায় রোজ। যখুনি বেরোতুম কমন রুম থেকে, দেখতুম, ঠি-ক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে ঠোঁটের অন্ধকারে আলোর ঝিলিক খেলে যেত যেন। ঠিক বুঝতুম না। কি যেন পাওয়ার নিরাকার.আনন্দ—

: কি করলেন তারপর? চাপা পড়তে পেলো না বেচারা, ধাক্কাই খেলো শুধু শুধু। না মরতে পেরে আধমরা হবার গ্লানি!

: ধাক্কা খেলো, শুকও খেলো। গাড়ীর ধাক্কা খেলো যখন, শুকটা খেলো তার অনেক পরে। হ্যাঁ গাড়ীতে তুলে নিয়েছিলাম, ডিসপেনসারীতে নিয়ে

গিয়েছিলাম। ফার্স্ট এড সেখানে। সেখান থেকে ভদ্রলোকের মেস। পটল-ডাঙার ইন্টিরিআরে সে মেস। গাড়ী ঢোকে না। গাড়ীর রাস্তা থেকে আমারি কাঁধে ভর দিয়ে নিয়ে গেলাম। পরের কয়েক দিন খবর নিতে যেতাম—রোজ। ভালো হলে আর যাইনি।

: চিনতেও পাবেন নি আর তারপর, নয় ?

: প্রায় তাই।

: উঃ, কি নিষ্ঠুর আপনি! একটুও মেয়েদেব মতো নন। নরম নয় আপনার মন। আপনি—

: তাই তো এসেছি এই মন্দা লাইনে।

: আচ্ছা—একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মনে কিছু না করেন যদি। এমনি করে কত লোককে গাড়ী চাপা দিয়েছেন জীবনে, আর তারপব ফিরেও তাকান নি ?

একটু ভেবে নিল শীলা। তারপর সহজ সুরেই বলল : কোয়েশ্চেন-টা যেন সিরিআস সিরিআস লাগছে! তা হলে উত্তব দিই কি করে ?

: সিরিআস নাই বা ভাবলেন। এমনি বলুন না।

: থাক। ঠিক আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত নয় ওটা—না, কি বলেন ? ও ঘটনাটা কিন্তু কাফ-লাভের পর্যায়ে পড়ে। ওটার গুরুত্ব আমি কেন, কেউ-ই দেবে না। এ কথাটা মানবেন তো।

হাসবার চেষ্টা করেও হাসতে পারিনি, বেশ মনে পড়ে। কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেছিলাম : প্রাণ দিতে চাইল ছেলেটি, ধরুন আপনার পাণি-প্রার্থনা করেই। আর আপনি হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন! হোক না কাফ, কাফেদেব মনেও কি লাভ থাকতে নেই ? এ কেমন যুক্তি আপনার ?

শীলা বলেছিল : কলেজের প্র্যাকটিকাল ক্লাসেই মৌচাকে ঢিলের ব্যাপার বেশী করে টের পেলাম। একজন কেন চারজন ডিমনস্ট্রেটারের মধ্যে তিনজনই ব্যাচিলার। আমার ছোট্টতম প্র্যাকটিকাল গ্রুপ 'এফ'। এই 'এফ' কিন্তু 'ফিমেলের' আগুক্ষর নয়। 'এ' থেকে চলতে চলতে 'এফ' ছাড়িয়ে চলে গেছে। গ্রুপে পাঁচটি মেয়ে, বাকি এগারোটি ছেলে। শুনেছি এই এগারোটিকে বাকি দুশো এগারোটি নাকি হিংসে করত। যেমন ডিমনস্ট্রেটার তেমনি ছেলেরা। বাঁ হাতে লিখে উড়ো চিঠি পাঠাতো। অমুক তারিখ অমুক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবো—যদি আমার গোটা কতক কথা না শোনেন,

সায়নাইড খাবো। আমাদের ক্লাসে না হলেও, থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে সায়নাইড এমন দুর্লভ নয় কিছু। আর সত্যি, প্র্যাকটিকাল ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিকাল করতে করতে জানেন তো একটি ছেলে সায়নাইড খেলো। আমাদের পাঁচজন অবোলাকে নিয়ে টানাটানি। সে কি সোজা টানাটানি! প্রাণ যায় আর কি। যদিও আমাদের গ্রুপে নয়, তবুও আশ্চর্য, আমরাই দায়ী হলুম। আমরাই। আমরা সেকেণ্ড ইয়ারে তখন। ছেলেটি ছিল ফোর্থ ইয়ারের। ফার্স্ট ইয়ারে মেয়েদের সংখ্যা ছিল অনেক। আর্টসে জন তিরিশ-বত্রিশ, সায়েন্সে তা পনেরো-ষোলো। এই পঞ্চাশ ষাট জন মেয়ের মধ্যে সেই অমূল্য প্রাণটি যাবার মূলে দায়ী কে—তা জানা গেল না। তবে, এক নভেল উপায়ে নিজেকে শেষ করে গেল ছেলেটি। কি ছেলেমানুষী বলুন তো!

মনে ব্যথা পেয়েছিলাম। মুখের চেহারায় ছাপ পড়ে থাকবে তার, জানিনা। বলেছিলাম ঃ ছেলেমানুষী বলছেন কেন একে?

ঃ ছেলেমানুষী নয়! কোথায় কি হল না হল! একটি মেয়েকে মনেপ্রাণে চেয়েছিল হয়তো ছেলেটি, মানলাম। তাকে জয় করো, হার মানাও তাকে। তা নয়, নিজেই চলে গেলে। প্রাণটা কি অতোই সস্তা? কথায় বলে মানুষ জন্ম খুব দুর্লভ জন্ম। এ সব না মেনেই বলা চলে, প্রাণটা পেয়েছো কি অতো সহজে বাজে খরচ করতে? কাজ করো, এগিয়ে চলো। অগ্রসর করে নিয়ে চলো—কাছাকাছি সকলকে, দুনিয়াটাকে। প্রেম আর প্রেম। ভালোবাসা আর ভালোবাসা। ওতো রূপজ মোহ। রূপের গর্ভে ওর জন্ম। সব সময় তাও নয়, ও হচ্ছে যৌবনের আকর্ষণ। দেহমিলনের ইচ্ছার গালভরা নাম। দেহ আছে, আছে। সে তার কাজ করুক, তা নিয়ে মাতামাতি কেন অতো! খেতে দাও পরতে দাও। বুদ্ধি দিয়েছেন ভগবান—দিয়েছেন আউন্স কয়েক ব্রেণ। তাকে কাজে লাগাও। এতো ভাববিলাসী ভাবুক হবে কেন লোকে, বলতে পারেন?

ঃ হৃদয় বলেও তো একটা জিনিস ভগবানই দিয়েছেন। প্রেম বলুন, ভালোবাসা বলুন সেই হৃদয়েরই একটা বৃত্তি বই তো নয়। ও হৃদয়টাকে তো আপনার কথা মতো বাদই দিয়ে দিতে হয় তা হলে—

আমাকে শেষ করতে না দিয়েই শীলা বলেছিল ঃ ও, হৃদয় নামের বৃত্তিটির বুঝি ঐ একটিই কম্মো। ভলোবাসা! আমি নর-নারীর দেহমিলনে যার

সমাপ্তি সেই ছোট্ট অর্থে ভালোবাসার কথা বলছি। ভালোবাসার অনেক ব্যাপক একটা অর্থ আছে। স্নেহ দয়া মমতা পরের কাজ করা, পরের উপকারে লাগা, সবই হৃদয়বৃত্তির কাজ। ভালোবেসে—অর্থাৎ হৃদয়ের ঐ ছিঁচকাঁদুনে বৃত্তিটিকে প্রশ্রয় দিয়ে কেন আমি নিজেকে সংকীর্ণ করে ফেলবো বলতে পারেন? কেন একটি পুরুষ বা মেয়ের ভালো-মন্দর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবো। অন্য দিকে চাইতে পারবো না। তাকাবার অবকাশ পাবো না, সেই একটি মানুষকে ঘিরে থাকবো! নিজেকে এতো বড়ো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঐ একটি মানুষের জন্য ভেবে মরবো। দুনিয়ায় কি আর লোক নেই! করবার নেই আর কিছু! ভাবনা নেই আর কিছু ভাববার মতো। ভালোবাসো, বিয়ে করো—না পেলে নিজেকে শেষ করে দাও। নইলে বিয়ে করো ভালোবাসো, স্বার্থপরের মতো একটি লোকের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফ্যালো। অর্থাৎ ঠুলি পরো চোখে। দুনিয়া যাক বাদ হয়ে। কেন?

এমনি ছিল শীলার বিয়ে ভালোবাসা সম্পর্কে মতবাদ।

বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম: আপনি ছেলেমানুষ নন। বয়েস একটু হয়েছে। স্বাধীন মত গড়ে উঠেছে। দেশ দেখেছেন দুটো। এর মধ্যে ভালোবাসার ব্যাপার-ট্যাপার একটুও হয়নি? কেউ ভালোবাসা জানায় নি? ভালো লাগে নি কারোকে কোনদিন?

হো হো করে হেসে উঠেছিল শীলা। বুঝলাম, হয় সে-কথা শোনার লোক আমি নই, নয় সময় আসে নি এখনও।

সেদিন যা মুখ ফুটে বলতে পারে নি শীলা সেই কথা আমাকে টুকরো টুকরো গড়ে নিতে হয়েছে। পরবর্তী অনেকদিনের আলোচনার মধ্য থেকে। ক্ষীর বেছে নিতে হয়েছে জলের অংশ বাদ দিয়ে।

শীলা বলেছিল। ও তখন বার্মিংহামে। সিনসিনাটি ফ্যাক্টরীতে।

যতদূর মনে পড়ে, ওর ভাষ্যেই বলি।

আমি তখন বার্মিংহামে—সিনসিনাটি ফ্যাক্টরীতে ট্রেনিংএ আছি। এদেশে দৃষ্টিবাণের ঘায়ে কষ্ট পেয়েছি। ওখানে তো আর তা নয়।

সেখানকার চোখগুলোতে বিস্ময় ছিল না একথা বলি না, তার চেয়ে বেশী ছিল—অন্য কিছু। ওখানে কারখানাতে মেয়ে কর্মীর সংখ্যা কম নয় কিছু। প্রতি দুটো ছেলে কর্মীতে একটি মেয়ে কর্মী। টুলশপ বাদ দিয়ে প্রায় সর্বত্র। কাজেই, স্বাধীন দেশে মেয়েদের চলা ফেরায় ঐ বাধাটা নেই। হাঁ করে চেয়ে থাকার অস্বস্তিটা নেই অন্ততঃ। যে যার মনে চলাফেরা করছে, কাজের সময় কাজের কাজ করছে। গল্পর সময় গল্প। খাওয়ার সময় খাচ্ছে আর সারাদিনের জমানো হাসি ঠাট্টা চলছে খাওয়ার সঙ্গে। তা ছাড়া, বাজে কাজে, বাজে কথায় সময় ক্ষেপ করার মতো সময় বা ইচ্ছা কোনোটাই নেই তাদের। এক কাজ করতে বসে আর এক কাজের কথা ভাবে না। হাতের কাজ থামিয়ে বা কাজের স্পীড কমিয়ে প্রেমের কথা ভাবতে বসে না। প্রেম তারাও করে। তার সময় আছে আলাদা, নির্দিষ্ট করে রাখা। এই আলাদা করে রাখা সময়টা ধরুন, শনিবারের বিকেল। আর কখনও কখনও রবিবারও। কাজেই কারখানায় কাজ করতে করতে পাশের মেশিনে ফিলিপ ডোরা বা মার্থা কি করছে—এ দেখার অকারণ কৌতূহল নেই। স্ফুরণ কাজ ফেলে পাশের মেশিনে তাকিয়ে দেখার সময়ই বা কই। স্ফুরণ কাজের পাঁচ মিনিট হয়তো কয় পেনী। কাজেই, সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। তবে কৌতূহলই কি তাদের কিছু কম? ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান মেয়ে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীআর। বিলেত গেছে ট্রেনিংএ। শাড়ী পরে না, গাউন ফ্রক স্কার্টও পরে না। একেবারে স্ল্যাকস বা ট্রাউজার। কোনো নেটিভ স্টেটের প্রিন্সেস না হয়েই যায় না। কেমন এপ্রণ পরে কোমর বেঁধে কাজে লেগে গেছে। তাদের চোখে বেশীর ভাগই এই কৌতূহলের ঝিলিমিলি। এর বেশী কিছু নয়—

: লাঞ্চ আওয়ারে প্রথম প্রথম ক্যানটিনে খেতে যেতাম। স্ন্যাকস আর চা-ই খায় ওরা এই সময়টায়। একটু কিছু জলযোগ। আমাদের এখানে দেখেছি অনেকে ঐ সময়ে ভরপেট ফুল মিল খায়। ওরা সাধারণতঃ তা খায় না। ক্যানটিনে খাবার-দাবার কম্পানী মোটামুটি সাবসিডাইজ করে। অনেক সস্তা পড়ে। প্রথম প্রথম খেতে গিয়ে দেখতাম—ওরি মধ্যে যে যার দল আছে। কেউ মেশিন শপ, কেউ ফিটিং শপ, কেউ বা মেনটেন্যান্সে কাজ করে। সারাদিন দেখা হবার উপায় নেই। শেষ রাতের অন্ধকারে, আধ-পোরা ঘুম চোখে যে যার এসেছে। এসেছে আলাদা আলাদা কাউন্টি থেকে।

বাসে দেখা হলেও হতে পারে। কিন্তু সেই সাত সকালে—সাত সকালে নয়, শেষ রাত্রে ঘুমেই প্রাণ বেরিয়ে যায় তখন। কে কাকে চিনবে? চোখের ওপর টুপিটা নামানো। অর্থাৎ বাসের লাইটগুলো যতোটা সম্ভব আড়াল করা। যারা আসছে অনেক দূর থেকে, তারা তো বসবার সিটই পেয়েছে। কাৎ হয়ে ওভারকোটের কলারটা কান অবধি তুলে দিব্যি ঘুম। কাছাকাছি থেকে উঠেছে যারা, বসতে জায়গা পায়নি, তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খানিকটা ঘুমিয়ে নিচ্ছে ঘোড়ার মতন। কণ্ডাক্টরকে ভাড়ার পয়সাটা দেওয়ার আগে-পরে ঘুম আর ঘুমের চেষ্টা। কাজেই সকালে বাস-এ দেখা হয়তো হয়—সে দেখা চোখে চোখে। প্রাণে প্রাণের দেখা হয় না। প্রাণের কথা সেই লাঞ্চ আওয়ারে ক্যানটিনে বসে। তা ছাড়া বাসে দেখা হলেও ওরা গল্প জুড়ে দেয় না আমাদের দেশের মতো। পাছে অন্য যাত্রীদের ব্যাঘাত জন্মে। দেখা হলো—একটু মুচকি হাসল। খুব স্বল্প ভাষে নিচু স্বরে কুশল জিজ্ঞাসা করে নিল—ব্যস। তারপর থেকে বাসের ইঞ্জিনের গোঁ গোঁ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

ঃ প্রথম প্রথম ক্যানটিনে খেতে গিয়ে লোনলি ফিল্ করতুম। আমার সঙ্গী সাথী জোটে নি তখনও। যে যার চারজন করে বসে গেছে এক এক টেবিলে। খাতিরের লোক জুটে গেলে সে পঞ্চম ব্যক্তি হয়েছে। চেয়ার একটা টেনে নিয়ে বসে গেছে ঐ চারজনের টেবিলেই। আলোচনার বিষয়—পুরুষের টেবিলে মেয়ের, মেয়েদের টেবিলে পুরুষের। এইটেই সাধারণ। বিশেষ অকেশান হলে ওরা যে ট্রেড ইউনিয়নের, সরকার বা কর্তৃপক্ষ ঘেঁষা মনোবৃত্তির সমালোচনা করে না তা নয়। লিডারদের নিয়েও কুষ্ঠি কাটে। কর্তৃপক্ষের শ্রাদ্ধ করে—আকারে ইঙ্গিতে নাম না করে। কাজের রেট কম দিয়েছে তা নিয়ে দুঃখু করে। তবে এগুলো ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ ওরা কারখানাটাকে চলে আসার সময় কারখানার মধ্যেই রেখে আসে। ওদের পরিমিতি-বোধ এইসব বিষয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী।

ঃ ক্যানটিনে খেতে গিয়ে ভদ্রতার প্রয়োজন ছাড়া বিশেষ কেউ তাদের টেবিলে নেমন্তন্ন করত না। ইণ্ডিআ থেকে গেছি! কি রকম না কি রকম লোক—প্রিন্সেসও হতে পারি ডাকিনী-মন্তর-জানা উইচও হতে পারি। ইণ্ডিয়া মানেই ল্যাণ্ড অব নেকেড সাধু-জ, স্নেকস, কলেরা য়্যাণ্ড এপিডেমিকের দেশ। সব চেয়ে বড়ো কথা কুসংস্কারের দেশ—ব্রিডিং গ্রাউণ্ড অব কুইয়ার

সুপারষ্টিশান্স্।. কাজেই না মেশাই ভালো। তা ছাড়া মেয়ে য়্যানার্কিস্টও হতে পারে। যাক সে কথা।

: এরপর আমি ক্যানটিন থেকে স্ন্যাকস আর ফ্লাস্কে ভরতি চা কিনে নিয়ে কোথাও বসে খেয়ে নিতাম। কয়েকটা জায়গা বদলাবার পর একটা কাঠবাদাম গাছের তলা আবিষ্কার করলাম—যেখানে কেউ যায় না। একটু দূরে অক্সি য্যাসিটিলীন ওয়েলডিং-এর খরচ হওয়া কারবাইডের কাদা ফেলবার জায়গা। মাঝে মাঝে গন্ধ আসত একটু হয়তো। তা আসুক। একা একা আধঘণ্টা কাটাবার পক্ষে কারখানার মধ্যে আর জায়গাই বা কই?

: একদিন দুদিন তিনদিন। দেখি আমি আর একা নই। একটি আইরিশ ছেলে এনক ম্যাকফারসন আগে ভাগেই বসে আছে। গাছতলাটিকে আগে থেকেই দখল করে।

: আমি যেতেই ভণিতা করে উঠে দাঁড়ালো। সবিনয় নিবেদনে বলল: বসুন, বসুন—এ জায়গাটা আপনার তা জানি। আমি যাচ্ছি—

: আমি দেখলুম, লাঞ্চের অল্প বাকি শেষ হতে। কোথায় তাড়িয়ে দেবো ছেলেটাকে। গাছতলা তো আমার কাছারি বাড়ীর নয়! আমি উঠিয়ে দেবার কে? ছেলেটার ভঙ্গীটিও বেশ ভালো লাগল।

হেসে বললুম: আমার কোন অসুবিধে হবে না, আপনার না হলে বসতে পারেন।

পরিচয়টা একটু ঘনিষ্ঠ হবার পর একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম: আচ্ছা তুমি তো ক্যানটিনেই কাটাতে লাঞ্চ আওয়ারটা। জায়গা বদলালে যে বড়ো!

বেশ মনে আছে, আমি আবেগের মাথায় বলে উঠেছিলাম: আচ্ছা, এই ছেলেটিকে বুঝি আপনি 'তুমি' বলতেন? বলে মনে মনে হেসেছিলাম, ভেবে-ছিলাম—পেয়েছি তোমাকে। আব পাকাড় লিয়া ঝুমকো। অর্থাৎ এই আইরিশ ছেলেটিকে নিশ্চয় ভালোবেসে ফেলেছিলে তুমি।

শীলা উত্তর কি দিয়েছিল জানেন?

বলেছিল: ইংরিজিতে আপনি তুমি তুইর পরিভাষা একই—ইউ। ইয়োর।

হেরে গিয়ে বলেছিলাম: বলুন, তারপর— •

শীলা বলেছিল: এনক বললে, আমাকে ওরা দেখতে পারে না। কেন

জানেন, এয়ারার লোক আমি। তাও আবার ফিয়েনা ফিল পার্টির সুখ্যাতি করি। মুখে যাই বলুক—যতো বারফট্টাই করুক, মনে প্রাণে বৃটেনের এক অংশ ইমন ডি ভ্যালেরাকে ঘৃণা করে, হয়তো কিছু ভয়ও। আর যাই করুক, ভালোও বাসে না, শ্রদ্ধা তো করেই না। আমাকেও ওরা ঘৃণা করে, ঠাট্টা টিটকিরি করে শুনিয়ে শুনিযে। ভালো লাগত না ক্যানটিনে বসে খেতে।

ঃ একে একে দুই।

ঃ তারপর আবার দুদিন তিনদিন চারদিন।

ঃ এইবার হলাম দুয়ে একে তিন। একটি বয়স হওয়া ফরাসী। এই—পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স। ব্যাপার প্রায় একই। ঐ পোলিটিকাল মতভেদ। মতভেদের ফলে বিতৃষ্ণা। অতো বড় উদারনীতিক জাত। পরমতসহিষ্ণু, অন্যের ধর্ম আচারে আচরণে হস্তক্ষেপ করে না। কতো বড়ো বড়ো কথা, ওদের কতো গুণপনার কথা, বিলেত যাবার আগে মগজে ঢুকে গিয়েছিল। কাঁচকলা—সব মিথ্যে। হ্যাঁ, এই নিয়ে চেঁচামেচি করার অসভ্যতা তাদের নেই, একথা ঠিক। তবে, চোখ-মুখের ভাবে বেশ ধরা পড়ে সেটি! এরপর আরও একজন। কারণ ঐ একই—ক্যানটিনে বসে খেতে অস্বস্তিবোধ। ইটি জাতে জার্মান, সুইডেনে ডমিসাইল্‌ড।

ঃ আস্তে আস্তে আমাদের এই চেস্টনাট শেড ক্যানটিনের দুর্নাম ছড়াতে লাগল। আমরা সব পারসোনা নন গ্রাটা—আনওয়ান্টেডের দল। আমরা ওখানে বসে পলিটিকস করি। সব নন-বৃটিশার জুটে বৃটেনটার সর্বনাশ করার ষড়যন্ত্র করি কিনা তাই বা কে জানে। অবশ্যই প্রবল প্রতাপ বৃটেনের করতে যে পারবো না কিছুই, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কারো। তবু এসব মূলেই উচ্ছেদ করতে হয়।

ডাক পড়লো একদিন 'জি. এম.' এ-র ঘরে—

বললাম ঃ এই সময়েই বুঝি আপনি সিনসিনাটি ছেড়ে দিলেন। একদিন বলেছিলেন না, সিনসিনাটি ছেড়ে উইকম্যানে গিয়েছিলেন।

শীলা বলেছিল ঃ না তো! সে তো তার অনেক পর। এই ঘটনার দু-আড়াই বছর পর সিনসিনাটি ছেড়েছিলাম। আর ঘটনাই বা বলছি কেন? ঘটনা তো ঘটেনি কিছুই।

ঃ ঐ যে জেনারেল ম্যানেজারের ঘরে ডাক পড়লো।

ঃ পড়ল তো কি হল। তিনি তো কিছুই বললেন না। এখানকার

মতো ওখানে তো নয়। জি. এম-এর ঘরে ডাক পড়লে অনিবার্য ধরে নেয় না ওরা, যে চাকরীটা গেছে। বলির পাঁটার মতো কাঁপতে কাঁপতে যায় না ওরা—জি. এম-এর কাছে। সুস্থ স্বাভাবিক ভাবেই যায়। তবে মনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতার স্বাভাবিক গুর গুর হয়তো করে। সেটা ভয় যতোটা কৌতূহলও ততোটাই।—বিষয়টা কি? ডাক পড়ল কেন? এখানে সামান্য আমার-আপনার অপিসে আসতেই ওরা উদ্বেগ নিয়ে আসে। এখানে আমরা এমনি অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছি—

ঃ জি. এম. উঠে দাঁড়িয়ে—কি বলবো অভ্যর্থনাই বলি—অভ্যর্থনা করলেন। নিজের দুটো হাতে আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে ঝাঁকুনি দিলেন বেশ গোটা কতো। জানেন তো এটা ওদের বিশিষ্ট অতিথি বা বিশেষ সম্মানিত লোককে অভিবাদন জানাবার রীতি। প্রসারিত ডান হাতটা নিজের দুটো হাতে চেপে ধরে। কুশল বিনিময় আর ধন্যবাদ জানানোর পালা শেষ হলে বসতে দিলেন। নিজেও বসলেন হেনরী ককক্রফট। চোখে মুখে একটা চকচকে ঔজ্জ্বল্য উপচে পড়ছে। কিসের এটা! আনন্দের, খুশীর? বুঝতে পারছি না। আমি তো আসামী! চেস্টনাট শেডের আসামী—

ককক্রফট বললেন ঃ আমি গর্বিত, সত্যি গর্বিত! ওরা ডিপ্লম্যাট ঠিকই কিন্তু সাধারণ ঘরোয়া ব্যাপারে নয়। রাজনীতিতেই। সাধারণ ভাবে কেউ কারো কক্ষপথ মাড়ায় না। দেখা হলো—হ্যাললো, বললে হাডুডু। খেললেও হাডুডু। আন্তরিকতা নেই, মুখের হ্যাললো কুশল জিজ্ঞাসা মুখের ওপাশে অন্তরের গভীরে পৌঁছয় নি। কেমন আছো, ভালো তো? সো গ্ল্যাড টু মীট ইউ! সব হাঁসের পিঠের জল। আন্তরিকতার রাস্তায় যেতে যেতে হাঁসের পিঠের জলের মতো ঝরে গেছে কখন! তাই তো, শুনলুম—ছেলেটি নাকি মারা গেছে তোমার! হাউ স্যাড, রিয়েলি ফেল্ট শ্যকড টু লার্ন! মুখের আহা-বাচক চুক চুক! সব মুখের। তা হবে না? একটা গল্প বলে উদাহরণ দিই। গল্প নয়, কাহিনী। ছেলে কাজ করত ইণ্ডিআয়। কি যেন খিটিমিটি হল—সম্মানে পোষাল না, টাকায় পোষালেও। ছেড়ে দিয়ে গেল ইণ্ডিআর চাকরী। তার আগে ছেলের চেনা জানা, নিচের কর্মচারী যারা বিলেত যায়, ইণ্ডিয়া থেকে যার নামে চিঠি নিয়ে যায়। ছেলের মা থাকেন নর্থ লণ্ডন। ড্রেপার রোড। নিজের বাড়ী। শিক্ষিতা ভদ্র মহিলা। কি খানদানী চেহারা! সত্যিকারের মানী চেহারা, পোশাক-আশাক। তেমনি পলিশড

কথাবার্তা। ঘরে ঘরে এ-ই পুরু গালচে, তা ইঞ্চি দুই পুরু। সত্যি সত্যি বড়লোক। স্বামী নেই! আর কেউ নেই তিনকুলে। ওরা এক কুলেরই পরোয়া ভারী করে, তা তিনকুল! ইণ্ডিআ থেকে পরিচয় পত্র নিয়ে আসে ছেলের। খুব খাতির করে আদর আপ্যায়ন করে মা। আর করে দুঃখু। ও, আই হ্যাভনট সীন হিম ফর লং। কি হবে ইণ্ডিআয় চাকরী করে? ও আসুক—কাছে পিঠে কাজ করুক। হোক না দু-পয়সা মাইনে কম। একটাই তো ছেলে। তোমরা বাবারা একটু বুঝিয়ে বোলো ওকে।···সেই ছেলে ইণ্ডিআর কাজে ইস্তফা দিলে। গেল ফিরে লণ্ডন। নর্থ লণ্ডন মানে আমাদের বালীগঞ্জের মতো সাবার্ব একটা। সেখানে বাড়ী থাকা চাট্টিখানি কথা নয়। ছেলে গিয়ে উঠলো মার বাড়ীতে। মার সঙ্গে অনেকদিনের ভাব মিস্টার আর মিসেস টমাসের। তাদের নিয়েই থাকত বুড়ী। ছেলে এসে ওঠাতে এতোকালের বিধি ব্যবস্থাতে রদবদল করতে হল কিছু। খুশী নয় কেউ। ইণ্ডিআ হাউসের মাধ্যমে ইণ্ডিআয় চাকরী মিলেছিল এর আগের বার। মিলেছিল সহজেই। এবার তো আর তা চলছে না। এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোতে চলছে চাকরীর খোঁজাখুঁজি। তারো চেয়ে জোর খোঁজ চলছে বাড়ীর। বাড়ীটা মার—ছেলের নয়। গর্ভধারিণী মাকে কতো অসুবিধেয় রাখা যায় আর! হাঁড়ি তো আলাদা এসে অবধি আছেই। চাকরী জুটলো এনফিলডে। লণ্ডনের আর এক সাবার্ব। সেই সঙ্গে বাড়িও। মা বিকেল বিকেল এসে দেখে যায় ছেলেকে। তা ছেলে কি আর পর? যুদ্ধের সময় চিনি বরাদ্দ বাঁধা, আর সেই বরাদ্দটা এতো কম যে দুবেলা দুকাপ চা খেতে গেলে হপ্তার পাঁচদিনের বেশী কুলোয় না। সেই সময় ক্রিসমাসে চিনির প্যাকেট প্রেজেণ্ট পাঠাতো ছেলে! দশটি পাউণ্ড। চালাকি নয়। সোজা ভালোবাসে মাকে! ইণ্ডিআ থেকে এলো যখন, জাহাজের হোল্ডের কোল্ড স্টোরেজে—ভাড়া দিয়ে—হ্যাঁ দস্তুর মত ভাড়া দিয়ে নিয়ে এলো শুয়োর। মেরে নিয়ে এলো। নব্বুই পাউণ্ড ওজন। তার আট দশ পাউণ্ডের এক টুকরো মাকেই তো দিল। এমন মাতৃভক্তি বিরল না হলেও ছড়াছড়ি যায় না পথে-ঘাটে। যে মা ছেলেকে কাছে পাবার জন্য ব্যস্ত, সেও চায় না ছেলে তারই কাছে থাকুক। ছেলের আবার দুটি বাচ্চা ছেলে আছে। তারাও কিন্তু তাদের বাপ মার কাছে থাকে না। একটা হস্টেলে থাকে, এনফিল্ডের একটু বাইরে। বাস-এ মিনিট

দশেকের রাস্তায়। তারাও আসে উইক এণ্ড-এ। বাপ-মার কাছে থাকলে আপন হয়ে যায় যদি! মমতা বসে যায় যদি ইণ্ডিআনদের মতন! কী সর্বোনাশ! তাদের স্থিতি আঠারো বছরের একটি দিন বেশী নয় বাপ-মার কাছে। ছেলে সম্বন্ধে বাপ-মার দায় দায়িকতা, ছেলের আঠারো বছর পুরতেই শেষ। তারপর সে ছেলে নয়—অতিথি। গেস্ট। পেয়িং গেস্ট…

ঃ এই যেখানে সমাজ ব্যবস্থা—মার সঙ্গে ছেলের, ঠাকুমার সঙ্গে নাতির—আন্তরিকতার ঠাঁই যেখানে রক্তের সম্পর্কেই নেই, সেখানে বন্ধু আর পরিচিত! সব ওপর-ওপর, সুপারফিশ্যাল…

এই বলে কেন জানিনা দূর দিগন্তে চেয়ে রইল শীলা। কিছু উদাস, কিছু চিন্তিত কিছুটা ধ্যানে আত্মমগ্ন। ধ্যান ভাঙতে চাইনি আমি। আধ ইঞ্চি বাই আধ ইঞ্চি লালের চৌকোর পাশে শাদার চৌকো, আর্ট সিল্কের পাঞ্জাবী একটা গায়। পায়ের ডিম ছাড়িয়ে নেমে গেছে ঝুল। আমাদের পাঞ্জাবীর মতোই কাট—কটি পর্যন্ত গায়ে মোটামুটি টাইট ফিট। সাদা কাপড়ের টেনিস কলারের আকারে ছোট্ট কলার। হাফ হাতা! ছোট্ট চুল আঙুলে জড়িয়ে পাক দিচ্ছিল অন্যমনস্কতায়—

ধ্যানলোক থেকে ফিরে এল নিজেই শীলা।

ঃ কি যেন বলছিলাম! জি. এম.—না! জি. এম-এর মনোভাবটা আনন্দ নয় খুশীর নয়, সত্যি সত্যি গর্বের। বললে কি জানেন, ককক্রফট?—বললে ঃ আমার ফ্যাক্ট্রীতে আর গ্র্যাজুএট নেই। আর একটি মাত্র আছে। জানো, সে-ও ইণ্ডিআন! সেন গাপ্টা।

হেসে বলেছিলাম—নট ওনলি ইণ্ডিআন, খাস বাঙালী একেবারে। ঐ যে, কস্ট য্যাণ্ড য়্যাকাউণ্টসে ট্রেনিংএ আছেন যিনি! আলাপ হল সেদিন।

ককক্রফট বললেন ঃ তুমি তারো চেয়ে বিস্ময়ের—ইনজিনিআরিংএর গ্র্যাজুয়েট। তায় আবার মেয়ে। সত্যি বলতে কি আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা এসেছে কতোদিন। কিন্তু তবুও মেয়েদের মধ্যে ইনজিনিআর পাবে না। পাশ করা তো নয়ই। মেশিনিস্ট পাবে—মেশিন ঠেলছে অনেক মেয়ে। তা তো দেখতেই পাচ্ছ!

আমি বললাম ঃ আচ্ছা, মেশিনিস্টরা কতো রেট পায়।

শীলা বলত ঃ আমাদের মতো এতো গ্রেডেশান নেই। আনস্কিলডও নেই এতো সংখ্যায়। তার কারণ আছে। আমাদের চেয়ে যান্ত্রিকতায়

অনেক বেশী উন্নত ওরা। মেশিনারীও অনেক পরিমাণে বেশী আধুনিক। আধুনিক মানেই—অটোম্যাটিক, স্বয়ংক্রিয়। সে সব মেশিনে মেশিন ঠেলার দরকার নেই। আপনি চলছে। উৎপাদন দিচ্ছে আপনি। এক একটি অপারেটার দেখা শোনা করছে আট দশটি মেশিন। ঘুরে ঘুরে দেখছে। যেটি বন্ধ হচ্ছে, চালু করে দিচ্ছে সেটি। মাপ নিচ্ছে ফিনিশড প্রোডাক্টের। গেজ করছে মাঝে মাঝে। যে মেজারমেণ্টে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল মেশিন নেমে যায়নি তো তা থেকে! ব্যস। তা হলেই হোল! কেটে যাচ্ছে কেটে যাক। কাজেই ওখানকার কাজ সবই প্রায় স্কিল্‌ড্। সেমিস্কিলড্ আছে কিছু কিছু। কিন্তু কমই। মেশিনিস্ট বলতে আমরা যা বুঝি সে রকম মেশিনিস্ট বিশেষ কিছু নেই ওদের। মোটামুটি সি, বি, এ—এই তিন ক্লাস। বছর সতেরো আঠারো বয়সের ছেলে ট্রেনিংএ ঢুকল। পাঁচ বছর। সামান্য এদের ইনিশিআল এডুকেশান। নাইট স্কুলে পড়ে। মাতৃভাষার জ্ঞান, সামান্য কিছু এরিথমেটিক, এই সব আর কি। একটা জিনিস এরা শেখে। ড্রইং। ইনজিনিআরিং পদ্ধতি থেকে আইসোমেট্রিক ভিয়ু, থার্ড অ্যাঙ্গল প্রোজেকশান—ঐ নাইট স্কুলে বাদ যায় না কিছুই। ড্রইংটা গুলে খায় ওরা। একটা ডাই-এর ভিয়ু আঁকতে আমি-আপনি হিম সিম খেয়ে যাবো। ওদের নাইট স্কুলে পড়েই আইসোমেট্রিকের এমন কাণ্ডজ্ঞান হয় যে টপ টপ এঁকে দেবে। চোখ খুলে দেখবেন এমন এঁকেছে—আপনার চোখের সামনে ডাইখানা বসিয়ে রেখেছে যেন।

: এই সি-ক্লাসে তো সুরু ?

: হ্যাঁ। সি, বি, এ—কোন ক্লাসেই ডাইরেক্ট রিক্রুটমেণ্ট নেই। ঐ ট্রেনিং পাশ করতেই হবে। তারপর আর বয়সের বিচার নেই। শুধ্ এফিশিয়েন্সি। না শুধু এফিশিয়েন্সিই নয—ব্রেন, ট্যাক্ট এনার্জি-ও। সি ক্লাসে দেখুন গে ষাট বছরের বুড়ো রট্ করছে। এ ক্লাসে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের ছোকরাকে দেখতে পেলে আশ্চর্য হবার নেই। রেট ? বাঁধা ধরা তেমন নেই কিছু। আবার বছর বছর ইনক্রিমেণ্টের সিস্টেমও নেই। পেলে তো পাউণ্ড দুইই পেয়ে গেলে ইনক্রিমেণ্ট। আবার একটা ইনক্রিমেণ্টও পায় নি—এমন লোকও যথেষ্ট। পাউণ্ড পাঁচেক-এ আরম্ভ করে সাধারণতঃ—

: হপ্তায় তো!

হাসল শীলা : পাঁচ দিনেও বলতে পারেন।

: কি রকম ?

: সোম থেকে শুক্কুর। শনি রবি ছুটী সাধারণ লোকের। ঐ পাঁচ দিনেই বেশী কাজ করে শনিবারের ঘণ্টা পুরিয়ে দেয়। ঠাণ্ডার দেশ বলেই সম্ভব হয়। একজশ্‌শান কম হয়। ঐ পাঁচদিন খাটেও গাধার মতো। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যে স পাঁচটা। মাঝখানে লাঞ্চের ব্রেক—এক ঘণ্টা। শুক্কুরবার বিকেলে ছুটা পেয়ে যায়। বেরিয়ে পড়ে দুদিনের গাড়িতে। স্টেশন ছেড়েই চলে যায় হয় তো—

বলি : পাউণ্ড পাঁচেক মানে ডি-এ নিয়ে তো!

শীলা বলে : ওরা ডি-এ বলে না—বলে কস্ট অব্‌ লিভিং য়্যালাওয়ান্স। পাউণ্ড পাঁচেক তো ডেইলী রেটের হিসেব। আসলে প্রায় সবাই তো পিস ওয়ার্কার—ফুরণের কাজ। আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। টুল শপে সব ডেইলী, ফুরণের হিসেব নয়, রোজের হিসেব। অন্য সব ঘরেই ফুরণ। এই কটা কাজ করতে পারলে এতো। কাজের এই এই প্রক্রিয়ার দাম দু'পেনী। যতো করতে পারো—পয়সা তোমারি। হাত চালাও হাত চালাও। ডেইজি সামার হ্যাট চেয়েছে একটা। ঐ যে লণ্ডনে গিয়ে সেলফ্রিজএ দেখে এলো—স্ট্রয়ের তৈরী। তা শিলিং আঠারো দাম। তুলে নাও সেই পয়সাটা—

ফুরণ কাজের লোকের হাত এতো চালু যে, মাইনেটা গুণে নেবার সময় পর্যন্ত পায় না।

অবাক হই : সে কি। তা হলে পেমেণ্টের দিন পে টেবিলে করে কি ?

শীলা বলত : এই সিস্টেমে পেমেণ্ট হয় না তো। মেয়েরা শুক্কুরবার বিকেলে ট্রেতে মাইনে সাজিয়ে 'শপে' গিয়ে দিয়ে দিয়ে আসে। কাজ করতে করতে—ডান হাতে মেশিনের চাকা—বাঁ হাতে মাইনেটা পকেটে পুরে নেয়। একটা শাদা কাগজে কোন রকমে একটা সই করে দেয়। মাইনেটা সাজানো থাকে ছোট্ট একটা কাগজের প্যাকেটে। আঁটা-কাগজ দিয়ে মুখ বন্ধ। তার মধ্যে ছাপানো বিল। বিলে সব হিসেব দেখানো। এই এই কাজ করেছো তার দাম এই। দুসরা রকমের এই এই কাজ তার দাম এই। কাটা গেছে এই এই। হাতে পেলে এই—

: নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে প্যাকেটটা বাড়ী নিয়ে যায়। মাইনে কম হয় না।

আবার, ম্যানেজমেণ্টও সামান্য এক টুকরো কাগজে সই পেয়েই নিশ্চিন্ত। এই সই মানে—বেতন প্রাপ্তির স্বীকৃতি। দেখুন উভয় পক্ষের বিশ্বাস কতো বেশী। ফোর-টোয়েণ্টির কারবার পাবেন না। অথচ, য়্যাভারেজ ইনটেলিজেন্স বা এডুকেশান কোনটাই আমাদের দেশের য়্যাভারেজ ওআর্কারের চেয়ে উঁচু দরের নয়। এডুকেশান একটু হলেও ইনটেলিজেন্স তো নয়ই। অথচ ঐ রকম একটা জাত দুশো বছর পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখে গেল আমাদের। শাসন করে গেল—চোখ রাঙিয়ে। তাই ভাবি, কি করে সম্ভব হল ?—দেখুন ইনটেলিজেন্স বেশী নয়, এডুকেশানও নেই। মনে প্রাণে জানে হঠাৎ হাতী-ঘোড়া একটা ইনকাম এসে পড়বার চান্সও নেই। দারিদ্র্যের চেহারাটা আমাদের দেশের মতো এতো ভয়াল নয় নিশ্চয়। এদেশের মতো অনশন অবধি না পৌছলেও অভাব অভিযোগ তো আছেই। তবু চোখ বুজে মাইনে নেয়—কাগজে মোড়া প্যাকেটে। বাড়ী যেতে যেতে বাসে বা টিউবে বসে এ চিন্তাটা হয় না যে কাল গিয়ে বলবো—বারো পাউণ্ড পাই নি—পেয়েছি দশ। শিলিং পেন্সের খুচরোটা ঠিকই ছিল। আমার আরো দু পাউণ্ড দিন।—আজো পর্যন্ত কেউ বলেনি। আর আমাদের এদিকে! মাইনের টেবিল থেকে এক পা ওপাশে গিয়েই ঘুরে দাঁড়ায়। টেবিল পিছন করে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে গুণে নিচ্ছে। আসলে পকেট থেকে কালকে পাওয়া অচল আধুলিটা বের করবার ছল ওটা। এই ধরণের অনেষ্টি আর সিন্সিআরিটিতে অনেক অনেক পিছনে আমরা। পিছনে নই শুধু—ডিমরালাইজড—

ঃ কোন ফ্যাক্ট্রীতে শুনেছি মাইনের প্যাকেট সাজানো থাকে গেটে। একজন পে-গার্ল থাকে বটে। সে আছে তোমার প্যাকেটটা খুঁজে পাবার সাহায্য করতে। তুমি ইচ্ছে করলে—টম ডিক হ্যারি যার মাইনে অনেক বেশী তার প্যাকেটটা টুক করে তুলে নিতে পারো। কিন্তু কেউ তুলে নেয় না অন্যেরটা। এইটেই বোধহয় শাসন যে করে গেল তার অনেক কারণের একটা। চরিত্রবল।

জিজ্ঞেস করি : আপনি কি বলতে চান তা হলে, ম্যানেজমেণ্ট আর ওয়ার্কারে কোথাও অবিশ্বাসের কারণ ঘটে না। রামরাজ্যের কাছাকাছি-তা হলে বলুন—

একটু ভেবে নেয় শীলা। বলে : না, তা ঠিক নয়। যেমন য়্যাটেনড্যান্স।

ঘড়িতে কার্ড পানচিং। তোমার নামের কার্ডখানা তুলে নাও। ফুট দুই খাড়াই দোলকওলা ঘড়ি। তাতে কার্ডের একটা দিক ঢুকিয়ে দেবার স্লট আছে। কার্ডখানা ঢুকিয়ে হাতল টেনে দাও। দিনের নাম আর সময় বেগুনী কালিতে মুদ্রিত হয়ে গেছে। আবার স্ফুরণ কাজের লোকেদের কিন্তু গেটে একবার শপে আর একবার, দুবার কার্ড পাঞ্চ করা। আমাদের দেশের উল্টো। রোজ মাইনেওয়ালাদেরই আমরা নজর রাখি—ফাঁকি দেবে তারাই। ফুরণওয়ালাদের দিকে ফিরেও তাকাই না। তার উপার্জনের পাঁঠা ন্যাজেই কাটুক মুণ্ডুতেই কাটুক আমাদের দেখার দরকার নেই।

আলোচনায় আলোচনায় জেনারেল ম্যানেজারের গল্প থেকে অনেক দূরে চলে এসেছিলাম। খেই ধরিয়ে দিইঃ তারপর জি. এম. তো খুব খুশী। থাউকো একটা ইনক্রিমেণ্ট-টেণ্ট দিয়ে দিলেন নাকি?

ঃ আরে রামো! গ্র্যাজুএট তো সেখানে মিস-ফিট। সেখানে গ্র্যাজুএটের দরকার? বিন্দুমাত্রও নেই। সেখানে দরকার ফ্যাক্টরীতে ট্রেনিংওলা লোক।

ঃ কেন? রিসার্চ ওআর্কের দরকার হয় না? একটা মেশিন ডিজাইন করা—তার ক্যাম, একসেনট্রিক ক্র্যাংক ইত্যাদি স্পীড কষে বের করা। এ-সবের জন্য গ্র্যাজুএট দরকার হয় তো!

ঃ না গ্র্যাজুএটে কুলোয় না। ডক্টরেট হলে ভালো হয়। তার জন্য অনেক 'স্যারে'রা আছেন। মেশিন ডিজাইন করা, কনস্ট্রাকশানাল ডিটেলস বের করা। ইন ফ্যাক্ট—ককক্রফটেরই তো কোন ডিগ্রী অবশ্য নেই, কিন্তু অদ্ভুত প্র্যাকটিকাল ম্যান! অদ্ভুত শার্প ভদ্রলোকের ব্রেন। ও দেশে অমুক বড়লোকের শালা, অমুক বিখ্যাত লোকের ভাইপো, অমুক মন্ত্রী-উপমন্ত্রীর জামাই বা ছেলে, ভাগ্নে হলেই বড়ো কারখানার জেনারেল ম্যানেজারী পাওয়া যায় না। সত্যিকারের থিওরী অব মেশিনসের বিরাট কাণ্ডজ্ঞান থাকা চাই। নতুন মেশিন আবিষ্কারের ব্যাপারে কনট্রিবিউশান থাকা চাই—

বলিঃ ককক্রফট আর কি বললেন?

ঃ জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় থাকি? বললাম ঃ মিড্‌লসেক্সেই—কোভেন্টি। কোভেন্ট্রিতে বার্মিংহ্যাম হে-জ ইত্যাদি মিলিয়ে মিডলসেক্স। মিডলসেক্সই হল সাহেবদের ইনজিনিআরিং ফ্যাক্টরী আর ইনজিনিআরদের পাড়া। সাহেব বললেঃ কেন? বাসে করে চল্লিশ মিনিট—এই কুড়ি মাইল রাস্তা ঠেঙাও

কেন রোজ দু'বেলা ? সময় পয়সা শরীর সবই নষ্ট। বললাম : বার্মিংহ্যামে পাচ্ছি না যে জুৎ মতো। ও মেসবাড়ী-টাড়ী পোষায় না আমার। কারো পেয়িংগেস্ট হতে পারলে—চাই! হেনরী কি বললে জানেন? বললে : থাকবে আমার সঙ্গে ?

হেসে ফেললাম আমি। তখন জোর গলায় হাসাব মতো ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। খুব খানিকটা হেসে নিলাম, যদিও এতো হাসি পাচ্ছিল না। বললাম : বিশ্বাস করুন, প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম আমি। তা ককক্রফটের বয়স কতো ?

চোখের কোণে কপট ভর্ৎসনার বিদ্যুৎ হেনে শীলা বলল : ভারী অসভ্য তো আপনি!—বয়েস তখন কতো আর? ওদের বয়স ধরা যে ভারী মুশকিল। পঞ্চাশ বাহান্ন—আর কতো। হলো এবার ?

: কি হল ? হলটা কি ? বিলেতের এক একজন রাষ্ট্রনায়ক কতো বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করেন ? দেখেছেন তো।

: বুড়ো মানুষ, কোম্পানীর ম্যানেজার। একটি মেয়ে কর্মীর দুঃখ দুর্দশা দূর করবার ইচ্ছে যদি প্রকাশ করেই থাকে। অন্যায় করেছে খুব ? কী যে আপনি!—

: পরে অবশ্য কোভেন্ট্রি থেকে বার্মিংহ্যামেই উঠে এসেছিলাম। কিন্তু বার্মিংহ্যামে আসার কিছু পরেই আবার বাসে করে যাতায়াত করতে হল। এবার উল্টো। বার্মিংহ্যাম থেকে কোভেন্ট্রি। উইকম্যানে ঢোকার পর আবার যাতায়াত। উইকম্যান হল কোভেন্ট্রিতে। যতদিন ছিলাম, বার্মিংহ্যাম ছাড়ি নি আর। ল্যাণ্ডলর্ডটি বড়ো ভালো লোক ছিলেন। বড়ো নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিরোধী বুড়ো মানুষ। মিঃ কুক। ভদ্রলোক এক্স-আর্মিম্যান। চোখ দুটো দেখলে মনে হত—এখনও উনি ফিল্ডে আছেন। এখনও যেন বোমা পড়ছে শেল ফাটছে অদূরে। চোখ দুটোর মণিতে কি এক শঙ্কিত জিজ্ঞাসা যেন—পরেরটাই আমার মাথায় পড়বে না তো! তাই যেন মায়া পড়ে গেল।

বললাম : সত্যি বলবেন একটা কথা ?

মুখ টিপে হাসছিলাম আমি। দেখে শীলাও হেসে ফেলেছিল। বলেছিল : বলুন না! প্রশ্নটা শুনে বিচার করব—য়্যাট অল বলব কি না। বললে অবশ্যই সত্যি বলব। মিথ্যে বলতে যাবো কেন ?···তা অতো ভূমিকা কিসের ?

বললাম : আপনি বার্মিংহাম ছাড়তে পারেন নি কুকের বাড়ী ছাড়তে পারেন নি বলে। কুকের বাড়ী ছাড়েন নি গ্রুবার্ট ছিল বলে! তাই না—

কি এক অদ্ভুত চোখে তাকালো শীলা। চমকে গেল যেন। কথা বলতে পারল না কিছু সময়। তারপর ফিরে এলো নিজের মধ্যে, গুটিয়ে নিয়ে এলো নিজের মন।

একটু যেন গম্ভীর শোনাল আমার 'বস'-এর গলা একটু গভীর, প্রশান্ত। বলল : হ্যাঁ তাই। কিন্তু সেট, আর কিছু নয়। ছেলেটা জার্মান, পাত্তা পায় না কোথাও। মুখে দূর-ছাই করে না বটে কেউ—অন্তরে অন্তরে করে। থাকার জায়গার অভাব। তাইতো চেস্টনাট শেড ক্যানটিনের সঙ্গীকে আমারই বাসায় এনে তুলেছিলাম। সেটা তার অসহায় অবস্থার জন্যে, আর কিছুর জন্য নয়।

তখনও হাসছিলাম ঠোঁট টিপে। হাসি বন্ধ না করেই বলেছিলাম : মনের একটা বিশেষ অবস্থায়, অত্যন্ত অসহায় মনে হয় নিজেকে। সে তো অন্যায় নয়! একটা হাহাকার ভরা ভালো লাগা, একটা দিনরাত্রির অস্বস্তি করা ব্যথা।

অনেক দূর থেকে ফিরে এলো শীলা, এলো যেন অনেক আকাশ পরিক্রমা সেরে। গলার আওয়াজও তেমনি দূরবগাহ।

শীলা বলল : আমি ভাবছি—সে সব নয়। আমি ভাবছি, আপনি জানলেন কি করে?

ওরই নানা দিনের টুকরো কথার সার সংগ্রহ করে আমার আন্দাজী ঢিল ওটা। আবিষ্কার তো নয়ই। অন্ধকারে ঢিলটার লক্ষ্যভেদের কৃতিত্ব।

মাথা নেড়ে বললাম : হুঁ-হুঁ গুণতে পারি যে! আপনার কপালের ফরমেশান দেখেই ব'লে দিয়েছি।

এরপর শীলা সেদিন যতোই সহজ আর স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে থাক—পারে নি। হাসি হেসেছে মুখ থেকে, প্রাণ থেকে নয়। কথা কয়েছে—অন্যমনস্ক!

একদিন আরো কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে আমাকেও লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছিল শীলা।

শীলা আমার বস্। তার বাড়ীতে কাজ! আমায় কাজে লাগতে হয়।

অন্ততঃ সাহায্য করতে চাইতে হয়। যেচে ভার নিলাম—জোগাড় করে দেবো ক্রকারী, গ্রীবালের দোকান থেকে এনে দেবো ফার্নিচার। ফার্নিচার মানে ডিনার টেবল, টেবল ক্লথ, একস্ট্রা চেআর খান-বারো, ফ্লাওয়ার ভাস গোটা দুই। এইসব আর কি!

রবিবার। সেই বিহারী শহরে শীতান্ত নেমেছে। টেম্পারেচার ষাট পঁয়ষট্টি ওঠে দিনের বেলায়। বেশ মিষ্টি-ঠাণ্ডার দিন।

দশটা না বাজতেই গেলাম। এটা ওটা দরকার হতে পারে। দরকার হতে পারে শহরে যাবার! 'বস'-এর উপকারে লাগা যাক। প্রসন্ন হলে চাকরীর উন্নতি করে দিতে পারে!

রান্নাঘর থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে রান্নার। গোয়ানিজ কুক পিটার গোমেজের রান্নার হাত ভালো। কুক্কুট মাংস সুস্বাদুই হবে আজ।

একটা ছোট্ট চড়াই-এর মুখে শীলার বাংলো। ধুতি চাদর পরে এসেছি মনের আনন্দে এসেছি শিস দিতে দিতে!

কম্পাউণ্ডের বালাই নেই বিশেষ, ওরি মধ্যে লোহার গেট একটু।

গেট খুলে কম্পাউণ্ডের দিকে তাকাতেই নজর পড়লো বারান্দায়।

শীলা বসে আছে বেতের চেআরে। একা। সামনে বেতের টেবিল—কাছে যেতেই অভিবাদন প্রত্যভিবাদনের পালা শেষ হলো। শীলার মুখ নজর করে দেখি বেশ যেন গম্ভীর। কি হলো আবার সাত সকালে! কাজের বাড়ী—গৃহকর্ত্রী একা মানুষ। কাজ কম্মো না করে একা বসে কেন বারান্দায়! গেস্টদের আসতে অবশ্যই দেরী আছে। খাওয়ানো তো কাজ! তারা না এলে কাজই বা কি। তা হলেও ধরণ ধারণটা ভালো লাগল না। বসে থাকার ভঙ্গী, মুখের ভাব—কোনটাই সুবিধের নয়।

মুখে বললো বটে, এসো এসো পিয়ারলেস, বসো—বলেই কিন্তু চুপ করে গেল আবার। গম্ভীর হয়ে গেল। অনেক দূরে চলে গেল ফের, যতোদূর থেকে এসেছিল তার চেয়েও বেশী দূরে।

এ আর ইংরিজির ইউ নয়। বাংলায় তুমি। আপনি-র দূরে সরিয়ে রাখার ভদ্রতা থেকে তুমি-র অন্তরঙ্গতায় উত্তরণ। খুশী হলাম। যে আছে বুকের কাছে কাছে—এই লাইনটি মনে পড়ে গেল। তবে কি হরিদ্বারের সাধুর ভবিষ্যৎবাণী—থাক। আর ভাবতে সাহস পেলাম না। এমনি করেই আগাম চিন্তা করে করে সব খোয়াই আমি।

বললাম : চিন্তিত দেখছি যেন! কেন বলুন তো, কি হোলো।

বলতে বলতে নিজের মনই গেয়ে উঠল, এ আমার অনধিকার চর্চা হয়ে গেল না তো? তাই সঙ্গে সঙ্গেই জুড়ে দিলাম : অবশ্য জিজ্ঞাসা করার সাহস যদি দেন।

মেঘলা সকালের ম্লান রোদের হাসি হাসল শীলা।

বলল : জিজ্ঞাসা করার আবার সাহস দিতে হয় না কি! আপনার জিজ্ঞাসা আপনি করবেন। বলবার হলে বলব নইলে বলব না। আপনি যে মৌখিক ভদ্রতায় সাহেবদের ছাড়িয়ে গেলেন দেখছি!

বললাম : না—মানে, আপনার মনোরাজ্যে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টায় ট্রেসপাস চার্জে পড়ে না যাই, সেই আশঙ্কা করছিলাম। দরকার কি গাল বাড়িয়ে চড় খাবার! তবে সাধারণ ভাবে কারো মুখ বেজার দেখলে আমাদের মুখ থেকে আপনিই এই প্রশ্নটা বেরিয়ে যায়—

শীলা আমাকে শেষ করতে না দিয়ে বলল : কেন জানেন? আমরা অত্যন্ত বেশী আন্তরিক। আমরা যা ভাবি তাই বলি। তার ছাপ পড়ে আমাদের মুখের রেখায় রেখায়। চোখের তারায়, ভ্রূর সন্ধিতে। আসলে আমরা লোক হিসেবে অনেক ভালো পাশ্চাত্যের থেকে। ওরা অন্তরে অন্তরে ঘৃণা করে আমাদের। গায়ের রং থেকে চলন-চালন, সামাজিক রীতি থেকে বিবাহ পদ্ধতি। আমাদের দেব-দেবী থেকে দেব-দেবীর মূর্তি, আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাস—সব, সব। কিন্তু মুখে! দেখে মনে হবে—আহা, ইণ্ডিআন অন্ত প্রাণ। গ্রেট কানট্রি গ্রেট পীপল। ছাই। আসলে ওদের মূল এবং সার বক্তব্য—কার্টসি ডাজ নট কষ্ট ইউ এনিথিং। কোন দোকানে গেলেন যতো বড়ো দোকানেই যান! যতো সামান্য কাষ্টমার হয়ে যান না কেন। সবচেয়ে বড়ো ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে দুপয়সার ছুঁচ কিনতে। ঢুকতেই এগিয়ে এলো রিসেপশানের লোক। একটি মেয়ে—মুখে মিষ্টি হাসি। বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি? ভাবখানা, আপনি যদি বলেন তো রাস্তার মধ্যিখানে গিয়ে বাসের তলায় প্রাণটাই দিয়ে দিতে পারে মেয়েটা। কী না করতে পারে আপনার জন্য। প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। ঠিক অতোখানি উদ্ভট না হয়েও আপনি একটি দুর্ঘট কিছু বললেন বা চাইলেন। এমন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ওলটাতে লাগল যে আপনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এটা টানছে ওটা হাঁটকাচ্ছে। এটা দেখাচ্ছে ওটা বের করছে। একে জিজ্ঞেস করছে ওকে শুধোচ্ছে। অনেক

চেষ্টার পর তারপর বলবে, দুঃখিত, কিছু করতে পারলাম না'। মুখের ভাবও তাই। আপনার জন্যে কিছু করতে না পেরে মরমে মরে যাচ্ছে বেচারা। যদিও অনেক আগেই জানত, প্রথম থেকেই জানত—আপনার পছন্দমতো জিনিষটি নেই তার দোকানে। প্রথমে দরজায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি টের পাননি, কিন্তু ঘটনাটা ঘটে গেছে। আপনি মাকড়সার জালে পা দিয়ে বসে আছেন। ভদ্রতা সৌজন্যের মাকড়সা অতি আস্তে অতি নিশ্চিত পথে ঘিরে ধরেছে আপনাকে! তারপর ও পাড়ায় গেলে—ছোট বড়ো যে কোন কারণে—ঐ দোকানে পদার্পন করতেই হবে আপনাকে। ও দোকানে এক-বারটি না গিয়ে—আসুন দিকি আপনি ও পাড়া থেকে।

বললাম : সেটা কি মন্দ।

শীলা বলল : মন্দ বলি নি তো আমি! ওরা সব জায়গায় অভিনয় করে চলেছে। ওদের পকেটে ভদ্রতার মুখোশ। সর্বদা পরেই আছে! মনে যাই থাক—মুখের রেখায় টের পাবেন না আদৌ। আর আমরা ভালো হই মন্দ হই, নীতিসুধার নীতি বাক্য অনুসরণ করে চলেছি! সর্বদা সত্য কথা কহিবে। ওরা আর একটা জিনিস দিয়ে মন হরণ করে আপনার! সার্ভিস।

শীলা বলে যাচ্ছিল, শুনতে শুনতে ভাবছিলাম—মুখ ভার কেন? একটি ছোট্ট জিজ্ঞাসার উত্তরে এতো কথা আসছে কি করে! আসল উত্তর চাপা দিতে, এড়িয়ে যেতে চায় নিশ্চয়ই। নয়তো এমন ঘটনা এই কথার মূল বক্তব্যে পরোক্ষে জড়ানো—যে ঘটনা বা লোকের কথা-সর্বস্বতা শীলাকে চিন্তিত ব্যথিত করে তুলেছে।

বাম মণিবন্ধে আভরণ বলতে ঐ একটিই শীলার। ছোট্ট একটি ঘড়ি। তাকিয়ে দেখলাম নতুন করে। কারণ আমার মনোযোগ নিয়ে ফেলল শীলা ঐ মণিবন্ধের ওপর—নিজে ঐ দিকে তাকিয়ে আরবার মণিবন্ধটা একটু তুলে ধরে।

শীলা নতুন করে কথা সুরু করার আগে মনে মনে ভাবছিলাম। ঐ নিটোল মণিবন্ধ, সুন্দর ফোর আর্ম এসে মিশেছে যেখানে—সেখানে কি শুধু ছোট্ট একটি ঘড়ি মানায়? দুটি সোনার চুড়ি, একটি শাঁখা—লোহা না হয় বাদই গেল, খুব বেমানান দেখাবে কি? কিন্তু এ ম্যাসকুলীন মেয়েকে বাঁধন পরাবে কে?

শীলার কথা বলার ধরণটি এতো সুন্দর! ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে শোনা

যায়। শ্রোতাকে ক্লান্ত করে না। শীলা আসবার পর থেকে কথামৃত শুনেই তো দিন কাটছে।

শীলা সুরু করল: এই যে ঘড়িটি দেখছেন, বিলেত যাবার আগে কলকাতায় কেনা। এমন কিছু দামী ঘড়ি নয়—সস্তাই। রোমার। সস্তা হলে হবে কি! বেশ সুন্দর টাইম দিত, এখনও দেয়। মাঝখানে একদিন—ওখানকার কথা বলছি, সাড়ে পাঁচটায় উঠতুম ওখানে—যথা নিয়মে ঘুম ভেঙে গেছে। ঘড়িতে দেখি নটা। জানলা খুলে তাকিয়ে দেখি কুয়াশা-ঘেরা জগৎ কারখানায় যাবার জন্য উঠি উঠি করছে। অর্থাৎ সাড়ে পাঁচটা পৌনে ছটাই হবে। ঘড়ির বুকে কান পেতে শুনি—নাড়ী চঞ্চল, হৃদস্পন্দন অত্যন্ত দ্রুত। হার্ট বিট বেড়ে গেছে। কি হলো? যা হবার হোক, এখন তো তৈরী হয়ে নাও। চলো তো কারখানায়। ম্যাকিনটোশের ছোট্ট পকেটে একটু ঠাঁই দিলাম তাকে। কাগজ মুড়ে সময়কে চোখের আড়াল করলাম। কারখানায় গেলাম। মনটা পড়ে রইল বাঁ রিস্টে। বার্মিংহামে যে গলিতে থাকতাম, সেই গলিতে ছোট্ট একটি ঘড়ির দোকান। বাড়ী যাবার পথে পড়ত। ইচ্ছেয় অনিচ্ছেয় চোখ পড়তই রোজ। একবার তাকিয়ে যেতাম। অগণিত ঘড়ি। দেওয়ালে টাঙানো, শো-কেসে রাখা, ওয়াল ক্লক-টাইমপিস—যে যার ইচ্ছে মতো চলেছে। কোয়াটার চাইমিং ঘড়ি বেজে চলেছে খেয়াল-খুশী মতো। ঘড়িদের স্বারাজ্য ওটা। নিয়ম আর শৃঙ্খলার বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েছে সময়। ওখানে ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিটের নিয়ম নেই। ঘণ্টা মিনিট ওখানে স্বাধীন। তারি মধ্যে শো-কেসে রাখা একটি পুরোন পকেট ওআচ। তলায় কার্ডবোর্ডে লেখা—কারেক্ট টাইম। সেটির দিকে আর নিজের মণিবন্ধের দিকে আপনি চোখ পড়ত। আমার নয় সবারই। সন্ধ্যেবেলায় বার্মিংহামে ফিরে ঢুকলাম দোকানটিতে। ঢুকতেই আই গ্লাস খুলে রেখে উঠে দাঁড়ালেন দোকানদার ভদ্রলোক।—বলুন আপনার জন্য কি করতে পারি?—বললুম। আজ সকাল থেকে চৌদ্দঘণ্টায় প্রায় বারো ঘণ্টা গেন করেছে। হেসে ফেললেন মিঃ মুরে: ভালোই তো—এই বারোঘণ্টা গেন করে ভদ্রলোক হয়ে গেলেই আপনার আর অসুবিধে থাকবে না। দেখি—হঠাৎ এতো ক্ষেপে গেল কেন? খুলে হাত বাড়িয়ে দিলাম। মিঃ মুরেও নিলেন। নিয়ে বললেন: আরে—আগে বসুন! এই যে এখানটায়। কিন্তু একটা মুশকিল হল যে। আমার দোকানে যে ছোকরাটি কাজ করে

—দেখেছেন তো! আপনি তো এই পথেই সকাল সন্ধ্যে যান। সকাল বেলা অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা হয় না।—হ্যাঁ, সেই ছোকরাটি বাড়ী গেছে আজ সকাল সকাল।···হাঁ করে তাকিয়ে আছি। তার বাড়ী যাওয়ার সঙ্গে আমার ঘড়ি মেরামতের সম্পর্ক খুঁজছি। বললাম: তাতে কি হয়েছে—আমি না হয় কাল কিম্বা যেদিন বলবেন সেইদিনই আসব। বলে উঠবার উপক্রম করছি। আবার আইগ্লাস খুলে ফেলতে হল ভদ্রলোককে। হা হা করে উঠলেন। তার জন্য নয়, আর একটু বসুন, একটুখানি। এই পাঁচটা মিনিট বসতে কি কষ্ট হবে খুব? অবশ্যই, সারাদিন খেটে খুটে আসছেন।—একটু বসুন। আবার আইগ্লাস পরে আমার ঘড়ির অনাবৃত হৃদযন্ত্রের বৃহত্তর রূপ দেখতে লাগলেন। মুখে বলতে লাগলেন: ছোকরাকে খুঁজছিলাম—আপনাকে একটা সফট ড্রিংক ট্রিংক কিছু দিতে পারলাম না! অফিস থেকে খেটে খুটে এলেন।—মুখে বললাম, অনেক ধন্যবাদ। সত্যি সে সবের দরকার হবে না।

আমি বাধা দিলাম: হায়রে আগামী জন্মে যেন নারী হয়ে জন্মাই। প্রথম ইলেকট্রিক ইনজিনিআর হবার এলেম নাও থাকে যদি, অন্ততঃ যেন বিলেতটা যাওয়া হয়। ঘড়ি মেরামত করাতে গিয়ে সফট ড্রিংক পাওয়া যাবে তা হলে।—আমি তো আপনাকে বলে-ই রেখেছি সুন্দর মুখের সর্বত্র জয়!

: আজ্ঞে না স্যর, মোটেই সুন্দর মুখ বলে জয় হয় নি। ও বুড়োর ধরণই ঐ। ছোকরাটি থাকলেও হয়তো ওর সফট ড্রিংক খাওয়াবার আর্থিক ক্ষমতা নেই। —ঐ কথা বলে খাতির করল। আর কিছুই নয়, ভদ্রতার অঙ্গ ওটা। শুনুন আগে সবটা। বসে আছি। সমস্ত সচল অথচ বিকল ঘড়িগুলোর চলার তালের সমন্বয় খুঁজছি! মিঃ মুরে বললেন—এই যে, আসুন। বললাম: তবে, বুঝি মেরামতের বাইরে চলে গেছে? কিন্তু চলছে তো এখনও! মিঃ মুরে বললেন: বা রে—বলছেন কি আপনি? ঠিক হয়ে গেছে। নিন, পরুন, বাড়ী যান। অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি মাপ করবেন ম্যাডাম। পার্স খুলছি। জানি না কতো বলে বসবে! বেস্পতিবার, হপ্তা পাবো কাল। শিলিং চার পাঁচের বেশী নেই পার্সে। বললাম—তা চার্জ কতো পড়ল? দেখি, আজ যদি না থাকে কাল দিয়ে যাবো। মিঃ মুরে বললেন কি জানেন? বললেন—চার্জ লাগবে না কিছু। আমার তো কোন জিনিষ লাগে নি। আপনার জিনিষ, সবই ছিল। সবই আপনার। একটু খুলে গিয়েছিল, একটার ঘাড়ে চড়ে গিয়েছিল আর একটা। সেইটে ঠিক করে দিয়েছি শুধু!

আমি বললুম ঃ কিন্তু আপনার সময় নষ্ট হল মিনিট দশেক। তার দাম নেই? আপনার এক্স্‌পার্ট ইনসপেকশান, আপনার খাটুনি! এ সব কিছুরই দাম নেই? সব ফ্রী? মনে রাখবেন—এ ডক্টর হ্যাজ টু লিভ টু। ডাক্তারেরা পাশ করে বেরিয়ে বিনি পয়সায় অনেক য়্যাডভাইস দিতে পারে। অনেক রোগী বাঁচাতে পারে। তাতে তার পয়সা খরচ নেই। কিন্তু তাকেও তো বাঁচতে হবে। ডাক্তার নিজেই যদি না বাঁচল রুগী বাঁচাবে কে! কাজেই।

মিঃ মুরে বললেন ঃ এ সবের –এই ছোট খাটো সার্ভিসের চার্জ নিই না আমি। মাপ করবেন—বসিয়ে রেখে কষ্ট দিলাম।

আমি গম্ভীর হয়ে বললুম ঃ মিস্টার মুরের বয়স কতো? বেশ ছেলে-মানুষ—মানে এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের মধ্যেই। না কি বলেন? উনি কি করে একজন তন্বী তরুণীর ঘড়ির হৃদযন্ত্র সারাই করে পয়সা নিতে পারেন! তা হলে হৃদযন্ত্রটি বিকল হয়ে যেত যে মিঃ মুরের নিজেরই।

আর গম্ভীর হয়ে থাকতে পারল না শীলা। হেসে ফেলল। তার গাম্ভীর্যও কপট আমার তো বটেই। শীলা বলল ঃ ওহে ফাজিল ছোকরা—শুধু বাড়তে দিচ্ছিলাম তোমাকে। তোমার ফাজলামো কতোদূর উঠতে পারে, তাই দেখছিলাম। মিস্টার মুরের বয়স পঞ্চান্ন-ষাটের কম নয়। তবে ঘড়িটা দেখলেই ওরই কথা মনে পড়ে আমার। প্রায়ই। কি ভদ্রতা! কি সৌজন্য।—সবটাই কেন, অন্তরের একটুও নয়। তা বুঝি! তবু মুখের কথারই কি দাম নেই? মুখের মিষ্টিরই কি দাম নেই? সে-মিষ্টিও তো অন্তরের অনন্ত সম্পদ হয়ে রইল! আমার থুতে মুরে অন্তত দশ বারোজন কারবার গেসেছে। ঐ মিষ্টি ব্যব্যহারের বিটার্ণ—

আমি বললাম। না বলে পারলাম না। সোডার বোতল খোলা হয়ে গেছে! কতোক্ষণ আর ভদ্রতার বুড়ো আঙুল টিপে দাবিয়ে রাখা সম্ভব তার উদ্ধত তেজালো বাষ্প।

বললাম ঃ আমার অনেকগুলি প্রশ্ন জড়ো হয়েছে। এক এক করে মিটিয়ে নিই। প্রথম, ইউ আর ব্লোওয়িং হট য্যাণ্ড কোল্ড। কখনও তুমি কখনও আপনি! যা হয় মন স্থির করুন—আমাকে কি বলে ডাকবেন!

হাসল শীলা ঃ তুমিই ঠিক রইল। তবে জানো তো আপনির পাহাড়-চূড়ো থেকে তুমির উপত্যকায় নামতে উপল নুড়িতে বাধো বাধো ঠেকে। তোমারও ঠেকে আমারও। আচ্ছা বাপু এখন থেকে তুমি।

ব্যাপারটা একটু ডেলিকেট নয়? তুমি-আমি স্ত্রী আর পুরুষের দুস্তর ব্যবধান বাদ দিলেও আপিসে একটা সম্পর্ক আছে। আমি যদিও স্ত্রী পুরুষের ব্যবধান মানি না, সে তুমি জানো! আপিসের পোজিশান হিসেব করলে আমি তোমাকে তুমি বললে তোমার মনে লাগতে পারে তো! তাই দেরী হল। বয়সে তুমি আবার একটু জ্যেষ্ঠই হবে—

ঃ জ্যেষ্ঠ নয় জ্যাঠা। আচ্ছা, আজ্ঞা করুন আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন করি।

শীলা বলল ঃ তুমি আপনি দুপাশে দুরকম হয় না। দুপাশে একই রকম—তুমির উত্তর তুমিতেই। কেমন! আচ্ছা আউট উইথ ইওর সেকেণ্ড! দু নম্বরটা কি?

বললুম ঃ তার আগে য়্যাশুওর‍্যান্স চাই। চাকরী খেয়ে দেবে না তো, পান থেকে চুণ খসলে!

শীলা হাসল হো হো করে ঃ পান থেকে চুণ খসলে নিশ্চয়ই নয়। দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসলে—অবশ্যই। মনের মণি-কোঠার দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসিয়ে ইটের কুশ্রী চেহারাটা অনাবৃত করতে চাইলে নিশ্চয়ই আরাম পাবো না। তাই বলে তোমার চাকরী খাবার মালিক আমি নই; এখন বল দেখি বাপু ভূমিকা বাদ দিয়ে—

শুধোই ঃ মনটা এতো হাসি খুশীতেও গুমরে আছে কেন? মেঘ জমা হয়ে আছে, গুর গুর ডাক সুরু না হলেও। মনের বেদনাটা কি, আর কেন? —এই আমার প্রশ্ন!

ক্লান্ত দেখাল শীলাকে। নিঃশ্বাসও পড়ল একটা। বলল ঃ জানো তো, মনটা যখন ভারী—ঠিক সেই মুহূর্তেই—কারোকে বলা চলে না তখন।

ঃ বলে ফেলতে পারলে উপকার হয় কিন্তু—বর্ষণে হোক আর উড়ে গিয়েই হোক—গুমোট কেটে যায়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক—বলাটা সেই মুহূর্তে কঠিনই। কিন্তু তোমার মতো খাপ-খোলা তলোয়ারের হলটা কি!

কি বলবে ভেবে না পেয়েই যেন, একটা অদ্ভুত উক্তি করল শীলা।

ঃ তুমি খুব ভালো, জানো অনুপম! এমন করে দরদ দিয়ে আমার কাছে কোনদিন কেউ জানতে চায় নি তো কিছু। তুমি তবু চাইলে।—খাপ-খোলা তলোয়ার। বেশ বলেছো! আচ্ছা, এতো উপমা থাকতে এইটেই ব্যবহার করলে কেন, অনুপম বলবে!

আমি বোধহয় উচ্ছ্বসিত হয়ে গিয়ে থাকবো। নইলে তোৎলাতে হবে

কেন? অমন জানা জিনিষ। অমন ভেবে রাখা উপমা। বলতে বোধহয় কিছু লজ্জা জিভে জড়তা এনে দিয়েছিল—

বললুম: মানে—মানে তোমার কেরিয়ার ক্ষুরের মতো, তলোয়ারের মতো। মানে এতো শানিত আর চকচকে—। আর তোমাকে দেখেই সম্ভ্রম জাগে, সঙ্গে সঙ্গেই বুক দুরু দুরু ভয়। মুণ্ডুটা ধড়চ্যুত হতে পারে যে কোন মুহূর্তেই। অথচ সে মৃত্যুতে তৃপ্তি আছে একটা। তোমার হাতে মরণে একটা আনন্দময় বেদনা, না ঠিক হল না—বেদনা একটুও নেই। শুধুই আনন্দ। একটা আনন্দময় শেষ। মানে ঐ সেই, এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো, সে মরণ স্বরগ সমান। সেই রকম আর কি। আরো দেখুন—মানে ঢাকা—দেয়াল তোলা নেই তোমার মনের। মানে খাপখোলা মুক্ত, রাখ-ঢাক নেই আর কি। সব দিক দিয়েই খোলা। খাপ খোলাও বটে তলোয়ার তো বটেই। ঠিক হয়নি উপমাটা?

একটা আলিস্যি ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙে নিল শীলা। ক্লান্তির পরিচয়—হাই তুললো একটা।

বললো: কি জানি ভাই। উপমাটা উপমেয়ের যোগ্য নয়—একটু বেন ভারী। বিশেষণের বাহুল্যে ভরাডুবি না হয়, ছোট না হয়, অতোবড়ো উপাদানটা। তাই যদি হয়ে থাকে, তা হলে স্টেনলেসের তরোয়াল হলুম না কেন। মরচে না ধরে এমন ষ্টিলের তৈরী। আচ্ছা, তোমার তিন নম্বর—

বললুম: ও—দু নম্বরটা মাঠে মারা গেল বুঝি। আচ্ছা থাক।

ও বুঝল কিনা জানি না, আমি চ্যালেঞ্জ করলুম। অর্থাৎ দেখি তোমার দু নম্বর কেমন তুমি লুকিয়ে রাখো।

তারপর বললুম: আচ্ছা, 'তুমি খুব ভালো, জানো অনুপম'—এ-কথা বললে কেন। আমি তো তেমন কিছু বলি নি। এর চেয়ে অনেক ভালো কথা শোনা তোমার অভ্যাস।

আবার বালুবেলায় রোদ পড়ল, বেলা শেষের নিস্তেজ মুমূর্ষু রোদ। অত্যন্ত করুণ দেখলো শীলার হাসি। যেন দাঁত বের করা কান্নাই ওটা।

বলল: শুনি নি আবার। হাজার হাজার বার শুনেছি—ঐ তো তোমায় বললুম, ভদ্রতার ভাষাগুলো রেকর্ড করা থাকে ওদের। গ্রামো-ফোনের রেকর্ডে, অধুনা টেপ রেকর্ডারেও বলতে পারো। দেখা হলেই, ঐ সেই হ্যাললো হাড়ুডুর পালা। দোকানে গেলেই—কি করতে পারি

আপনার জন্যে—বলেই বিগলিত ভাব। তুমি টেরও পেলে না, রেকর্ডে পিন চেপে গেছে। তোমাকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গেই। একটু একান্তে পেলেই ও শীলা ডিয়ার—কতো ভালোবাসি যে তোমায়! সব মুখের বাক্য! আর সত্যি হোক মিথ্যে হোক—রাদার, মিথ্যে বুঝেও ঐ কথাই বিশ্বাস করে নিচ্ছে ও দেশের দেবতারা, অন্তরের কথার ধার না ধেরে।

মনে মনে ভাবলুম, এই বচনসর্বস্বতাই নিশ্চয় শীলার মনোবেদনার কারণ। শুধু মুখেই বলেছে তারা—কাজে হয়তো করে নি কিছুই। সেই ব্যথাব মীড়ে আমার সহানুভূতির প্রশ্ন ঘা দিয়েছে। আর তাই বলেছে—তুমি খুব ভালো, জানো অনুপম। বললুম: কতো লোক এই রকম ছিল বিলেতে?

শীলা বলল: টম ডিক হ্যারি সবাই তো। সব শেয়ালের ঐ একই রা। আন্তরিকতা নেই তো। রেকর্ডে পিন চাপানো মেকানিকাল উচ্চারণ। মুখের কথা। বাজিয়ে দেখা, আমি সাড়া দিই কি না। টিউনিং ফর্ক যেন। ওর ফ্রিকোয়েন্সিতে আমার ফ্রিকোয়েন্সি কোরেসপণ্ড করে কিনা! প্রেমের মূল্য নেই বস্তুতান্ত্রিক দেশে! প্রেমের জন্যে আত্মহত্যা সব চেয়ে ওদেশেই কম। প্রেম ওদেশে প্রায় ডিকশনারীর ব্যাপার। বাস্তবিক সাক্ষাৎ কমই পাওয়া যায় ওটার। আমি একটা রোজগেরে মেয়ে। আমাকে পেলে আমার রোজগারের য়্যাডভান্টেজ পাওয়া গেল, প্লাস একটা মেয়েও। সেইটেই আসল। প্রেম করবে কি ওরা? প্রেমের জন্ম হৃদয়ে। ঐ জায়গাটাই নেই ওদের যে। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কও ঐ স্বার্থের লিকলিকে সুতোয় ঝুলছে! হৃদয়ের ব্যাপার-স্যাপারই নেই।

বললুম: তোমারই বুঝি আছে ও পদার্থটা?

শীলা বলল: সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করো নি তুমি, আমিও বলি নি—

খুব হাসল শীলা। হাসতে হাসতেই বলল: খুঁজে দেখি নি আছে কিনা ও জিনিষটা, খবর নিই নি তার। তাই ঠিক ধারণা নেই, আছে কি নেই! বলো না কোথায় আছে? খুঁজে দেখি।—এইখেনে? এইখেনে? বলে একবার মাথা একবার বুকে ইঙ্গিত করে দেখালো।

বললুম: লোকালয়ে যায় না পাওয়া তাকে। পাওয়া যায় না খুঁজে দিনের আলোয়। সে আসে নিজের নির্জনে—তারা যখন থাকে আকাশে। সে আসে নির্জন অবসরে, কিন্তু নিজেরই অগোচরে। কখন আসে, টের পাওয়া যায় না। কিম্বা—রাতের সমস্ত তারাই যেমন থাকে দিনের আলোর

গভীরে—তেমনি সর্বদাই সে থাকে। হয়তো সাবকনসাস্ মাইণ্ডে। রাতের নিরালায় বেরিয়ে আসে কনসাসের ওপর তলায়। দেখা দ্রষ্টব্যের গোচর হয়ে দাঁড়ায়, মনের আয়নার সামনে। তখন চাই কি কথাও বলা যায় তার সঙ্গে, প্রায় ধরা ছোঁয়া যায়।—কিন্তু শীলা, সত্যি কি হয়েছে তোমার বলো তো। অসুস্থ দেখাচ্ছে তোমাকে!

শীলা ভেঙে পড়ল যেন বেতের চেয়ারে। বলল: হয়তো তাই অনুপম! হয়তো সেই ব্যারামেই ধরল—বেঁচে থাকতে চাইছি যার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে!

অস্বীকার করব না আজ, ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিলাম। ব্যারাম? ছোঁয়াচ! ছোঁয়াচে ব্যারাম। তবে কি শীলার—! তাই বুঝি শীলার মুখের রং ফ্যাকাশে। পাণ্ডুর! তাই বুঝি এতো ক্লান্ত দেখায় শীলাকে। আলিস্যি ছাড়ল দু বার আমার সামনেই। আড়মোড়া ভাঙল। এ সবই বুঝি তারই লক্ষণ, তারই প্রকাশ! তাই পড়ে থাকে একলাটি। বাবা মা আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকে না সঙ্গে। এমন কৃতী মেয়ে—খাপখোলা তলোয়ার—সে একলা থাকে কেন! ইণ্ডিআয় দুর্লভ—সারা পৃথিবীর ইতিহাসে কটি আছে—গোনা যাবে হয়তো। তার একা থাকার কথা নয়। বাবা মা একজনও নেই? নাও যদি থাকে, ভাই বোন দাদা দিদি কাকা মামা পিসিমা কেউ নেই? তাঁরা তো আসতে পারেন! বেড়াতেও আসতে পারেন তো। এমন সুন্দর জায়গা। স্বাস্থ্যকর জায়গা। তাও তো কেউ এলেন না আজো!

তাই কি এতো জায়গা থাকতে, কলকাতা বম্বে মাদ্রাজ হিল্লী দিল্লী থাকতে, বেছে বেছে এখেনেই চাকরী নিয়ে এলো শীলা! জায়গাটার স্বাস্থ্য ভালো বলে।

সব জিনিসটা যেন স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে আসছে। হায়রে, তখন কি ভুলেও বুঝেছিলাম, এ ব্যারাম শরীরের নয়, এ ব্যারাম মনের। প্রত্যেক বয়েস-হওয়া ছেলে মেয়ে যে ব্যারামে দিনরাত কষ্ট পায়—এ সেই একই ব্যারাম!

চমক ভাঙল শীলার ডাকে: কি ভাবছো অতো?

হঠাৎ উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ল। তাই কি দেওয়া যায়? অমন একটা অসুখের কথা—কারো মুখের ওপর বলা যায় কি?

বাজে কথা বলে সময় নিলাম খানিকটা। মভাব হাসি হাসলাম মাড়ি বের করে। বললাম: কই না, কিছু ভাবি নি তো!

একটু চুপ কবে থেকে উপভোগ করে নিল শীলা আমাব মিথ্যার মিষ্টিটুকু। পরে বলল : মাপ কবো পিয়াবলেস, তোমাব হবিনামে বাধা দিলাম। চুপ কবে থেকে হবিনাম জপছিলে নিশ্চযই মনে মনে।

কথাটা মোড ফিবে গেল সহজেই। ভাগ্যিস শীলা চেপে ধবে নি—কেন চুপ কবে ছিলাম সে কাবণটা বলতেই হবে এই আবদাব কবে। আমাকে আবো মিথ্যে বলায নি শীলা—ধন্যবাদ তাকে।

হাসলাম। বললাম : মহাপাপ—মহাপাতক হলে তুমি। আব এমন পাপ কবো না। কেউ ধ্যানস্থ থাকলে খববদাব ধ্যান ভেঙো না তাব। বুঝলে তো।

আমাদেব জন্মভূমি ভাবতবর্ষ। বিশাল দেশ। আসমুদ্র হিমাচল এব বিস্তাব। দুদিকে দুটি হাত প্রসাবিত কবে দাঁড়িযে আছে। দুহাতে বিলোচ্ছে বব আব অভয। সমুদ্রেব জলে পা ডুবিযে, দাঁড়িযে আছে—সাগব জলে সিনান কবি সজল এলোচুলে। এলোচুল বয়ে বযে পড়ছে জল—অলকানন্দা, ভাগীবথী গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র—এলোচুলেব কতো স্তবক বযে। চবণ ধবে আছে বুকে—আধফোটা সিংহল-পদ্ম। হ্যাঁ, এই আমাদেব দেশ। এ দেশ আমাদেব বিশাল সন্দেহ কি তাতে? জনগণে বিশাল। কৃষিজাত দ্রব্যে বিশাল। খনিজ পদার্থে বিশাল। কুড়ি হাজাব মাইল জলপথে বিশাল। চৌত্রিশ হাজাব মাইল বেলপথে হযতো প্রযোজনেব অনুরূপ বিশাল নয। তবুও বিশালই। মনেব দুনিযাব বাইবেব জগতে যেদিকে তাকাই সেদিকেই হিমালয়েব অদ্বিতীয উচ্চতা, প্রহবী গিবিবাজেব মতোই উত্তুঙ্গ নির্ভয। সংস্কৃতি আব অন্তব সম্পদে বিশাল বিবাট আমবা, বিবাট আমাদেব ভাবতবর্ষ।

অন্তর সম্পদে বিশাল, অবণ্য সম্পদেও। আসামেব পার্বত্য অঞ্চলে, হিমালয়ের পাদদেশে, তবাই অঞ্চলে, পশ্চিমঘাটে, মালাবাব উপকূলে—কোথায নেই এই অবণ্য। মধ্যপ্রদেশে, উড়িষ্যায, বিহাবে, বাংলায কোথায় নেই।

অবণ্য মানেই অন্ধকাব। সব জায়গায হয তো বন মানেই সুন্দরবন নয, বাগ মাত্রেই হাজাবীবাগ নিশ্চয়ই নয। তবু অরণ্য মানেই অবণ্য মাত্রেই অন্ধকার।

অরণ্য সম্পদের তলায যেমন অন্ধকাব, অন্তব সম্পদেও হয়তো তেমনি

খানিকটা। প্রাচ্যের ঐতিহ্যের গর্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। কিন্তু আধুনিকতম বিজ্ঞানের দুনিয়ায় আমরা জ্ঞান সম্পদে দীন, পড়ে আছি পিছনে। এ-কথাও অস্বীকার করতে পারি না।

অন্তরের অন্ধকার দূর করব এই শপথ বা এমন দূরদৃষ্টি করকী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢোকার সময় ছিল না। কিন্তু বাইরের অন্ধকার দূর করব এই মহৎ প্রেরণাটা ছিলই। নইলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ঢুকব কেন? ঢুকলেও ইলেকট্রিকাল কোর্স্‌ই বা নেব কেন? আরো তো কোর্স আছে—

ইলেকট্রিকের নিজের অনেক চাকরগিরি আজকাল দেখতে পাই আমরা। এর সিকি ভাগ প্রসার ছিল না আমাদের ছেলেবেলায়। আজকাল দৈনন্দিন পথ চলার কাজে লাগাই একে। আমাদের ছেলেবেলায় একে পিদ্দিম জ্বালাতে বলতুম, আর পাখাটা-আসটা টানতেও বলতুম বড়োলোকদের বাড়ীতে। এই আলাদীনকে দিয়ে আলোটাই জ্বালিয়ে নিতুম সব চেয়ে বেশী।

অন্ধকার থেকে আলোতে আনার মহান ব্রত পালন করত ইলেকট্রিসিটি। তমসো মা জ্যোতির্গময়। এইটেই, ছেলেবেলায় দেখেছি, ছিল তার প্রধান কাজ।

আমাদের গ্রামে ছিল দেখেছি—কি অন্ধকার কি অন্ধকার। সন্ধ্যে না হতেই ঘুমিয়ে পড়ত গ্রাম। আলো থাকলে আরো তিন চারটি ঘণ্টা চব্বিশ ঘণ্টার কৃপণ তহবিল থেকে ছিনিয়ে নিতে পারত মানুষ। করতে পারত আরো অনেক দরকারী কাজ। জীবনের নিষ্ক্রিয় সময় কমিয়ে সক্রিয় সময় অনেক বাড়াতে পারত।

বাবা-দাদাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতুম শহরে—দেখতুম রাত নটা দশটায় বেড়িয়ে ফিরত লোক। এগারোটা বারোটায় ফিরত কাজ সেরে। অনির্বাণ জ্বলতো শহরের চোখের তারা। আকাশের তারার চেয়ে সংখ্যায় কম নয়। দীপ্তিতে তো অনেক বেশী। জ্বলতো রাস্তার গলিতে বাড়ীতে। জ্বলতো এখানে ওখানে দোকানে মোকামে। রাত হত না শহরে। কাজ করেই চলত।

শহরে যাওয়া আমার তখন ছিল পালে-পার্বণে, উৎসবে, ছুটিতে। সেই, জ্বলে দীপমালা নগরে নগরে-র চেহারাটা ভুলতে পারতাম না। গ্রামে ফিরে দিনে আর রাতে যে কোন সময়েই—তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।

একদা ম্যাট্রিক পাশ করলুম। গ্রাম আর আমায় ধরে রাখতে পারবে না। অন্ধকার থেকে যেতে পারব এবার আলোয়।

ইণ্টারমিডিএট পড়তে এলুম কলকাতায়।

তারপর ইঞ্জিনিআরিং পড়তে রুরকী।

সেই আলো আর আলোময়তার কথা ভুলতে পারলুম না—ইলেকট্রিকাল কোর্স-ই নিলুম।

ইণ্টারমিডিএটে ইলেকট্রিসিটির অংশ পড়তে এতো উৎসাহ পেতুম, বলার নয়। যেন সম্পূর্ণ নতুন এক জগতের সিংদরোজা খুলে গেল। ওরে বাবা, এ যে কতো কী! এ যে বিস্ময়ের শেষ নেই। এর কর্মক্ষমতার অবধি নেই। এর অসাধ্য কর্ম নেই। মানুষের প্রতিটি পা ফেলায় একে দরকার। মানুষের প্রতিটি হাতের কাজ কেড়ে নিচ্ছে, নিযে নিজে করছে। বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে বাধ্য অনুগত পুত্রবধূটি যেমন করে শাশুড়ীর হাতেব কাজ টেনে নিযে সম্পন্ন করে। ইলেকট্রিসিটি তা তো করছেই—করছে অত্যন্ত দ্রুত। নিজের চলা তো সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিযাত্তর হাজার মাইল। কাজও করে তেমনি।

সেই ইণ্টারমিডিএট থেকেই শ্রীমতি বিজলী রাণীর প্রেমে পড়ে গেলাম। আর আশ্চর্য! যা বলতাম তাই কবে দিত। গান গাইতে বললে গান গাইত, তেতে পুড়ে এলে হাওযা করত, চাযেব জল ফুটিযে দেওযা. দরকার লাগলে রান্না করা, ছুটে গিযে আত্মীয-স্বজনকে খবব পৌঁছে দেওয়া—এমনই কত কিছু! অবধি নেই তার। মনে হত প্রতি গ্রামে একে নিযে যেতে না পারলে আর কি হল।

তারপর রুরকীতে তো নেশাই ধরে গেল।

সেই নেশাই আজো চলেছে।

এমন যোগাযোগ হয না সাধারণতঃ। আমার ভাগ্যে কি করে হয়ে গেল তাই ভাবি।

এই অরণ্য ছাওয়া পাহাড়ে এসেছি সেই কাজ নিয়েই তো। অরণ্যের অন্ধকার দূর করেছি খানিক—কুঠারে কুঠারে। কিন্তু আলোকবর্তিকা নিযে যেতে হবে না দূর দূরান্তে! তবে তো দূর দূরান্তের অন্ধকার দূর হবে।

পাওয়ার স্টেশান বসছে এখানে! হাইডেল স্টেশান পরে—উপস্থিত থার্মাল।

আমি এসেছি সুরুতে। শীলা এসেছে পরে। আমি এসেছি কুড়ুল কাঁধে। আমি এসেছি তাঁবুর সরঞ্জাম নিয়ে। আমি এসেছি অন্ধকারে হ্যাসাগ জ্বালিয়ে। রাত্রে বাঘ ভালুক না তাড়ালেও বুনো শুয়োর তাড়িয়েছি!

তাড়িয়ে বাস করেছি, বেঁচে থেকেছি। তাঁবুতে শুয়ে শুনেছি নেকড়ের ডাক। ভয়ে কেঁপেছি। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়েছে পরদিনই। পারি নি।

ঐ আলো জ্বালার প্রতিজ্ঞা! পালাতে পারি নি ঐ জন্যেই।

একশো বত্রিশ কিলো ভোল্ট তৈরী করব। হাই পাওয়ার ট্রানসমিশান লাইন চলে যাবে—মোটা মোটা তামার তার—চলে যাবে অনেক উঁচু পাওয়ার-পোস্টের মাথায় মাথায়। চলে যাবে ক্রস-কানট্রি। মাঠ পেরিয়ে বন-জঙ্গলের মাথার ওপর দিয়ে, দূর থেকে দূরান্তে, হাজার হাজার মাইল। মাঝে মাঝে ট্রান্সফরমারের সাবস্টেশান। করুণাময়ী বিলোতে বিলোতে যাবে করুণাধারা। আলো জ্বালিয়ে যাবে পথে পথে, অচলকে সচল করে।

সেই নেশাই তো নিয়ে এসেছে এখানে। বিদ্যুৎ সৃষ্টির নেশা, সৃষ্টিতে কি কম আনন্দ।

আমি আর আমার মতো ক'জন যখন এলাম—অরণ্য ছাড়া কিছুই ছিল না। একদিন যদি পাওয়ার স্টেশান সম্পূর্ণ হয়, এই পাওয়ার-হাউজের শক্তিঘর থেকে উৎপন্ন হয় যদি বিদ্যুৎ, আমরাই হবো এর পথিকৃৎ। এ কি কম আনন্দের, এ কি কম গৌরবের। বিদ্যুৎ চলে যাবে দেশ দেশান্তর, কতো কাজ করবে। আমরা এখানে পড়ে থাকবো। বিদ্যুৎকে মনে রাখবে সবাই, চোখে চোখে রাখবে। আমরা হবো বিস্মৃত। আমাদের জানবেও না কেউ। জানবে না কেউ আমাদের কষ্টের কথা। দেখতে আসবে না—আমাদের ঘামের আর চোখের জলের, এমন কি, রক্তের নুনের সার দিয়ে গেলাম আমরা। তবেই সেই মাটি থেকে ফসল ফলল—বিদ্যুৎ। আকাশের মেঘে মেঘে ঘষা লেগে যা জন্মায়, বন্দী করে রেখে গেলাম তাকে টার্বো অলটারনেটারের গোপন গর্ভে। পুরে রেখে দিলাম তামার ছিদ্রহীন তারের ফুটোয়।

আজ থেকে বছর দুই আগে এসেছি আমি। আমি নই, আমরা। কোম্পানীর বা সরকারের তরফে আমি, কন্ট্রাক্টর চন্দ্রশেখর চৌধুরী, অনেক বিহারী পাঞ্জাবী ঠিকাদার—আমাদের সরকারী ডাক্তারখানা নিয়ে ছোট্ট ডাক্তার দিগ্বিজয় ঘোষ। আর, সবার প্রথমে জন-মজুর। আজ যেমন দেখছেন হাজার দশেকের মতো—অতো নয় অবশ্য।

এই জন-মানবহীন পাহাড়ে জায়গায়—শাল শিমুর জঙ্গলে—সবার আগে প্রয়োজন হল কিছু কোয়ার্টারের। জ্যাকসন য্যাণ্ড উইলিআমস

কণ্ট্রাক্ট পেলো প্রথম খান কয়েক কোয়ার্টারের। কিছু কিউ টাইপ—খান পনেরো আন্দাজ—আড়াইশো অনূর্ধ্ব মাইনে যাদের, তাদের জন্য। কিছু এইচ টাইপ—খান তিনেক, আড়াইশোর উপরতলার লোকদের। কিছু ব্যারাক—এল-টি-টাইপ—খান দশেক। দুইপাশ খোলা, খোলার বস্তি। এর খান ছয়েক উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। বাকি খান চারেক পুবে পশ্চিমে। এক একটা ব্যারাকে চব্বিশখানা পায়রা খোপ। এক একটায় বত্রিশখানা অবধি। এক একটা পায়রা খোপে লেবার সুপারভাইজার যেমন যেমন পেরেছে—দুই তিন চার—লোক ঢুকিয়েছে। ঐ ব্যারাকেও আবার দলাদলি —সাদা কথায় প্রভিনশিয়ালিজম। দুটো লাইন যদি বিলাসপুরী, তিনটে তাহলে তেলেগু, চারটে বিহারী। এরাই মেজরিটি তখন। এরই মধ্যে—এদের দয়া-নির্ভর—বাঙ্গালী আছে, জৌনপুরী, মজঃফরপুরী, বালিয়া, আরা জিলার লোক আছে। ব্যারাকগুলো ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাহলেও ওরি মধ্যে ছিল সরকারের ব্যবসাবুদ্ধি আর সুবিধাবাদ। ব্যারাকগুলি ছিল উত্তরে দক্ষিণে আর পূবের প্রান্তে। বাইরের দিকে। মাঝখানে হল সুপিরিআর স্টাফ কোয়ার্টারগুলো। অর্থাৎ বাঘ আসে ভালুক আসে আগে খাক লেবারদের। যা শত্রু পরে পরে। এরা হল পাহারাদার। নতুন নগর পত্তনের মধ্যেও স্বার্থ বুদ্ধি ভুলি কি করে! এদের জন্য সার্বজনীক পায়খানা। এদের আচার-ব্যবহার, চলা-ফেরা, অফিসারদের চোখে ঠেকতে পারে, বাধতে পারে অফিসারদের আভিজাত্যে, তাই এই ব্রাত্যেরা থাক লোক-লোচনের বাইরে বাইরে। তফাতে তফাতে। জ্যাকসন উইলিআমসের সুপারভাইজার আইজাককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই রকম প্ল্যানের অর্থ। ব্যারাকগুলো সব একজায়গায়ই তো হওয়া উচিত। হেসে বলেছিল আইজাক, তা তো জানি নে। তবে অফিশিয়াল কৈফিয়ৎ একটা আছে বৈ কি। সেটা হচ্ছে—উত্তর, দক্ষিণে আর পুবেই কাজ হচ্ছে আমাদের। কোথাও মাটি-কাটা পাথর-কাটা পাহাড়-ওড়ানো। কোথাও বাঁধ-বাঁধা বা ড্যাম তৈরীর কাজ। কোনদিকে বা সেণ্ট্রাল ওআর্কশপ। তিনদিকে ছড়িয়ে ব্যারাক তৈরীর উদ্দেশ্য—যার যার কাজের জায়গা কাছে পড়বে। এই সেণ্ট্রাল ওআর্কশপেই আমি আছি বরাবর আর শীলা এলো নতুন। এই সি ডবলিউয়েই যাবতীয় জিনিষের প্রাথমিক প্রস্তুতি চলছে।

ইঞ্জিন আসুক, টারবাইন আসুক, বয়লার আসুক, আর ড্যামের স্লুস গেট

বা রেডিয়াল গেটই তৈরী হোক—সকলের আগে দরকার হয় এই ধরণের কেন্দ্রীয় কর্মশালা। ইঞ্জিন টারবাইন বয়লার বিলেত থেকে আসে টুকরো টুকরো হয়ে। ব্যবচ্ছিন্ন শব। কোথাও বোল্ট নাট স্টাডে, কোথাও রিভেটে জুড়ে নিতে হয় টুকরোগুলো। ধড়ের কাণ্ডটা অমনি করে তৈরী করার পর হাত-পা জুড়তে হয়, মাথা বসাতে হয়। মাথা মানেই ব্রেণ। ব্রেণ বা বুদ্ধি—অন্যান্য প্রত্যঙ্গের চালক। ব্রেণ হুকুম করে। আপনার বাঁ হাতে মশা বসেছে। ব্রেণ হুকুম করে ডান হাতকে। ডান হাতখানি উঠে চটাস করে চড় কষায়—মশা নিধনের পর্বে। ঠিক তেমনি অনেক মেশিনেই একটি করে ব্রেণ না থাকুক চালক থাকেই। কোথাও ইলেকট্রিসিটি, কোথাও ইলেকট্রিকে চালানো মোটরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা বেল্ট। এ সবের জন্যেই সেন্ট্রাল ওআর্কশপ দরকার।

ওআর্কশপ চালাবে কে? কেউ নিজের কোন শক্তি উৎপন্ন করলে তবে তো অন্যকে চালাবে। তাই ঐ পাণ্ডববর্জিত দেশে সকলের আগে দরকার সেন্ট্রাল ওআর্কশপ। সেই ওআর্কশপের প্রাণ সঞ্চার করা দরকার তারও আগে।

সেই প্রাণ হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি জন্মানো। প্রথমেই অতো বিরাট বিশাল পরিমাণে অবশ্যই নয়। সামান্য পরিমাণে। সামান্য মানেও শ পাঁচেক কিলোওআট অন্ততঃ। এই ডায়নামো চললে সংনমিত বায়ু তৈরী হবে। তাই দিয়ে চলবে নিউম্যাটিক ড্রিল। ড্রিল চালিয়ে মোটা মোটা লোহার পাত ফুটো করবে, রিভেট করবে। মোটর চালিয়ে শাফট লাইন চালাবে। শাফট লাইন থেকে টার্নিং মেশিন, মিলিং, ড্রিলিং—যা যা দরকার, চালিয়ে নিন। এ মেশিনগুলো না হলে কাজ এগুবে না।

আমার সেন্ট্রাল ওআর্কশপের কাজ অনেক। কাজ প্রাথমিক, কাজ বর্ণপরিচয়ের। কিন্তু কাজ অনেক। আমিই এসেছি সকলের আগে। আর আমার অল্প আগে পরে চন্দ্রশেখর চৌধুরী, দিগ্বিজয় ঘোষ, বিহারী পাঞ্জাবী ঠিকাদারেরা এসেছে। আমি এসে দেখেছি—শ কয়েক জন-মজুর। গাছপালা কাটে, কাজের জায়গা নিকোয় কুড়ুল কোদাল দিয়ে। আসন পাতা হবে যেখানে যন্ত্র দেবতার, পরিচ্ছন্ন করে সেই জায়গা। ডিনামাইট চার্জ করে। মাটি কাটে, মাটি বয়, ঘর বাড়ী তৈরীর কাজই তখন বেশী। বেশী কেন, প্রায় সবটাই। ঘর বাড়ী তৈরী করে। আমি অবশ্য দেখেছি এতোদিন দূর

থেকেই। সমীহ করেছি, শ্রদ্ধা করেছি, ভয় করেছি। কাছে থেকে দেখি নি এর আগে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বিশাল বিশাল বনস্পতি মহীরুহের সঙ্গে পরিচয় নেই আমার। তাদের নামও বিশেষ জানি না। শিমুগাছ চিনি, শাল চিনি। মশাল জ্বালা শিমুলকে চিনতেই হয় তার রংবাহারে। পলাশকেও চিনি ঐ একই কারণে। আর গাছেদের মধ্যে কস্তুরী মৃগকে চিনি তার সুগন্ধে—মহুয়া।

গাছ চিনি না, তার ফুলও চিনি না তাই। কতো বনফুল আছে—বনের নিরালা আলো করে, কে তার খবর রাখে। কাশ্মীরে নিশাতবাগে মার্চ এপ্রিল মাসে ফুলের মেলা বসে যায়। ক'জনই বা দেখতে পায় আর খবর রাখে তার। অথচ দুর্লভ সব ফুল, দুর্লভ তার রং।

পলাশ শিমুল অশোক আগুনের ঔজ্জ্বল্যে দাউ দাউ জ্বলে। ইচ্ছা না থাকলেও তাকাতে হয়, নাম না জানলেও তাকাতে হয। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে কেয়ার না করে আগল ভেঙে এসে ঢোকে মনের অন্তঃপুরে।

তেমনি আর একটি ফুল জ্বলেছিল সেই অরণ্যে।

প্রথম যেদিন গিয়ে পৌছলাম সেইদিনই দেখলাম সেই ফুল। নামও জানলাম। বলে নিই সেই গল্প।

স্টেশানে নেমেই দেখি এক সুন্দরদর্শন পুরুষ। রোদের তাপে সমস্ত শরীরের রক্তই রঙের আগুনে জ্বলছে। এমনি টকটকে রং। সুন্দর মুখের কাট। ইয়া লম্বা। তেমনি মানানসই চেহারা। চিবুকে সুন্দর একটি টোল। ট্রাউজার হাফশার্ট পরা—চটি পায়ে।

এগিয়ে এলেন হাত বাড়িয়ে। করমর্দনের ভঙ্গীতে।

ঃ আমি বোধ হয মিঃ রয়ের সঙ্গে কথা বলছি—মিস্টার এ রয, য্যাসিস্ট্যাণ্ট এঞ্জিনিআর।

হেসে বললুম ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। ধন্যবাদ। মশাযের নামটি জানতে পারি কি ?

উত্তর পেলাম—সহাস্যে। ঃ সামান্য লোক! সামান্য লোকের নাম জেনে কি হবে! আমাকে সবাই সি-সি বলে ডাকে। সি. এস. চৌধুরী—

আমাকে আর বেশী চিন্তা ভাবনার অবকাশ দিল না। একটি কুলিকে পরিষ্কার হিন্দীতে হুকুম করল চৌধুরী ঃ এই মাল ওঠাও। নিয়ে চলো।

বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলাম ঃ মশাইকে কি—

আমাকে শেষ করতে না দিয়ে চৌধুরী বলল: হ্যাঁ, রিসীভ করতে এসেছি। চলুন—

তার নির্দেশে তারই পিছু পিছু ততোক্ষণে টিকেট কালেক্টারের গেট পেরিয়ে স্টেশানের প্রাঙ্গণে এসে পড়েছি।

ছোট স্টেশান। একই বিল্ডিংয়ে পাশাপাশি আপিস—খান তিনেক রুমে। স্টেশান মাষ্টার, য্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশান মাস্টার, তার ঘর, মাল বাবুর আপিস। তারি একপাশে টিকেট বিক্রির ঢোক মেশিন। এই আপিসের এ-পাশ দিয়ে স্টেশান প্লাটফরমে যাবার গেট। এই গেটই টিকেট কালেকটারেরও বটে! একটু ও পাশে চায়ের দোকান। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা ছাদ ঢাকা জায়গা। ওয়েটিং রুমই বলুন, যাই বলুন।

এই ছোট স্টেশানে এর পর কতো এসেছি, গেছি। মাস্টার বাবুর সাথে চেনা পরিচয় হয়েছে। তাঁর য্যাসিস্ট্যাণ্টের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মালবাবুর সঙ্গে তো ভাবই। কতো লোককে রিসীভ করতে এসেছি, তুলে দিতেও এসেছি। কতো সময় মনের ভাব হাল্কা করতে উঁকি দিয়েছি, বাইরের দুনিয়ার এই একটি মাত্র জানালায়। চেনা-মুখ খুজতে এসে গোমড়া মুখ দেখেছি। হাসবো বলে এসে কষ্ট পেয়ে ফিরে গেছি!

এতোদিন কোন প্রাধান্য ছিল না স্টেশানের। বিশেষ কেউ আসত না, যেতো না। ক্বচিৎ কিছু মালপত্র বুকিং হোতো। কালেভদ্রে হত উল্লেখ-যোগ্য জনসমাগম। আর আজ? গমগম করছে স্টেশান। লোকে আর মালে।

লাল কাঁকরের প্রাঙ্গন। স্টেশানের কাছ থেকে পাকা রাস্তা বেরিয়ে গেছে।

একখানা ঘোড়া জোতা ফিটন আর একখানি পাল্কী গাড়ী। কোথায় ঘোড়া আছে দেখতে পেলাম না। ছ্যাজ তোলা গোরুর গাড়ী খান চারেক। সাইকেল রিক্সা আট দশখানা। রিক্সাওয়ালাদের বিচিত্র শিরস্ত্রাণ দেখে হাসি লেগেছিল, মনে আছে। কেউ জোগাড় করেছে কারো ফেলে দেয়া পুরোন ফেল্ট হ্যাট, কেউ শোলার টুপি, কেউ পরেছে পাগড়ি। প্রত্যেকেরই যা হোক কিছু মাথায় ঢাকা আছে। পরে বুঝেছিলাম—তাপের দাপট থেকে বাঁচার ব্যাপারে, পরতেই হয়। যেমন অন্য সকলকেও পরতে হয়।

ছোট একটি স্টেশান। কিন্তু তার প্রত্যেকটি ব্যাপার মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল মনে। অনেক সুখের চোখের জল, অনেক দুঃখের হাসি হেসেছি ঐ স্টেশানে

বসেই। মনে আছে তাই। অনেক স্মৃতির জড়োয়া জড়ানো কল্পলোকের মণিহার ঐ স্টেশান।

প্রথম যখন গিয়ে নামলাম, মনে সন্দেহ ছিল—কতোদিনই বা থাকতে পারবো। অসুবিধে বুঝলেই দেবো পিঠটান। পরে দেখলাম সুখে আর দুঃখে, হাসিতে আর কান্নায় কাটল কম দিন না। তা, পাঁচটা বছর কি কম।

ঘোড়ার গাড়ী, ন্যাজ তোলা গোরুর গাড়ী, সাইকেল রিক্সা। আর একখানি জীপ।

দেখলাম, কুলিকে আর নতুন নির্দেশ দিতে হল না। মালপত্র এসে উঠল জীপে। অর্থাৎ কুলীরা সি-স্‌কে ভালোই চেনে। এবং মালপত্র যে তার জীপেই ওঠাতে হবে এটাও তাদের জানা-ই। এতে তারা অভ্যস্ত। নতুন নির্দেশের প্রয়োজন হয় না।

কুলি ভাড়াটাও দেখি চৌধুরীরই দেবার মতলব। সেটা আর হতে দিলাম না।

জীপের ষ্টিয়ারিং-এ বসল চৌধুরীই। পরে দেখেছিলাম, চৌধুরীর হাত পাকা।

খানিকটা পাকা রাস্তা পার হয়েই কাঁচা রাস্তা। পাথুরে রাস্তা, পাহাড়ে রাস্তা। বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগিয়েছে অজগর।

খুব বেশী দূর হবে না। মাইল তিনেক। চলে এলো সিন্দ্রি প্‌লাবায়।

নবীন উপনিবেশ চোখে পড়ছে—ছড়ানো, ছিটোন। অনেক দূরে দূরে কিছু কিছু ঘর বাড়ী চোখে পড়ছে। বড়ো ছোটো মাঝারি। সব একতালা। মাঝে মাঝে লাল সুরকির যোগসূত্র। নির্মীয়মান। পথের ধারে ধারে রোড রোলার। পিচ গালানোর ড্রাম, ফেলে দেয়া পিচের ব্যারেল। এক এক জায়গায় দরমা ঢাকা বিল্ডিং মেটিরিয়াল। সুরকি, বালি, চুন, ইট। ইট ভিজোবার চৌবাচ্চা। লোহা-লক্কড়। কাঠকুটো। ঢেউ তোলা য্যাজবেষ্টসের শিট।

মাঝে মাঝে তাঁবু। আর এই তাঁবুগুলোয় লোকজন থাকছে। ঘর বাড়ী তো তৈরী হয় নি তখনও। তাঁবুতে থাকে লোক।

এমনি একখানি তাঁবুর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল জীপ। জীপ থামার আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে এলো একজন চাকর শ্রেণীর লোক।

গাড়ী থেকে নামতে নামতে হুকুম করলো : মাল নামাও বনোয়ারী।

মালের মধ্যে তো একটি পেট ফুলো বেডিং—টাটকা কেনা হোল্ডলে মোড়া। মনটা পড়ে রয়েছে হোল্ডলের চাকচিক্যের গায়ে। ধুলো মাটি লাল কাঁকরের ময়লা যতোটা লাগছে ওটার গায়ে, ঠিক ততোটাই লাগছে আমার মনেও।

আর একটা ছাব্বিশ ইঞ্চি সুটকেসের জয়ঢাক। বহুতর জিনিষ ধারণের গর্বে তারও বুক ফোলা। আর একটা ঢাকনা পরানো য্যাটাচি।

এগুলি বলা বাহুল্য, ছিল পিছনের সিট-এ।

নেমে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণের ভঙ্গীতে নুয়ে দাঁড়ালো চৌধুরী। বলল ঃ নামুন স্যর।

এতোক্ষণ অবধি বেশ চলছিল। হয়ত নিচুতলার কর্মচারী চৌধুরী। সরকারী জীপ, সরকারী হুকুম—আনতে গেছে আমাকে স্টেশানে। ইন্‌সপেকশান বাংলো—বাংলো নয় ইন্‌সপেকশান তাঁবু হয়তো এটা।

আপত্তি কিছু নেই, চিন্তারও নয়।

কিন্তু চিন্তা দেখা দিল দোর গোড়ায়। একটি মেয়ে। তরুণী। সুন্দরী।

বয়স কতো আন্দাজ করার চেষ্টা করব না। মেয়েদের বয়স এক নজরে বুঝতে পারি সে বয়স আমার তখন নয়। সে অভিজ্ঞতা নেই চোখের।

তবে রূপ! হ্যাঁ, দেখলাম বটে। এমন দেখাই দেখলাম যে, চোখ ফেরাতে পারলাম না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। চোখের পলক পড়ল না। জীপ থেকে নেমে মাটিতে পুঁতে দিল পা দুটো কে যেন। নড়তে পারলাম না।

মনের বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা, ঐ রূপ দেখতে দেখতে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিল।

চমক ভাঙ্গল চৌধুরীর গলার স্বরে কয়েক সেকেণ্ড বাদে। হেসে বলল চৌধুরী ঃ কই, চলুন—দাঁড়িয়ে পড়লেন যে।

আমার আসল বিস্ময়টা দৃষ্টিকটু আর অভব্য। চট করে একটা লাগসই আর ভদ্র মোড় ফিরিয়ে দিলাম। পরিয়ে দিলাম সভ্য মুখোস।

বললাম ঃ এটাই কি ইনসপেকশান বাংলো? কার পরিবারও রয়েছেন দেখছি। একটা খালি বাড়ী-টাড়ী মানে তাঁবু-টাবু—

হেসে বলল চৌধুরী ঃ না—ইনসপেকশান বাংলো এটা নয়। এটা গরীবের তাঁবু কুঁড়ে, অস্থায়ী। পরিবারও আমারই। ও আমার মেয়ে। মনোরমা।

উচ্চারণটা শোনাল ঠিক যেন মোনোর্মা।

এই বিহারের অরণ্যে নতুন ফুল দেখলাম। বনে ফুটে আছে বলেই বনফুল বা নির্গন্ধ জংলা ফুল নয়। বনেও সুগন্ধ সুন্দর ফুল ফোটে তাহলে।

ফুল দেখলাম, ফুলের নাম জানলাম। মনোরমা।

এই ফুলটির ঘনিষ্ঠ নিকটে আসার ইচ্ছা পুরো মাত্রায় থাকলেও, আপত্তি করতে হল মুখে।

ঃ আমাকে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে চলুন মিষ্টার চৌধুরী। তৈরী না হয়ে থাকলে—ইনসপেকশান বাংলোয়।

বিনয়ে বিগলিত হয়ে চৌধুরী বলল ঃ একটা বেলা স্যর—। এর পরে কি আর গরীবের দিকে ফিরেও তাকাবেন ?

ঃ বারে বারে স্যর স্যর বলছেন কেন মিষ্টার চৌধুরী। লজ্জা পাই ওতে। তা ছাড়া গরীব বড়োলোকের কি আছে। ফিরে না তাকাবারই বা কি আছে !

চলছিলাম দুজনে তখন। জীপ যেখানে দাঁড়াল, গজ কয়েক গেলেই তাঁবু। সেই গজ কয়েক পথের মধ্যে চলতে চলতে দাঁড়িয়েই পড়ল চৌধুরী।

ঃ ঠিক বলছেন স্যর ! মনে রাখবেন তো গরীবকে ! ফিরে তাকাবেন তো। কথা দিলেন ?

এ কথার উত্তর দেওয়ার সাহস হল না আর। ভরসা হল না চৌধরীকে সাহস দেবার। কি জানি লোকটা এই রকম সিরিয়াসলি বলল কেন কথাটা ! হয়তো কথা দেওয়ার উপযুক্ত লোক নয় কথা দেওয়া উচিত হবে না।

এই সমস্ত সিচুয়েশানের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায় মোড় ফিরিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গের। আমিও তাই করলাম।

জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনার এখানে কতোদিন হল ? এই তাঁবুতেই কাটছে তো !

সংক্ষেপে উত্তর দিল চৌধুরী, যেন দমে গেছে ঃ তা বছরখানেক হল বৈকি !

ঃ বলেন কি ? এই অরণ্যে এ-ক ব-ছ-র হয়ে গেল। বয়েস কতো এই জায়গার ? আমি যখন ফাইনাল ইয়ারে তখন তো খবর বেরোল এই স্কিমের। সেই তো প্রথম শুনলুম। কতো আর ! বছর দেড়েক আগে !

মনোরমা ততোক্ষণে তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেছে। মুখে আজে-বাজে বকলেও মন পড়ে আছে মনোরমায়। তাঁবুর দোর-গোড়ায় পৌছে চৌধুরী

ডাকতে লাগলেন। : মনোরমা কোথায় গেলি? রায় বাবু এলেন, আর তুই ঘরে গিয়ে ঢুকলি।

বনোয়ারী এর মধ্যে মাল নামিয়ে রেখে বার কয়েক এল, গেল।

শীতের দুপুর। রোদ আছে—ঝাঁঝ নেই তার। ঘণ্টা পনেরো-ষোলো ট্রেন জার্ণি করে এসেছি। প্রাণটা আইঢাই করছে স্নানের জন্য। নইলে, আবহাওয়াটি মধুরই লাগত।

মনোরমা এলো না আর। বনোয়ারীই যাওয়া আসা করতে লাগল। দেখতে পেলুম না আর সেই গনগনে আগুন। অসংখ্য বহ্নি শিখা সাপের মতো দংশন ব্যাকুল হয়ে জ্বলছে লকলকে লতায়। চোখের সামনে এলো না আর।

এ কি তাঁবু, না কর্ণার্জুন নাটকের কৌরবদের শিবির। থিএটারে যে সিন দেখেছি সেই রকম। শুধু ঢাল তরোয়াল বল্লম তীর ধনুক নেই, এই যা। য্যাপার্টমেন্টের পর য্যাপার্টমেন্ট চলে গেছে দু পাশে। মাঝখানে করিডর। ওরই মধ্যে কানাতের দরজা, কানাতের জানালা।

বনোয়ারী বলল: চলুন একেবারেই আপনার ঘরে। জিনিষ-পত্তর আগেই নিয়ে রেখেছি আমি—

চৌধুরী বলল: সেই ভালো। একটু দু মিনিট জিরিয়ে নিন। তারপর চান-টান করলেই হবে। গরম জল দিস কিন্তু রায় সায়েবকে—

বনোয়ারী বলল: দেওয়াই আছে বাথরুমে। আপনি যদি চান তো এখুনি যেতে পারেন। তার আগে এক পেয়ালা চা করে দিই?

হেসে বললাম, মুখ না তুলেই: এই ক্ষিদের মুখে চা খেয়ে ক্ষিদেটা নষ্ট করব না আর—

তাঁবুর করিডর দিয়ে এগিয়ে বাঁ হাতে একখানা পরদা তুলে ধরল বনোয়ারী। এটা অবশ্যই দরজার পরদা নয়, দরজা নিজেই। ঘরখানা বেশ বড়ো। একপাশের দেয়াল ঘেঁষে খাটিয়া পাতা। আর এক দেয়াল ঘেঁষে ছোট্ট ড্রেসিং টেবিল। সামনে একখানি টুল। পুবদিকের জানালার সামনে ফোল্ডিং চেয়ার একখানা। এককোণে জলের কুঁজো একটি—পুঁতি দোলানো খুঞ্চিপোষে ঢাকা। ক্রুচেট আর কুশি-কাঁটা শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। কে জানে মনোরমারই হাতের কাজ হয়তো। বনোয়ারী কানাতের দরজাটা হুকে টাঙিয়ে রেখে চলে গেল।

এরই পর ঢুকল চৌধুরী। ঐ বিনয়ে বিগলিত ভাব। মনের হাত ছুটো যেন সর্বদাই কচলাচ্ছেন।

মুখ তুলে তাকালাম—জিজ্ঞাসু।

: বলবেন কিছু ?

চৌধুরী বলল : যদি অনুমতি করেন।

হেসে বললাম : বুঝতেই পারছি না বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বাস করছি, না জমিদারের আমলে ফিরে গেছি। আপনার ভাবখানা এমনিই।— বলুন না কি বলবেন !

চৌধুরী বলল : গাড়ীখানার কাজ আছে—

: তা বেশ তো নিয়ে যান গাড়ী। আপনি এমন করছেন যেন গাড়ীখানা আমারই। যেন আপনিই আমার কাছে ব্যবহারের জন্য ধার চাইছেন।

: না ঠিক তা নয়। গাড়ীখানা নিয়ে যেতে হবে কিনা—তাই—

: বাই দি বাই—স্টেশানে এসে পৌঁছলাম। পাঁচ মিনিটের জন্য হলেও আজই তো আমার হাজিরা দেওয়া চাই। তাই নিয়ম নয় ?

চৌধুরী বলল : হ্যাঁ নিয়মটা তাই। তবে, অনেকে যেয়ে উঠতে পাবেন না। খাওয়া-দাওয়া সেবে বিশ্রাম কবে নিন একটু—গাড়ী নিয়ে আসবখন আবাব। এসে নিয়ে যাবো—

বাথরুম ঐ কানাতেব। বালতিতে আর মুখকাটা কেরোসিনের টিনে তোলা জল। গ্যালভানাইজড বাথটাবে মেশানো গরম জল। মগ। এ-কোণ ওকোণে টাঙানো দড়িতে ভাঁজ ভাঙা টার্কিশ তোযালে। পাশে কাঠের টুল। টাটকা খোলা জবাকুসুম তেল, সোপকেসে কাগজ মোড়া পিয়ার্সের নতুন কেক।

বরফি কাটা ফাঁকা ফাঁকা কাঠের প্ল্যাটফর্ম। মনে হয়, ওর ওপব দাঁড়িয়ে স্নান করার জন্য।

আহ্—স্নান করে যে কি তৃপ্তি হল।

সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়ালো বনোয়ারী। ডাইনিং রুম এ-খানা। দস্তুর মতো টেবিল পাতা—পাশে পাশে চেয়ার।

বনোয়ারীকে বলুম : তোমাদের খাওয়া হয়ে গেছে তো ? চৌধুরী মশাই খেয়ে বেরিয়েছেন ?

খাটিয়া বটে—দড়ির নয়, নেয়ারের। লম্বাটা তিন ভাগ করে ছোটো

ছোটো তিন টুকরো ছোবড়ার গদি। ফলে স্প্রিংয়ের খাটের চেয়েও কুশনিং এফেকট-এ ভালো।

রাতজাগা ট্রেন জার্নি, ঘুম পাড়াতে স্নানই যথেষ্ট। তার ওপর পেট ফাটানো খাওয়া।

একটু গড়িয়ে নেবো ভাবলুম। বনোয়ারীকে বারে বারে অনুরোধ করে রাখলুম, একটু পরেই যেন ডেকে দেয়। হাজিরি দিতে অপিস যেতে হবেই।

মনোরমা বলল: উঠবেন না এবার, বেলা যে গেল! আরো বেশী শুয়ে থাকলে অসুখ করবে না! নিন—চা এনেছি—

ধড়মড় করে উঠে বসলুম। হাতে ঘড়ি পরাই ছিল! শীতের বেলা পৌনে পাঁচটা—সোজা নয়। পাটে বসার আয়োজন করছেন সূয্যি ঠাকুর।

বললাম: মিস্টার চৌধুরী আর আসেন নি? বলুন তো কি সর্বনাশ হল—অপিস যাওয়া হল না!

মনোরমা বললে: এসেছিলেন। আপনি কি ভীষণ ঘুমুচ্ছিলেন। মায়া হল জাগাতে। দেখে বাবা বললেন—আপনার বড় সাহেবকে বলেই এসেছেন, আপনি পৌঁছে গেছেন। অত্যন্ত টায়ার্ড, তাই আজকের দিনটা যদি নাই যান। সাহেব বলেছেন—ও. কে.। বাবা এসেছিলেন আপনাকে বলতে—আজ ছুটি নিন, যাবার দরকার নেই। এসে দেখেন ঘুমুচ্ছেন আপনি। আমাকে বলে চলে গেলেন।

মনটা খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। সবই শুনলুম সবই বুঝলুম, খুঁৎখুতি গেল না তবু। মনোরমার হাতে চা নিমকি আর সন্দেশ। শুধু চা খেলুম। সত্যি পেটে জায়গা নেই আর। ঘণ্টা কয় আগের খাওয়া অধঃস্থ হয় নি ভালো করে।

মনোরমার শাড়ী বদল, ব্লাউজ বদল। মোটা একটা মুখ খোলা বেণী, চলার দোলনে ঈষৎ এপাশ ওপাশ করছে। মুখের ওপর একটু আলতো পাউডারের প্রলেপ পড়েছে মনে হয়। ভগবান প্রসাধন সম্পন্ন করেই পাঠিয়েছেন এঁদের—আলাদা স্নো পাউডারের প্রয়োজন নেই। করিডর পার হয়ে পশ্চিম আকাশের আলো মনোরমার মুখে পড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে। এই কি কনে দেখা আলো?

এ যে স্বর্গীয় সুষমা। ফুলের সুকুমার পেলবতা। এ রূপ শো কেসে তুলে রাখার, ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখার। হাতে নেবার নয়।

কি কাজে বাইরে বেরিয়েছিল মনোরমা। ফিরে এসে বলল : চা খাওয়া হল? একটু বৈঠকখানায় যেতে হবে যে! আপনার অপিস থেকে লোক এসেছে, আপনার সঙ্গে কি কথা আছে।

ছিটের ঢিলে পাযজামা পরা—হাফশার্ট গায়। একটা শাল টেনে নিযে ঘুমুচ্ছিলাম। ঐ অবস্থায বিছানায় বসে বসেই চা খেয়েছি।

নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম—কতো বড অফিসার তুমি, এই বেশে-বাসে দেখা করবে তো! না জামাকাপড় বদলাবে? ও—! প্রোজেক্ট অফিসার টু দি চিফ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিআর। র‍্যাঙ্ক তো য্যাসিসট্যাণ্ট ইঞ্জিনিআরের, এমন কিছু হাতী ঘোড়া নও। চলো এই পোষাকই যথেষ্ট।

বাইরের ঘরে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। ট্রাউজার আর হাফশার্ট পরা। ইযংম্যান।

তাঁবুতে ঢুকেই ডান হাতি প্রথম ঘরখানা বসবার ঘর এঁদের।

আমি যেতেই উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক।

: গুড ঈভনিং স্যর। সি. ঈ. পাঠালেন। আজ এসে পৌঁছেছেন, একটা সই করে দিন এখানে। এটা ফর্মালিটি। মনে করবেন না কিছু। এটা করতে হয়।

লজ্জিত বোধ করলুম। বোধ করা নয শুধু, বললুমও। : দেখুন দিকি কি কাণ্ড! মিষ্টার চৌধুরী বলে গেলেন, জীপ নিযে আসছেন। এসেও ছিলেন তিনি। এসে দ্যাখেন ঘুমিযে পড়েছি আমি। আর ডিসটার্ব করেন নি। কেন করেন নি তাই ভাবছি। করলে ভালো হত। দেখুন তো, চাকরীর জাযগা এটা। আপনাদের অসুবিধেয় ফেললুম। তা ছাড়া সি. ঈ-ই বা কি ভাবলেন। এসে জযেন করার আগেই ইররেগুলার। ছি ছি—

ভদ্রলোকটি বললেন : সি. ঈ. বিশেষ কিছু ভাবেন নি। মিষ্টার চৌধুরী গিযে বুঝিযে বলেছেন সব। মিস্টার চৌধুরীর কথা কি ফেলতে পারেন ইঞ্জিনিআর—

অবাক হলুম। বললুম : কেন বলুন তো! মিস্টার চৌধুরীকে খুব ভালোবাসেন বুঝি সি. ঈ.। এক একজন কর্মচারী থাকে—র‍্যাঙ্কে ছোটো হযেও ভালোবাসা পায়। যেমন—এই মিস্টার চৌধুরী।

একটু অপ্রস্তুত হলেন ভদ্রলোকটি। বললেন : কি বললেন? কর্মচারী! ছোট! তার মানে? কার কথা বলছেন?

: কেন এই মিস্টার চন্দ্রশেখর চৌধুরী—এইটে যার কোয়ার্টার।

একচোট হেসে নিলেন ভদ্রলোক। আমাকে আরও অবাক আর বোকা বানিয়ে, হাসি থামিয়ে বললেন : কে বলেছে এইসব বাজে কথা! চন্দ্রশেখর চৌধুরী—কর্মচারী। তাও আবার ছোট! সিসিকোর নাম শোনেন নি? কণ্ট্রাক্টারস! উনি নিজে একজন বিলেত ফেরৎ। বিলাতি ডিগ্রিওলা স্ট্রাকচাবাল ইঞ্জিনিআর। ওঁরই এই কণ্ট্রাক্টার প্রতিষ্ঠান। ওঁরই নামের আদ্যক্ষরে এই কোম্পানী। লাখোপতি লোক মশাই। হাইডেল পাওয়ার স্টেশানেব কনস্ট্রাকশানের মূল কনট্রাক্ট তো ওঁরই। আরো টুকিটাকি দু চাবটে কনট্রাক্টেব কাজও করছেন। কর্মচারী! তাও ছোট দবেব! বেশ বলেছেন স্যাব! এ ধারণা কি করে আপনার হল বলুন তো?—

চারদিক দেখে নিয়ে নিচুগলায় বলে চললেন : এক আধটা নয়, শো কযেক সি. ঈ.-কে কিনে বাখতে পাবে এই সি-সি-কো। ভদ্রলোকের ওই স্বভাব। সকলেব কাছে হাত কচলানো ভাব। বোধ হয়, কারোকেই চটাতে চান না। হাতে বাখতে চান সকলকেই। বহুলোক প্রথম দেখায় ওঁর ওজন সম্বন্ধে ভুল কবে বসে থাকেন, এই আপনাব মতনই। তাঁদের দোষ নেই অবশ্যই—

আমাব আব বাক্যি সবছিল না। আস্তে আস্তে বললুম : এই যে বললেন, অফিসেব জীপ দিযে ওঁকে পাঠানো হযেছিল—আমাকে বিসিভ করতে!

: তা যদি বলেন তো দোষ ঠিক আমাবও নয স্যর। আব আমি সত্যি কবে অফিশিযাল ক্ষমা চাইতেই এসেছি। আপনাকে আনতে যাবাব ডিউটি ছিল আমার। তা টেলিগ্রাম এলো, এই দেখুন না—এই যে পোস্টাপিসের লেখা। থার্টিন টেন আওয়ার্সে—রিসিভই কবেছে ওরা। তারপর সাইকেল-পিওন মারফৎ এতোটা পথ এসেছে। আমবা অফিসে পেলুম তিনটের কাছাকাছি। তাব আগেই সি. ঈ. আপনাব আসাব খবব পেযে গেছেন—মিষ্টাব চৌধুবীব কাছে। টেলিগ্রাম পেযেই সি. ঈ. বললেন, রয় একটু বেশী টাযার্ড হযে পড়েছে। তুমি খাতাখানা পাঠিয়ে দাও চৌধুবীর বাড়ী, সই কবিযে আনুক। ভাগ্যিস, চৌধুবী নিজের কাজে স্টেশানে গিয়ে পড়েছিলেন। —আমি মনে করলুম আর পিওন কেন, নিজেই যাই। তাই এলুম।

হাত ঘড়ি দেখে একটু চমকে উঠলেন ভদ্রলোকটি : ছটায় অফিস বন্ধ হযে যাবে। তার আগে জমা পড়া চাই খাতা। আমি উঠি। আজকে চলি স্যর। কাল দেখা হবে অফিসে—

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোকটি।

আমিও উঠে দাঁড়ালুম।

: আপনার নামটা জানা হল না কিন্তু!

: আমার নাম বিনয়ব্রত বোস। গুড নাইট স্যর!

: আরে বসুন বসুন বিব্রত বাবু। দিন দেখি আপনার খাতা।—বলতে বলতে ঢুকল মনোরমা। মুখে হাসি, হাত বাড়ানো। বিনযব্রতর হাত থেকে খাতা নেবার জন্য। বিনয়ব্রতও হেসে ফেলল: মিস চৌধুরী এতোও জানেন। বসে থাকেন এখানে—ক্কচিৎ বেড়াতে যান পাহাড়ে। কি করে যে এতো আপিসের ট্রেড সিক্রেট জানতে পান আপনিই বলতে পারেন।

আমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলাম রহস্যটা। বুঝতে পেরেছিলাম বলেই অগ্রসর হলাম। নিশ্চিত হবার জন্য বললাম: কি হল, কি হল, ব্যাপারটা কি হল?

বনোয়ারী এসে হাজির। বলল: কি পৌছোতে হবে মিসিবাবা?

মনোরমা বলল: কই দেখি—খাতা দেখি। সি. ঈ.-র আপিস তো! পিল্লাইকে দিলেই হবে তো, বিব্রত বাবু!

বিনয়ব্রত বলল: সবই তো জানেন দেখছি। জিজ্ঞেস করে আর কষ্ট করছেন কেন? বনোযারী, মিনিট পঁচিশেকে পৌছতে পারবে তো! কি করে যাবে?

: আপনার রথ নেবে! বনোয়ারী, দিল বাহাদুর আর যমুনাপ্রসাদ এসেছে না?—শুধোল মনোরমা।

খাতাটা নিয়ে বগলদাবা করল বনোয়ারী। ঢিলে পাইজামা সাইকেলের চেনে জড়িয়ে যেতে পারে। ডান পায়ে রুমাল বাঁধতে বাঁধতে বলল: জি হাঁ মিসিবাবা।

বিনয়ব্রতর সাইকেল নিয়ে চলে গেল বনোয়ারী।

মনোরমা বলে দিল: আসবার পথে দেখে এসো তো, এস. টি. টাইপের দশ নম্বরের কাছে বাবার জীপ আছে কি না!

আমি মনে করিয়ে দিলাম: বিব্রতর রহস্যটা একটু বলুন না মিস চৌধুরী!

মনোরমা বলল: এ আপনার বোঝা উচিত মিষ্টার রয়। বিনয়ব্রতর 'নয়' কথাটা বাহুল্য মনে করুন না! ওঁর অপিসে ওঁকে সবাই 'নয়' বাদ দিয়ে ডাকেন।

আমি বললুম : তা আপনি জানলেন কি করে ?

মনোরমা বলল : হাত গুণতে পারি যে !

তারপর হেসে ফেলল। বলল : দুঃখের বিষয় আপনার আসার খবরটাই বা গণক বের করতে পারে নি গুণে। তাই খাওয়াটাই মাটি করে দিল আপনার—

একটু থেমে আবার বলল : বাবাকে আড়ালে এনে বললুম, তুমি কী বলো তো ? বাবা বললেন—ইঞ্জিনিআর কণ্ট্রাক্টার দুই-ই। আমি বললুম, চালাকি রাখো। মিষ্টার রায়কে এনে হাজির করলে—বলে গিয়েছিলে একবারও। বাবা বললেন—আমিই বড়ো জানতুম ? বেলিস মরকমের ইঞ্জিনটা এলো কিনা খোঁজ নিতে প্লাটফরমে গেলুম, দেখি একটি ইয়ংম্যান। শুনেছিলাম কৃষ্ণমূর্তির কাছে—মিষ্টার রয়ের আসবার কথা। তাকিয়ে দেখি কম্পানীর একটি জনপ্রাণী নেই ষ্টেশানে। থাকলেও আমিই আনতুম সঙ্গে করে। ভদ্রলোক খাবে কোথায় ? থাকবে কোথায় ? তাই—

আমি বাধা দিয়ে বললুম : কেন আমার জন্যে কোয়ার্টার ঠিক করা নেই ?

মনোরমা হাসল। বলল : আজ রাত্তিরে ডাবল আপ করে দিত কারো সঙ্গে। তারপর ধরমপাল সিংকে বলত, দেখে শুনে একটা তাঁবু খাটিয়ে দিতে।

: সে কি। এ কেমন অব্যবস্থা !

বিনয়ব্রত বলল : অব্যবস্থা ঠিকই। কিন্তু, আপনারা যে য়্যাপয়েন্টমেণ্ট নিয়েও আসেন না কিনা। কাগজে কাগজে য়্যাডভার্টিজমেণ্ট দিয়ে দিয়ে তো ক্যাণ্ডিডেট পাওয়া যায় না। একে তো কম মাইনে তার উপর বিহারের এই জঙ্গল ! বাঘের পেটে প্রাণটা দিতে আসবে কে ? কাজেই য়্যাপণ্ট-মেণ্ট নিয়েও কেউ আসে না যে ! কম্পানীরই বা দোষ কি বলুন ! আমরা সময় মতো স্টেশানে গিয়ে ঘুরে আসি একবার—

ট্রেতে করে চা নিমকি আর সন্দেশ এলো। কারুকার্য করা লাল উলের ঢাকা—মৌলবীদের টুপীর মতো দেখতে অনেকটা। তাই দিয়ে টি-পট ঢাকা। দুধ চিনি আলাদা। আর একটি পোর্সিলেনের ডিশে খান কয়েক সন্দেশ আর নিমকি !

টি-পটের ঢাকাটা তুলে মনোরমা চা ঢালতে লাগল কাপে কাপে। গাঢ় ব্রাউন রঙের লিকার। ধোঁয়া উঠছে—নিমন্ত্রণের মতো !

হারিকেন আর দেয়ালগিরি জ্বলল ঘরে ঘরে। হ্যাসাগ জ্বলল করিডরে আর সামনের বারাণ্ডায়।

আর এক দফা চায়ের সঙ্গে প্রথম কর্মস্থলের টুকিটাকি শুনছিলাম। কৃষ্ণমূর্তি আর পিল্লাই, ধরমপাল সিং আর রামদরিয়ানী, উচ্ছব মোহান্তি আর মিঠুলাল। চাকরী মানে বুঝি না। চাকর কথা থেকে এসেছে এইটুকু বুঝি—উপলব্ধি হয় না। কিছু ভয়, কিছু অজানা আশঙ্কা পৌনে চারশো টাকার চূড়োর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারতে লাগল। মনে অনেক আশা—অন্তরে অনন্ত প্রেরণা, নতুন কিছু গড়ব। চিরাগ জ্বালাবো অন্ধকারে। সব যেন কেমন দমে আসতে লাগল। তাও তো চাকরীর জায়গাটাই দেখি নি এখনও। না দেখলেও দাসখতে দস্তখত করে দিয়েছি এইমাত্র। এখন থেকে আমি চাকব।

গল্প করছিলাম বসে বসে। বিনয়ব্রত, মনোরমা আর আমি। দেয়াল-গিরি দিয়ে গেছে দিলবাহাদুর। বেতের সোফা সেটি। আমি আর বিনয়ব্রত বসে ছিলাম পাশাপাশি। আমাদের পিছনেই তাঁবুর খুঁটি একটা। আলোটা টাঙানো তাতে। সেণ্টার টেবিলের ওপাশে সিঙ্গল সোফায় মনোরমা। আলোটা পড়েছে ওর মুখে। একটু রাত হলে চলে গেছে বিব্রত।

সাদাপ্রধান ছাপা সিল্কের শাড়ী পরেছে মনোরমা, আর গাঢ় নীল রঙের ব্লাউজ। দেয়ালগিরির অনুজ্জ্বল আলো রহস্যময় দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে ওকে। ওর বাবার সত্যিকার পরিচয় পেয়ে পর্যন্ত আমি নিজেও দূরে চলে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি।

বাইরে যেদিকেই তাকাই—অন্ধকার। নিঃশব্দ নির্জীব নিষ্প্রাণ ভয়ংকর। কাছে পিঠে তাঁবু নেই আর—দিনের বেলায়ই দেখেছিলাম। ক্বচিৎ কখনও চলন্ত হারিকেন নজরে পড়ছে একটা। কানে আসছে দু-এক জোড়া পায়ের আওয়াজ।

মাঝে মাঝে উন্মনা হয়ে পড়ছিলাম। কথার খোঁচায় সচকিত করে দিচ্ছিল মনোরমা।

মনে পড়ে যাচ্ছিল—দিন তিন চার আগের কথা। সহপাঠী ইঞ্জিনিআর কমলনয়ন ত্রিপাঠী বলেছিল—অনুপম, তোর কম্মো নয় ঐ জঙ্গলে চাকরী করা। মুখচোরা লাজুক মরালিস্ট ছেলে তুই। তুই স্কলার। পৌনে চারশো টাকাটা কিছু নয়। মানুষ বাঁচবার জন্য টাকা রোজগার করে।

—চলতি কথায় যাকে বাঁচা বলে তার কোনোটাই ওখানে পাবি না তুই। না ভালো আহার, না ভালো সঙ্গ, না রম্য দৃশ্যাবলী, না সোসাইটি। তোর কম্মো নয় ওই নীরস পাথরে রসের ঝর্ণা খুঁজে বের করা। তোর কম্মো নয়—ঐ অরণ্যের অন্ধকারে চোখের বিদ্যুতে পথ দেখা। এ নইলে বাঁচবি কি করে?

আমি বলেছিলাম—জীবনে আদর্শই যদি না রইল, জীবনটা যে তবে আহার আর নিদ্রা হয়ে উঠবে। সে তো বাঁচা নয় প্রাণধারণ। নিঃশ্বাস-গ্রহণ মাত্র। আমি বাঁচতে চাই আমার কর্মে-চিন্তায়, আমার ধ্যানে-জ্ঞানে। আমি বাঁচতে চাই আমার দেহের ভস্মশেষেরও ওপারে—

কমলনয়ন বলেছিল: ও সব বড়ো কথা খেয়ে পেট ভরে না, রোজকার জীবনও চালানো যায় না। ও সব ধোঁয়া উপে উড়ে যেতে বেশী দিন লাগে না। জীবনটা আদর্শবাদ নয় বাস্তববাদ। আজ না বুঝিস বুঝবিই একদিন। হয়তো বুঝবি এতো দেরীতে, ফেরবার পথ থাকবে না তখন আর। ঝুলতে থাকবি ত্রিশঙ্কুর মতো। আদর্শবাদের আকাশ থেকে ভাবালুতার সুতোয়। তারপর পড়েও যাবি একদিন! কঠোর বাস্তবের কঠিন ডাঙায়। হাত পা তো ভাঙবিই, তারো আগে ভাঙবি আদর্শবাদের পাখা।

আমি বলেছিলাম: আমার মরা শরীরটার দিকে শ্মশানযাত্রীরা তাকাবে—শ্রদ্ধার সঙ্গে। ঐ টুকুই আমার নিজস্বতা। ঐতেই আমার আনন্দ যে আমি আমিই, অনুকরণ নই কারো—

মনোরমা কখন এসে বসেছে। দু হাতের কনুই টেবিলে রেখে—দু হাতের আঙুল জড়াজড়ি করে তাইতে ন্যস্ত করেছে টোল পড়া থুঁতনি। তাকাচ্ছে আড়চোখে, হাসছে মুচকি মুচকি।

কখন এসেছে লক্ষ্য করি নি, সমবেদনার অভিব্যক্তি চুকচুক আওয়াজে খেয়াল হল।

মনোরমা বলছে: আহা হা, কষ্ট হচ্ছে দেখে। বেচারা! মা ছেড়ে এসে কি কষ্টেই পড়েছে—হায় রে! হেসে ফেললাম আমিও। বললাম: ছোটো এক কথার মা হয়তো এখানে নেই। যত্ন আত্তির অভাব হচ্ছে না বলে সেটা টেরও পাচ্ছি না। মা নেই, মনোরমাকে—মনোর-মাকে তো পেলাম।

একটুক্ষণ যেন চুপ করে রইল মনোরমা। আমিও আমার বলা কথার গুরুত্ব বুঝলাম। বলে ফেলা কথা ফিরিয়ে আনা যায় না। সে চেষ্টা না করে চুপ করেই রইলাম।

মনোরমা হেঁকে বলল : দিল বাহাদুর, আয়ী-মাকে পাঠিয়ে দাও তো।

আমার দিকে চেয়ে বলল : মা না হলেও মায়ের মত এক জন জুটিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। এই যে আয়ী-মা, এসো এসো। ইনি হচ্ছেন নব নিযুক্ত প্রোজেকট অফিসার মিস্টার অনুপম রয়। নব-নিযুক্ত না বলে নবনী-যুক্তও বলতে পারো। মার কথা মনে করে মনে মনে কাঁদছিলেন এতোক্ষণ।—আর ইনি হচ্ছেন আমার আয়ী-মা, মিস্টার রয়।

সাধারণ বেশ-বাসে অসাধারণ রূপসম্পন্না এক প্রৌঢ়া ঘরে ঢুকলেন। কপাল বরাবর ঘোমটা। সামনে যেটুকু চুলের আভাস, সেটুকু রূপুলী মনে হোল। মুখে স্মিত হাসি।

বললেন : দুপুরে আমি বাড়ী ছিলাম না বাবা, আর এলে তো এলে আজকেই! রমার কাছে শুনলুম—খুব কষ্ট হয়েছে খাবার। তা তো হবেই। রমা কি আর পারে এ সব? তবু তো স্টোভ জেলে দিয়েছে তোমায় দুটি ভাত ফুটিয়ে! হাত যে পুড়িয়ে ফেলে নি।

মাঝে মাঝেই ভারী মশলাদার রান্নার খোশবু আসছিল বাতাসে ভেসে। মনে হয় এই বাড়ীরই। কে জানে এঁদের রান্নাবাড়ী কোথায়!

বললুম : নিরামিষ আমি খুব ভালোবাসি মাসিমা। সত্যি, বিশ্বাস করুন। আমি আজ তিনগুণ ভাত খেয়েছি দুপুরে—

এমনি করে আমার কর্মস্থলে প্রথম রাত্রি নামল।

বাইরে কালো রাত্রি। শূন্যের অশক্ত ডাল ধরে বাদুড়ের মতো ঝুলছে। হেথা হোথা থোকা থোকা অন্ধকার। কোথাও হাল্কা, কোথাও ঘন। একাকার হলেও এক ঘনতার নয়। ওরি ফাঁকে জোনাকি আর তারাদল আলোর আশ্বাস দিচ্ছে।

প্রায় নিঃশব্দ নিঃঝুম দৈত্যপুরীতে এ বাড়ীটাতে যা কিছু আলো যা কিছু শব্দ যা কিছু প্রাণ! যা কিছু আশা আর আশ্বাস।

গল্প করতে করতে অনেক রাত হল। আজে-বাজে সব গল্প—ছেলেমানুষী সব গল্প। না আছে মাথা, না আছে মুণ্ডু। বেশীর ভাগই এই জায়গার গল্প, এই জায়গাকে কেন্দ্র করে। ভুত চোর ডাকাত খুন জখম সি-ঈ ইঞ্জিনিআর ষ্টাফ, তাদের রীতি প্রকৃতি কিছুই বাদ গেল না।

মনোরমা বলল : এইবার খেয়ে নিন। রাত অনেক হল।

বললুম : মিষ্টার চৌধুরী ফিরুন, একা একা খাবো কি! হলোই বা রাত—মোটে তো স' নটা।

কি জানি ভাবল খানিক মনোরমা। ভেবে বলল : খবর পাঠিয়েছেন বাবা—ফিরতে রাত হবে। আমরা যেন খেয়ে নিই।

আমি বসে থাকব ভেবেছিলুম। কিন্তু এক সময়ে দেখলুম আপত্তি আর ভালো না-লাগা মাসিমার চোখ ঈষৎ কুঁচকে দিচ্ছে। ভ্রূকুটি করিয়ে দিচ্ছে মাসিমার। খেয়াল হল এতোক্ষণে! নির্জন রাত। সোমত্ত মেয়ে মনোরমা। আর অচেনা অজানা অতিথি আমি, তায় ইয়ংম্যান। আপত্তি না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

চৌধুরী মশায়কে ফেলে খাবার ইচ্ছে না থাকলেও খেয়ে নিলুম। মনোরমা আর আমি। মাসিমা বসে বসে তদ্বির করলেন খাওয়ার।

শুতে এসে দেখি—পরিপাটি বিছানা পাতা। নিখুঁত নিভাঁজ টোল না খাওয়া বিছানা। শীতের দিন। বিছানার নরম উষ্ণতা বজায় রাখার জন্যে কম্বলটা বিছানার আপাদ মস্তক টানা।

হ্যাসাগের সোঁ সোঁ আওয়াজ ছাড়া আর প্রায় সবই নিঃশব্দ। কোন ঘর মনোরমার জানি না। তার বা মাসিমার আওয়াজও আর পাচ্ছি না। দিলবাহাদুর যমুনাপ্রসাদ বনোয়ারীর পায়ের আওয়াজ এদিক থেকে ওদিক যাতায়াত করতে লাগল। তাও মাঝে মাঝে। শিয়াল ডেকে গেল তাঁবুর খুব কাছে এসে। মনে হল উচ্ছিষ্ট আর এঁটো ফেলা জায়গায়। মাংসের হাড় পড়েছে অনেক।

মোহময়ী মনোরমা আর কাজ, কাজের জায়গা। কাজের ভয় ভাবনা আর অজানার ছমছমানি। অনেক আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম আমি।

দুটো হ্যাসাগ অবিরত জ্বলতে লাগল। আঁধার পারাবারে আলো দুটোর সাঁতার কেটে কূলে ওঠার প্রতিজ্ঞা সাঁতারুর পায়ের আওয়াজের মতো সোঁ সোঁ করতে লাগল।

যেন কার পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। অচেনা জায়গায় আর অজানা পরিবেশে এমনিতেই নিশ্চিন্ত নিদ্রা হয় না। ঘুম ভাঙল খুব সকালেই। উঠেই কর্তব্যবোধ জাগ্রত হল—আজ থেকে আমি পরের চাকর। দেরী করে

ওঠা চলবে না, যখন তখন যা-তা করা চলবে না। আমি 'দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পাস করা ইঞ্জিনিআর। হাসি ঠাট্টা ছ্যাবলামি শোভা পায় না আমার।

উঠে বসে আছি—কাল দুপুরে পৌঁছনোর পর থেকে সমস্ত ঘটনাবলী মনের চোখের সামনে ঘটে যাচ্ছে। অসহায় মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, অনেক বিষয়ে বিবেচনাশক্তির পরিচয় দিতে পারি নি। হাল্কা চালে হাল্কা ব্যবহার করে ফেলেছি। কলেজে পড়ার দিন নেই। রেষ্টুরেণ্টে রাস্তায় রকবাজী করার বয়স নেই, সময় নেই। যদিও আমি তা কোনদিনই করি নি। স্বাধীন ভারতের নাগরিক আমরা। গুরুদায়িত্ব রয়েছে আমাদের ওপর। বিশেষ করে আমার ওপর—আমি ইঞ্জিনিআর। নতুন ভারত নির্মাণ করতে হবে, অরণ্য কেটে অন্ধকার দূব করতে হবে, দূর করতে হবে তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীর অজ্ঞানতার অন্ধকার। প্রমত্তা নদীকে বেঁধে তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হবে। বিপথে চালিত হয়ে বিপদ ডেকে আনতে দেওয়া হবে না তাকে। তাব প্রচণ্ড বাহুবল দিয়ে জনগণের কল্যাণ করিয়ে নিতে হবে। যে আলাদীন দুষ্টুমি করে বেড়াত—এর ক্ষেতের ধান, ওর ঘর, তার প্রাণ নষ্ট করে বেড়াত, তাকে দীক্ষা দিতে হবে সঞ্জীবনী মন্ত্রে। বিশল্যকরণী হাতে তুলে দিতে হবে তাব। আর সে ভার আমার আর আমাদের মতন ক'জনের ওপর।

হঠাৎ খুট, খুট, হাই হীলের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠলাম।

তাঁবুর মধ্যেটা সবটাই কাঠের পাটাতন পাতা—তার ওপর ক্যাম্বিসে মোড়া। ইচ্ছে করলেও চোরা পায়ে হাঁটা মুশকিল।

কানাতের দরজাটা তুলে উঁকি মারল ফুলের মতো মুখ একখানা। বলল: শুভ প্রভাত। আসতে পারি?

মুখে চোখে চুলে লেগে আছে কাল রাত্রের ঘুমের অবিন্যাস। এই বেশে কি কারো সাথেই দেখা করা উচিত। বললাম: আসুন আসুন—বেড়িয়ে ফিরলেন বুঝি। এরি মধ্যে ঘুম থেকে ওঠা, বেড়ানো, ফিনিস। খুব ভোরে ওঠেন তো!

শীতান্ত। যাই যাই করছে শীত। তা হলেও বিহারে ঐ সময় যথেষ্ট শীত থাকে সকালবেলা। মনোরমার গায়ে শীতের জামা, কাঁধে শীতের কাপড়।

মনোরমা বলল: কাল তো শুতে গেলেন আপনি। কি করি। আপনি

আসার আগে তো বই নিয়েই কেটেছে। আপনি এলেন, ভেবেছিলাম বইয়ের গল্পে না কেটে আসল গল্পে কাটবে সময়, তা হোলো কৈ?—শুতে গেলেন আপনি। বই নিয়ে বসলাম। বুড়ো মানুষ আয়ী-মা ঝিমোতে লাগলেন। বাবা এলেন—এগারোটা বেজে গেছে তখন। কিছু খেলেন না। বাবা শুয়ে পড়লেন। আমিও শুলুম। পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটায় উঠে বাবা চা-টা খেয়ে কাজে বেরিয়ে গেলেন। আমিও একটু বেড়িয়ে এলুম।

: নিজে তো বেড়াতে বেশ ভালোবাসেন। কাল আমি বেড়াতে বেরোতে চাইলাম। নিষেধ করলেন কেন? বেশ মেয়ে যা হোক—

: সন্ধ্যের পর বিব্রতও নিয়ে বেরোত না আপনাকে—নিশ্চিন্ত থাকুন।

: কেন বলুন তো?

: জঙ্গল কেটে নগর বসাতে যাচ্ছেন। জঙ্গলে যারা থাকত তাদেরও আছে মাটির মায়া। তারাই বা ভুলতে পারবে কেন সহজে। তারাও ঘুরে ঘুরে আসে। এসে এসে দেখে যায় তাদের আগেকার বাড়ীর চেহারা। ঘরহারা আর উদ্বাস্তু তারাও। বুনো বলে কি মাটির মায়া নেই তাদের, না প্রতিহিংসা নেই।

ঠিক। সভ্যতা আসে, সংস্কৃতি আসে—সুগম নয় তার পথ, কয়েকজন মনীষী পথিকৃৎ ডেকে আনেন তাদের। তাদের নিজেদেরও বিপদ আসে. কুসংস্কারও এসে বাধা দেয় সংস্কৃতিকে।

একদফা কাজ সেরে ফিরল চৌধুরী। নটা সাড়ে-নটা হবে। জীপের আওয়াজে আসার খবর টের পেলাম তার।

স্নান শেষ, খাওয়ার উদ্যোগ করছি। চৌধুরী এসে বললেন: কাল থেকে আর আপনার সাথে দেখা হয় নি, মনে করবেন না কিছু মিঃ রয়। সময়ই পেলাম না। এমনি হয় আমার। গেস্ট ধরে ধরে আনি—যোনোর্মী দেখাশোনা করে তাদের।

উত্তরে কি বলব ভেবে না পেয়ে বললাম: এতো ভোরে উঠেই কাজে লেগে যান বুঝি।

বললেন: আর বলেন কেন? বিহারীদের লাইনে গোটা দুই ইঁদুর মরেছে বুঝি গতকাল পরশু। ব্যস মাইনে চুকিয়ে দাও, দেশে চলে যাবো। তাদের যতই বোঝাতে চেষ্টা করি—প্লেগের ঠিক সময় নয় এটা। প্লেগে মরে নি ইঁদুর। ওরা অমনি মরেছে। তাই কি আর শোনে। ওসব, বাবু তুমি

বাজে কথা বলছ। হোলো না। ধরমপালকে ধরলুম। ইমিডিএট, যেখান থেকে পারো নতুন করে তাঁবু দাও। আনকোরা নতুন জায়গায় তাঁবু দিয়ে দাও। আগের থেকে দূরে, একেবারে বিপরীত কোণে। ধরমপাল চোখের ভাষায় আর অনুনয়ে বলে—এতো তাড়াতাড়ি পাবো কোথায় নতুন তাঁবু, মুখে বলে—এই তো দিলাম বলে। মাঝি মাহাতোদের সর্দার কুঞ্জেশ্বরকে জীপে তুললুম। বলো কোন জায়গাটায় আসতে চাও। ওদের একটা জায়গা মনে মনে বাছাই করা ছিল বোধ হয়। বললে ওই যে হোথাকে একলিঙ্গেশ্বর থান আছে না, ওরই কাছে দিয়ে দাও আমাদের তাঁবু। একখানা কালো রঙের পাথরে ইঞ্চিখানেক চওড়া সাদা দাগ পৈতের মতো বেড়ে রয়েছে। দেখতে একটু বিচিত্র বটে এই একলিঙ্গেশ্বর। সব দুঃখু দুর্দশা দূর করে নিরাপদে রাখবে।

আমি বললুম : এই কুসংস্কারেই গেল দেশটা আমাদের। এই জন্যেই যতো দুঃখ, যতো কষ্ট।

আরো কি সব বলতে যাচ্ছিলাম, থামিয়ে দিলেন চৌধুরী : এ আপনার অন্যায় মিঃ রয়। কুসংস্কার আমাদের দেশে আছে, ওদের নেই? তেরো এই সংখ্যাটা অশুভ নয় ওদের? আনলাকি থার্টিন। তেরো তারিখটা পর্যন্ত। কালো বেড়াল শুভ নয় ওদের? কালো বেড়ালের পজেশান নিয়ে খুনোখুনি হয়ে যায়, জানেন না! কাজেই যেখানেই অশিক্ষা সেখানেই কুসংস্কার। তাই বা বলি কি করে! আমাদের অতিশিক্ষিতরা হাঁচি টিকটিকি বারবেলা অশ্লেষা মঘা মানেন—ওদের দেশের ক্যাবিনেট শুভদিন দেখে কন্‌ট্রোভার্শিয়াল বিল উত্থাপন করে। সেক্ষেত্রে আমাদের কুসংস্কারই আমাদের খেলে—এসব বলে নিজেদের গাল দেওয়া কেন ভাই!

বললুম : তা সত্যি, কিন্তু এই সব মুণ্ডা ওঁরাও-রা চলে যদি যায়—

: যেতে দেওয়া চলবে না। ছলে কৌশলে না হয় বলপ্রয়োগে ধরে রেখে দিতে হবে। আমরা যখন বুঝছি এ ধারণা ওদের ভুল—প্লেগে মরে নি এ ইঁদুর—কেন যেতে দেব ওদের? ওদের ভুল বোঝার ফলে জনগণের কল্যাণের কাজ দেরী করে দেওয়া যায় না। সমষ্টিকে স্বাচ্ছন্দ্য আর স্বচ্ছলতা দেবার জন্যে দরকার হলে বলি দেয়া হবে মুষ্টিমেয়কে। এই একদল ছেড়ে গেলে সহজে লোক পাওয়া যাবে ভেবেছেন? কেউ আসতে চাইবে না—মনে করবে আগের দল প্লেগে মরে নি। বিষ খাইয়ে মেরেছে

বাবুরা। বিনি পয়সায় খাটে নি বলে দলকে দল ঠেলে ফেলে দিয়েছে পাহাড়ের চুড়ো থেকে নিচের জলে। এক মাইল ওপাশে গেলে তিল হয়ে যায় তাল, এক মুখ ফেরৎ হলে রাই হয়ে যায় বেল। এরা চলে গেলে নতুন লেবার জোগাড় করতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে মিঠুলালের। কতো সময় নষ্ট হবে ফর নাথিং। কেন যেতে দেবো এদের? যদিও আমার ডাইরেক্ট কেন—কোন কনসার্নই নয়। তবু দেখাশোনা করতে হয় সবই—ওরাও ডাকে আমিও যাই। না ডাকিলেও যেতুম। কেন যাবো না? আমার একার কাজ নয়, সকলের কাজ।

বাধা দিলাম না। একটু থেমে বলতে লাগলেন চৌধুরী আবার।

ঃ ড্যাম সাইটে মাটি কাটা হচ্ছে। সেই মাটি তুলে এনে ফেলা হচ্ছে, পাথর বয়ে আনা হচ্ছে—ফেলা হচ্ছে। পিন পোঁতা হচ্ছে। ডাইক তৈরীর কাজ চলছে পুরোদমে। নদীর স্রোত এই বর্ষাটা অন্য খাতে বইয়ে দিতে হবে —আসল খাতের ওপরই তৈরী হবে লেভী। এই একটা বছর নদীকে পাঠানো হবে খুশী মতো রাস্তায়। একটা বছর। কারণ নদীর আসল রাস্তায় বাঁধ তৈরী হবে।

একটা বর্ষা একটা বছর। বড়োজোর দুটো বছর দুটো বর্ষা। যতোদিন না নদীর সচরাচর চলাচলের পথে বাঁধটি তৈরী হচ্ছে—ততোদিন মানুষের তৈরী নকল খাতে মানুষের পছন্দ মতো রাস্তায় চালিয়ে দেওয়া। লোহার তৈরী লাগাম পরাবার প্রস্তুতিতে সাময়িক দড়ি পরানো বুনো ঘোড়ার মুখে। বুলডোজার আসছে, হাজারো রকমের রোলার, ক্রেন, জিব ক্রেন, কংক্রীট মিকসার, ব্যাচিং মেশিন, কনভেয়ার বেল্ট, রেডিয়াল গেট তৈরীর তোড়জোড়—ওরা পালাতে চাইলেই হল! যাক এ সবই দেখতে পাবেন। হাতে কাজ করবেন! আপনাকে আর কি বোঝাচ্ছি! এই সব করবার জন্যই তো এসেছেন। খেয়ে নিন, চলুন, অফিস যাই—

মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে কাল যে 'টোনে' কথা বলেছিলাম—অনুতাপ হচ্ছে, লজ্জা পাচ্ছি আজ। বিশেষ করে এই সব কথা শোনার পর শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে মাথা লুটিয়ে পড়ছে। বললাম: কাল নিজেকে লুকিয়ে রেখে বিশেষ অবিচার করেছেন আমার ওপর। কেন বলুন তো, এমন নির্মম ঠাট্টা করলেন আমার সঙ্গে। মাপ চাইছি আজ আপনারি কাছে, আমায় ক্ষমা করুন। কাল চিনতে পারি নি আপনাকে—আপনিও চেনা দেন নি—

চৌধুরী বললেন : কোন অভিনয়ই আমি করি নি কাল। সত্যি আপনি আমার অনেক উপকারে আসতে পারেন। আপনি বোঝেন নি এখনও। অভিনয় তো আমি করি না—কারোর সঙ্গেই। স্ট্রেইট য্যাজ এ স্টিক। দিনের আলোর মত পরিষ্কার আমার ব্যবহার। পছন্দ হলো ভালো—নইলে ছেড়ে দিন আমাকে। আপত্তি নেই, দুঃখ নেই, অনুতাপও করব না। কনসেন্সের সঙ্গে কমপ্রোমাইজ করে আপনার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য নিজেকে বদলে ফেলার ভান করব না। খাপ খাওয়ানোর শো মানে তো, দুটো সুবিধে আদায় করা ছাড়া আর কিছু নয়। তবে স্বাভাবিক ভদ্রতা আর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারকে যদি কেউ খোসামোদ মনে করেন তবেই নাচার—

দেরী হয়ে যাচ্ছে—ভাবছিলাম মনে মনে। কাল তো ঘুমিয়ে পড়ে এক কীর্তি করে বসে আছি। আজ আগে ভাগে গিয়ে বসে থাকতে হবে।

ভাগ্যিস মনোরমা এসে খেতে নিয়ে গেল। কথাগুলো খারাপ লাগছিল না। চৌধুরীকে তো দস্তুর মতো শ্রদ্ধা করতে সুরু করেছি। ঐ, অফিসে দেরী হয়ে যাবে—দুশ্চিন্তাটা ছিল সেইখানে।

গত কালের মতোই নিরামিষ। রাত্রে আহার্যের যে প্রাচুর্য দেখেছি—মাংস পোলাওর ঘটা, দিনে আবার সে সব কিছু নয়।

পরে শুনেছিলাম, দিনের বেলায় কাজের ফাঁকে তাড়াহুড়োর খাওয়া, পিত্তিরক্ষা করা হয় শুধু। তা ছাড়া দিনের বেলায় যমুনাপ্রসাদ কাজ করে অন্যত্র, দিলবাহাদুরও। রান্নাটা এদের শরিকানা ব্যবস্থা—নিরামিষ মানে যমুনাপ্রসাদ, আমিষ—দিল বাহাদুর। দিল বাহাদুরের ডিউটিটাই কম। কারণ এ অঞ্চলে এখনও মাংস ডিম যখন খুশী তখন পাওয়া যায় না।

মিষ্টার চৌধুরীও খেয়ে নিলেন। খাওয়া না, খাওয়ার সংক্ষেপ। খেয়ে নিলেন ঝড়ের বেগে। জীপে করে যেতে যেতে নির্মীয়মান উপনিবেশ ভালো করে দেখলাম। কাল স্টেশান থেকে আসতে এক কোণা দিয়ে ঢুকেছি। এখন এলাম সম্পূর্ণ উপনিবেশটার প্রায় বুকের ওপর দিয়ে।

সর্বত্র ঐ একই ব্যাপার। শিশু বিল্ডিং বাঁশের ভারায় ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পাকা বিল্ডিংএর সংখ্যা খুবই কম। কনস্ট্রাকশানের কাজে লাগবে হাজার দশেক লোক। সব মিটে গেলে পার্মানেন্ট কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়াবে পাঁচ শো। পাকা বিল্ডিং হচ্ছে তাদেরি জন্যে। বাকী সব টেম্পরারী স্ট্রাকচার, তাঁবু, ব্যারাকের ছাউনি। যাদের লাইফ পাঁচ-ছ বছরের বেশী নয়।

তাঁবুতে তাঁবুতে এ এক কৌরব শিবির যেন। একদিকে দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা আর একদিকে সভ্যতা আর অগ্রগতি—দুই দলে লড়াই বেঁধে গেছে আজ। দিকে দিকে দেশে দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার আর আত্মরক্ষার এই লড়াই চলেছে। পদদলিত নিপীড়িত ঘুমন্তদের দেশে সাড়া পড়েছে—পালা এসেছে হঠাৎ জেগে ওঠার। এক সঙ্গে জেগে ওঠার।

মিঃ কৃষ্ণমূর্তির অপিসে পদক্ষেপের যে দৃপ্ত ভঙ্গীতে চৌধুরী ঢুকলেন, বেশ বোঝা যায়—এইটেই চৌধুরীর সত্যস্বরূপ। বাইরে বসে রইলাম একটু কাল।

ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল কৃষ্ণমূর্তির আরদালী।

চৌধুরী পরিচয় করিয়ে দিলেন: নিন মিষ্টার মূর্তি—প্রোজেকট অফিসার আপনার।

করমর্দন করলেন মিঃ মূর্তি: আপনাকে পেয়ে খুশী হলাম সত্যি—

এ কী অপিস! অপিস মানে তো রাইটার্স বিল্ডিংয়ের মতো একটা বাড়ী—না হোক, কিছু ছোটই হল। নানান বিভাগ, নানা অলিগলি, নানা দপ্তর। আলমারী আর র‍্যাক। তাদের মাথায় পঞ্চাশ বছরের পুরোন ফাইল। টেবিলে টেবিলে লাল ফিতে বাঁধা—ইমিডিএট আর্লি আর্জেণ্ট মার্কা দেওয়া। এ বি সি ফ্ল্যাগ করা এক একটি কেস ফাইল। এক একটি ইতিহাস আর ভূগোল। কতো কেরাণী খসড়া করেছে, হাত বুলিয়েছে। ওপরের অপিস-য়্যাসিষ্টাণ্ট এক ধাপ ওপরে বলেই খসড়ার একটি বাক্য ভেঙে দুটি করেছেন। এই রকমের বহু খসড়া, জায়গায় জায়গায় বহুবার দাগা বুলোতে বুলোতে আর বদলাতে বদলাতে সাবজেকট ম্যাটারটিই চাপা পড়ে গেছে ইতিমধ্যে। এই তো অপিস। অপিস তো এই রকমই হয় জানতাম। টেবিলে টেবিলে অতৃপ্তমুখ কেরাণী—ফাইলটি সামনে রেখে ঝিমুচ্ছে। ত্রিপাঠির অফিসে এই দেখে দেখে অভ্যস্ত আমি। ত্রিপাঠিও সরকারী চাকুরে। কাগজে কলমে ইঞ্জিনিআর। প্ল্যানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কালে ভদ্রে এক আধখানা স্কিমের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। চেক করে দিতে হয় এষ্টিমেট। তার হিসেবে বেশী কম হলে মুখের বলাটা ত্রিপাঠির অধিকারে বটেই—তার বেশী কিছু নয়। লিখে মন্তব্য করার অধিকার নেই। সঠিক দৃষ্টিতে যাই মনে হক ত্রিপাঠির—ও. কে. লিখে দিতে হয়।

সে রকমের তো নয়ই এ অপিস, কাছাকাছিও নয় তারণ য়্যাজবেষ্টসের ছাউনি—ছোট্ট দোচালা, পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের প্রথম ইমারৎ। এই অরণ্যে সভ্যতার প্রথম পদপাত।

ছোট্ট একখানি সেক্রেটারিয়েট টেবিল জুটেছে কৃষ্ণমূর্তি সাহেবের। না জুটলেও বিস্মিত হবার ছিল না। পার্টিশান দিয়ে ছোট ঘরখানিকে আরো অপরিসর করে তোলা হয়েছে। পায়াওয়ালা কাঠের পার্টিশানের গায়ে নীল ছাপে এই জায়গাটার ভূগোলের রেখাচিত্র টাঙানো। অন্য অন্য দেয়ালেও এই জায়গাটার 'মা যা ছিলেন' তার ওপর দাগ দিয়ে, 'মা যা হবেন' টাঙানো। পার্টিশানের ওপাশ থেকে মাঝে মাঝে আওয়াজ আসছে টক-টক টক-টক-টক টক টকর—ঝর ঝর ঝর ঝর—টক টক ঝকর—ক্রিং। একাধিক টাইপ-রাইটার কাজ করে চলেছে। সরকারী অপিসে এইটে খুব আছে—চিঠি আর চিঠি। কাগজ আর কাগজ। কাগজ আর কাজ কথা দুটি আকৃতিগত এতো সদৃশ, এতো একরকম দেখতে, একের অনুগামী হওয়া উচিত আর একের—কিন্তু ঐ দেখতেই! সরকারী অপিসে ঐ কাগজটাই আছে—কাজটি প্রায় উধাও। উধাও না হলেও এক পয়সার কাজে পাঁচ টাকার কাগজ আর পাঁচশো টাকার ব্রেণ খরচ।

সামনের চেয়ারে বসতে বললেন কৃষ্ণমূর্তি। বসলাম। পাশের চেয়ারে বসে আছেন চৌধুরী। বেশীক্ষণ থাকলেন না, উঠে গেলেন। কাজ আছে।

কৃষ্ণমূর্তি সাহেব গল্প করলেন অনেক। বিলেতের গল্প, তাঁর রেলোএর চাকরীর গল্প, এখানে পোষ্টিং-এর গল্প! আমার গল্প শুনতে চাইলেন। তা, আমার আর গল্প কী! টাটকা পাস করেছি—নতুন চাকরীতে ঢুকেছি। পেটে ক্ষিধে, চোখে স্বপ্ন। স্বপ্নের জোর এতো যে পেটের ক্ষিধের কথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে। রক্ত গরম কি না!

একে 'বস'—তায় অনেক বড়ো। দণ্ডমুণ্ডের মালিক। বয়স হয়েছে, অভিজ্ঞতায় পাকা। তার সঙ্গে আমার আবার কি গল্প! তিনি মাইনের গিরি চুড়োয়, খ্যাতি প্রতিপত্তির উত্তুঙ্গ শিখরে।

জমল না গল্প। কৃষ্ণমূর্তি সাহেবের গাল ভরা উচ্চরোল হাসি নিমন্ত্রণ করে রেখে দিল ভবিষ্যতের! হাসিটার অর্থ—সহজ হও আর একটু—দেখি গল্প করো কিনা।

পুশ বেল টিপ্‌লেন। পাশের ঘরে অব্যক্ত গোঙানির মতো 'বাজার' ডাক দিল চাপাগলায়। এটি ওর পি. এ. বা সেক্রেটারিকে ডাকার সংকেত।

হাজির হল বিনয়ব্রত। আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল একটু। জিজ্ঞাসু তাকালো স্যরের দিকে।

বিনয়ব্রতকে কৃষ্ণমূর্তি বললেন : বোস্‌, একে এর অফিসে নিয়ে যাও।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন : আমি কিন্তু তোমার ডাইরেকট 'বস' নই। জানো তোঁ তোমার চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিআর রোনল্ড মরলি বিলেতে আছে। তোমাদের হাইডেল পাওয়ার স্টেশানের ইলেকট্রি-কাল গিয়ারস, ইকুয়িপমেণ্ট সব টেষ্ট করে শিপমেণ্টের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে। অবশ্য কাজটায় কম্পানীদের দায়িত্বই বেশী। চাড়ও তাদেরই। এখানে এসে পৌছলে টোয়েন্টি, আমরা রিসিভ করলে আর টোয়েন্টি—এমনি করে সিকস্‌টি পারসেণ্ট অবধি পেয়ে যাবে। প্রথম বায়নায় অবশ্যই বিলেতে বসে টোয়েন্টি পারসেণ্ট পেয়েই গেছে। প্ল্যাণ্ট চালু হয়ে স্পেসিফিকেশন মাফিক কাজ করলে বাকি ফট্টি পাবে। যাক এ সব জাহাজী খবর, আমরা আদার ব্যাপারী। এ সব পেমেণ্টের ব্যাপার ডীল করেন অনেক ওপর তলা—বলে হো হো করে হাসতে লাগলেন কৃষ্ণমূর্তি।

হাসি থামলে আবার বলতে লাগলেন : তোমার বস-এর এই কম্মোটি কিন্তু ফোপর দালালী। ইণ্ডিআ অপিস আছে। লিআজোঁ অপিসার আছেন—টেকনিকাল অ্যাডভাইজারের য়্যাসিস্ট্যাণ্ট আছেন অষ্টোগণ্ডা। জিনিষটা কারখানায় তৈরী সম্পূর্ণ হলে, টেস্ট হয়। টেস্ট করে ম্যানুফ্যাকচারার্স সন্তুষ্ট হলে ইণ্ডিআ অপিসকে খবর দেয়। ইণ্ডিআ অপিস ইনসপেকটার্স পাঠান কারখানায় গিয়ে দেখে আসতে। দেখে, ও. কে. রিপোর্ট দিলে প্যাকিং-এর হুকুম। প্যাকিংটিও এদেরই সাক্ষাতে। তারপর তিনি অর্থাৎ সেই ক্রেটিংটি রেলে ট্রাকে করে গড়াতে গড়াতে লিভারপুল। আমাদের কিডারপুর (খিদিরপুর) ওদের লিভারপুল—জানোতো! তুমি বলবে—কম্পানী নিজের দায়িত্বে নিজের গরজেই মালটা শিপমেণ্ট করবে। পেমেণ্ট পাবার জন্যে তাড়াতাড়িই করবে। করবে—ঠিকই। কিন্তু—দু একটা কিন্তু আছে। ভুল হতে পারে শিপমেণ্টে দুষ্টুমিও করতে পারে। ভুল জিনিষ পাঠালে, অচল জিনিষ চালাবার চেষ্টা করলে সে তো চলবে না। ফেরৎ পাঠাতেই হবে। ফলত অযথা দেরী হবে আমাদের। সেটা আমরা হতে দিতে পারি না।

ব্যাপারটা কি জানো? একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান্‌। নির্জন রাস্তা। প্যাক্ট তো হয়ে গেল। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দুজন। পিছন ফিরেও আড়চোখে না দেখে পারে না দুজনে দুজনকে—যতোক্ষণ না দূরত্ব নিরাপদ হচ্ছে আর সময়ের ব্যবধান নির্বিঘ্ন হচ্ছে। পনেরোই আগষ্ট উই হ্যাভ পারটেড য়্যাজ ফ্রেণ্ডস। তাহলেও সংশয় যেন যাচ্ছে না কিছুতেই—বুঝলে না!

বলে আবার হাসি।

এইবার জিজ্ঞাসা করলাম আমি: স্যর, আমাকে কি করতে হবে এখানে? অবশ্যই আপনি ওপরে আছেন আপনি যা বলবেন তাই করবো—

হাসি যেন কৃষ্ণমূর্তির রোগ। আবার হো হো হাসি: ভেবেণ্ডা ভাজা—স্রেভ ভেরেণ্ডা ভাজতে হবে। সে হবে এখন। এখন খুঁজছ কাজ—কিছু না করতে করতে এমন অবস্থা দাঁড়াবে কিছুদিন পর, যে তখন খুঁজবে কাজের ফাঁক। পয়লা তারিখে মাইনেটা নেওয়া—সেরেফ এই কাজই দিনকতোক চলুক তো।—যাও নিজের অপিস দেখে নাও। বোস্—

ইঙ্গিত করলেন। আমরা বেরিয়ে গেলাম।

বেশী দূর নয়। গোটা আড়াই মাঠ পার হয়ে। সভ্য জগৎ দূরত্ব বোঝে মাইলের হিসেবে, আমাদের গ্রামীন জগতে ডাল ভাঙা মাইলের একটা অলিখিত হিসেব আছে। আর এখানকার দূরত্ববোধ মাঠের মাপ কাঠিতে।

আমার অপিসে নিয়ে এলো 'বিব্রত'। উপস্থিত সেই তাঁবু। পাশে নির্মীয়মান বিল্ডিং—উঠে যেতে পারবো সেইখেনে। অদৃষ্টে যদি অতোদিন টিকে যাই।

তাঁবুর সামনে কাঠের ফলকে লেখা গৌরীপুর প্রোজেক্ট। দ্বিতীয় লাইনে ইলেকট্রিকাল ডিভিশান। তৃতীয় লাইনে অফিস অব দি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিআর।

তাঁবুর চেহারা দেখে চুপসে গেলেও কাঠের ফলকটা পড়ে বুকটা আবার ফুলে উঠলো বৈ কি! বেশ গালভরা নামের অফিস। আর মুরলি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমিই এই অপিসের মালিক।

কেরোসিন কাঠের টেবিল। বেশ কিছু ধুলো কিছু কাগজপত্র আর দু একখানি ব্লু প্রিণ্টের স্তুপে বোঝাই। ব্যবহার হয় নি বহুদিন—টেবিলের হাতে পায়ে গায়ে চিহ্ন বিদ্যমান।

মরলির টেবিল।

পাশে আর একখানা টেবিল পাতা হয়েছে। মনে হচ্ছে প্রোজেক্ট অফিসারের জন্য। তাও মরলি ফিরে এলে কি হয় বলা কঠিন। সাহেব না আসা পর্যন্ত ঠাঁই হতে পারে এ ঘরে।

বিব্রতই ঠিকঠাক করে দিল সব। দু তিনজন অধস্তন কর্মচারী, রেকর্ড-কিপার, কেরাণীবাবু, অফিস সুপারিনটেনডেণ্ট, অফিস য়্যাসিস্ট্যাণ্ট যারা না থাকলে মানায় না, অফিস শোভা করে বসে থাকে যারা, বিব্রতই জোগাড় করে নিয়ে এলো কোত্থেকে! ছিল কিছু কিছু—এই অফিসের নাম করেই ছিল। কাজ করছিল অন্য অফিসে অথবা বলা চলে কাজের নাম করে অপিস পালাচ্ছিল রোজ—ডেকে ডুকে নিয়ে এলো তাদের।

পাশের ঘরে কেরাণীবাবু একজন, মিস্টার ওয়াই. আর পাটেল,। এঘরে আমি। আর দরজার বাইরে টুলে বসে আরদালী রামদয়াল সিং। এই অবস্থায় চলল অনেকক্ষণ। আরদালী টেবিল আর ঘরখানা ঝেড়ে পুঁছে দিয়েছে মোটামুটি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে—কাল আমি পৌঁছবার আগে ইন্দ্রপুরী বানিয়ে রেখে দেবে। অবশ্যই এই জলপাই সবুজ রঙা কানাতের দেয়ালকে যতোটা ইন্দ্রপুরী বানানো সম্ভব হয়! আজও করতে পারত—তবে, অনেক গরদা-উরদা উড়বে তো, তাই। সাহাবের আসবার ঠিক পত্তা কেউ দেয় নি তাকে। সাহেবের টেবিলে যা পেয়েছি ইলেকট্রিকের ছবি—পড়ছিলাম মন দিয়ে। ডুবে গিয়েছিলাম ঐ ব্লু প্রিণ্টের জগতে। কতোবার এসেছে, গেছে বিব্রত, হিসেব রাখি নি। পরে শুনেছি—কৃষ্ণমূর্তি সাহেবকে জানিয়ে আর হুকুম নিয়ে এই সব লোকজন কনস্ট্রাকশান ডিভিশান থেকে জোগাড় করে এনেছে। আরো ডিভিশান আছে—সার্ভে, ইরিগেশান, ইনস-পেকশান—সব ছোট ছোট। ঐ কনস্ট্রাকশান ডিভিশানই বড়ো। আর তারই চিফ কৃষ্ণমূর্তি। এদেশের সিভিল, বোধ হয় ম্যাড্রাস ইউনিভার্সিটির, আর ওদেশের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিআর। এখনও পর্যন্ত ওভার-অল-চার্জ মোটামুটি কৃষ্ণমূর্তির ওপরই।

কাপের ওপর নিচে প্লেট চাপা দিয়ে এককাপ চা এনে রাখল রামদয়াল। ওপরের সসারখানা থেকে চায়ের বাষ্প ঝরিয়ে ফেলল। ধোপ ভাঙা একখানা ডাস্টার দিয়ে মুছল ভালো করে। তেমনি পরিচ্ছন্ন সন্তর্পণে পকেট থেকে বের করল কাগজের ঠোঙা। ছোট। চারখানা ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কিট তাতে।

বললুম: এ সব কোথায় পেলে রামদয়াল? পয়সা দিলে কে?

হাসল রামদয়াল: তা তো জানি নে সাহাব! তবে বোস বাবুই এই সব করে থাকে।

হাত ঘড়ি দেখলাম—তিনটে পঁচিশ।

রামদয়ালকে বললাম: বোসবাবু আছেন নাকি এদিকে? থাকলে দেখা করতে বোলো। সাহেবের টেবিলে টেপা-ঘণ্টা ছিল একটা। দিয়ে গেছে আমার টেবিলে। বাজালে রামদয়াল আসে।

চেঁচিয়ে ডাকলুম প্যাটেলকে। পার্মানেণ্ট ইউ. ডি. সি. বলে চাকরীটি যায় নি। আর ঝগড়াটাও ওরই জন্যে। কাজ করছেন ব্রিটিশ আমল থেকে—বছর কুড়ি হল। এখনও য্যাসিস্ট্যাণ্ট পর্যন্ত করে নি ভদ্রলোককে। অন্যায় নয়! তবে প্রোমোশানটা এফিশিয়েন্সির মই বেয়ে তো ওঠে না। জিনিসটা সিধে রাস্তায় দিনের আলোয় চলাফেরা করে না। প্রোমোশান জিনিসটা সড়সড়ে, তৈলাক্ত তার অঙ্গ, তেলে তার জন্ম—মনের অত্যন্ত গোপনে। প্রোমোশানের সঙ্গে স্পিরিটেডনেস বা উচিত বক্তৃতার ভীষণ বিরোধ।

প্যাটেল এলেন। শার্টে—হাতার প্রান্তে, প্যাণ্টে—পায়ের ফোল্ডে ছেঁড়া, কেঁসো উঠে গেছে।

এসে দাঁড়ালেন—সোজা খাড়া। কোথাও ন্যুব্জতা নেই দেহে। প্রথম দেখেই আমার অভিজ্ঞতা না-থাকা চোখেও ধরা পড়েছিল—ন্যুব্জতার লেশমাত্র নেই ওর মনেও।

বললাম: কে কে এলেন—নাম আর ডেজিগনেশানগুলো একটা কাগজে লিখে দিয়ে যাবেন দয়া করে? আর য়্যাটেনডান্স তো রেজিষ্টারে—না, কি! আমায় দেখাবেন একটু দয়া করে?

বোস এলো। কাজের ছেলে বটে বোস। সাইকেলের সন্ধান নয় শুধু, ধরমপাল সিংকে ধরে এনেছে একেবারে।

আমার মনে একই সঙ্গে দু তিনটে কথা ঠেলাঠেলি ভিড় করে সামনে এগিয়ে আসতে চাইল। মনে হল শিলীন্ধ্রী কথাটা পুংলিঙ্গে আছে কি? বানমাছ দেখতে জানি কেমন? আচ্ছা, বানমাছ আর সাপের শরীরটার গঠনে বিশেষ তফাৎ নেই কাজেই আপাত দৃষ্টিতে যা বানমাছ প্রয়োজনে তারই সাপ হয়ে যেতে বিলম্ব হয় না নিশ্চয়ই।

ঘাড় সমেত মাথাটা প্রায় মাটিতে ঠেকানো। ডান হাতের চেটোটা কপালে

রেখে সেই যে ধরমপাল সিং 'নমস্তে হুজৌর' বলে এসে দাঁড়াল—দেখি আর ওঠেই না।

একটা ঠেলা মারলে বোস : আরে এই হর্ন, তোমার ভক্তি-টক্তি দেখাবার সময় পাবে। সাইকেলের কথা বলো আগে।

ঘাড় তুলে বোসের মুখে তাকাল ধরমপাল সিং। ঈষৎ কোল কুঁজো—বয়সে না বিনয়ে ঠিক জানি না।

বলল : সাইকেলের কথা কি বলছেন বোস্ সাহাব!

: রয় সাহাবকে সাইকেল দেবার কি হবে?

আমাকে নয় শুধু, বোসকে পর্যন্ত অবাক করে দিয়ে ধরমপাল বলল : সাইকেলের কারবার আমি করি না।

বোস বলল : তার মানে? তবে এলে কি জন্যে আমার সঙ্গে? সাইকেলের কারবার করো না তুমি? এই জায়গার যতো সাইকেল—ভাড়া খাটানো, বিক্রী করা—কে করে এই সব? কোন ধরমপাল সিং? তুমি নও?

ধরমপাল বলল : আমি জানি না তো।

বোস বলল : তবে এলে কেন?

ধরমপাল বলল : হুজৌরকে সেলাম জানাতে! আর তাছাড়া আপনি আসতে বললেন তাই এলাম।

বোস যে কতোখানি অপ্রস্তুত—ছাপ পড়ল তার মুখে।

তাকে একটুখানি স্বস্তি দিতে বললাম : ঠিক আছে মিঃ বোস, ওসব দেখে শুনে পরে হলেই হবে। : আচ্ছা মিষ্টার সিং যেতে পারেন আপনি।

আবার তেমনি আভূমি নুয়ে নমস্কার করে বেরিয়ে গেল ধরমপাল সিং।

প্রায় তার পিছু পিছু সত্যি সত্যিই বিব্রত—বিব্রতও।

সাড়ে চারটেয় ছুটি হয় জানতাম।

ইলেকট্রিক স্কিমের ছবি দেখছিলাম তন্ময় হয়ে। এগুলো সব বাতিল। বাতিল মানে প্ল্যান সাবমিট করেছিল সব বিভিন্ন কম্পানী। এ-ঈ-আই, ইংলিশ ইলেকট্রিক, সিমেনস, জি-ই-সি, সেগুলোই পড়ে ছিল সাহেবের টেবিলে। নাড়াচাড়া করছিলাম ঐ বাতিল ছবিগুলো। বাতিল হলেও তা থেকে স্কিমটা পরিষ্কার বোঝা যায়। এ যেন বাসের রুট। টেন, টেন-এ—আরম্ভ এক জায়গায় শেষও এক জায়গায়। মাঝখানের পথটা তফাৎ—আমীর আলী য়্যাভিনিউই হোক আর রিচি রোডই হোক। গন্তব্য উদ্দেশ্য একই।

হাইডেল পাওয়ার স্টেশানে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। হাইডেল কথাটি হাইড্রো ইলেকট্রিক কথাটির সংক্ষেপ। বাংলা নাম দেয়া হয়েছে জল-বিদ্যুৎ। মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সম্ভবতঃ। জল হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ। নামটি ভালো লাগে না আমার। জল আর বিদ্যুতের সঙ্গে সম্পর্ক কম। জল আর বিদ্যুৎ মুখোমুখি হলে বিপদই। দুটি জিনিষই প্রবাহ—এ ছাড়া সাদৃশ্য নেই। জলকে আধারে ধরা যায়। বিদ্যুৎকে ধরে রাখবার আধার বিশেষ নেই। কিছুটা পরিমাণে কনডেনসারে সংহত করে রাখা যায় মাত্র। ধরে রাখা সম্ভব হলেও গতির জন্যে প্রবাহের জন্যে ব্যগ্র উভয়েই। ফাঁক পেলেই দৌড়, ছাড়া পেলেই ছুট। যাক সে কথা।

হাইডেল পাওআর স্টেশানের পরিপূরক হিসেবে থাকবে থার্মাল পাওআর স্টেশান। সাধারণতঃ কয়লা পুড়িয়ে যে উপায়ে বিদ্যুৎ পেয়ে থাকি আমরা। থার্মাল কথাটির বাংলা—তাপীয়। তাপ থেকে যার জন্ম। তার মানে কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায়।

বাঁধের ওপাশে প্রকাণ্ড লেক থাকবে। যখন বর্ষা থাকবে না—ভীমা ভয়ঙ্করা নদীতে জল কমে আসবে। প্রবাহও হয়ে আসবে ক্ষীণ। মরা নদীর সোঁতা ভীতু হয়ে চলবে—পাথরের পাশ কাটিয়ে। ভয়ঙ্করা নদীর গত গৌরব হৃত আসন নতমস্তকের দিনে হাইডেল স্টেশানের চাকা চালাবার পক্ষে স্বাভাবিক স্রোতের চাপ অপর্যাপ্ত হয়ে যাবে। তখন ঐ লেকের জলাধারই জল ধার দেবে। অনেক ওপর থেকে ফেলার ব্যবস্থা থাকবে এই জল। যাতে তার স্বাভাবিক চাপই চাকা চালাবার উপযুক্ত পরিমাণ হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের গোড়ার কথা—চাকা জাতীয় কিছু ঘোরানো। যার সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধে দেওয়া যায় অল্টারনেটার বা ডাইনামোর। অল্টারনেটার বা ডাইনামোকে ঘোরাতে পারলেই বিদ্যুতের জন্ম হল! এই চাকা জাতীয় জিনিষ ঘোরানো—তেল পুড়িয়ে ধোঁয়ার সাহায্যেই হোক। কয়লা পুড়িয়ে জল থেকে বাষ্প তৈরী করে বাষ্পের চাপেই হোক। তেজস্ক্রিয় জিনিষ পুড়িয়ে তার তাপকে কাজে লাগিয়েই হোক। অবশ্যই এই সর্বশেষের উপায়টি সর্বপ্রথম কাজে লাগিয়েছে ইউ. কে., এই উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যাপারে এখনও তারা অদ্বিতীয়। তা ছাড়া কয়লা পুড়িয়েই দুনিয়াবাসীরা আজো পর্যন্ত বিদ্যুৎ পেয়ে আসছে। ছোট-খাটো বা সাময়িক চাহিদা তেল পুড়িয়েও মেটানো হচ্ছে যদিও।

হাইডেল বা থার্মাল যাই হোক—এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ বিতরণের গ্রিড সিষ্টেমের সঙ্গে সংযোগ থাকবে তার। কাছে দূরে আরো যে-সব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হচ্ছে—সব শক্তি এক সাথে সংহত হবে এই গ্রিডে। কাছাকাছির পাঁচটা ছটা স্টেশান যে যার সামর্থ্য মতো বিদ্যুৎ জোগান দেবে এই সিষ্টেমকে।

ড্রয়িং দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সেই বেলা দেড়টায় কৃষ্ণমূর্তির অফিস থেকে এসেছি। কিছু সৌজন্য আলাপ করেছি অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে। সে আর কতোক্ষণ? আধঘণ্টাই হোক। বেলা দুটোর কাছাকাছি থেকে এই ড্রয়িং দেখছিলাম।

হঠাৎ যেন জেগে উঠলাম। দরজার বাইরে বিব্রতর গলার আওয়াজ।

বিব্রত বলছে: এ সাইকেল কার? কোথেকে এলো রামদয়াল?

রামদয়াল বলল: সাহাব ভাড়া করেছেন ধরমপাল সিংএর কাছে।

ঘরে ঢুকল বিনয়ব্রত: ধরমপাল এসেছিল আবার? কখন এলো? ব্যাটা বজ্জাত! কেমন অপ্রস্তুত করে দিল আমাকে—বললে সাইকেলের কারবার করি না তো। এসে কি বলল?

হাসলাম। বললুম: আসে নি তো!

বিব্রত বললে: তবে? রামদয়াল।

রামদয়াল এসে দাঁড়ালে বিব্রতই আবার বললে: কে দিয়ে গেল এই সাইকেল?

আমাকে উদ্দেশ করে বললে: দেখবেন চলুন—প্রায় নতুন গ্রিন র‍্যালে একখানা। তা অবিশ্যি আমিও জোগাড় করে উঠতে পারি নি। ভাবছিলুম আমার খানাই আপনাকে দেবো। একখানা জোগাড় করতে পারলে নিতুম না ব্যাটার সাইকেল।

॥ তিন ॥

অপিসে ডেকে এতোবড়ো খবর শোনাবে কৃষ্ণমূর্তি, ধারণাও করতে পারি নি।

কৃষ্ণমূর্তির অপিসে ডাক পড়াটা নতুন নয়। বদলি ফেরে নি এখনও। প্রশাসনে কৃষ্ণমূর্তিই এখনও আমার ওপরওলা।

মাঝে মাঝে ডাক পড়ে। নিজের গরজেও যেতে হয়। কি কি পেলাম। কি কি জিনিষ পাবার কথা ছিল পাই নি। জাহাজে চেপেছে বহুদিন, না পাওয়াটা আশ্চর্যের। তার অনেক পরের কনসাইনমেণ্ট তাও পেয়ে গেছি কতোদিন হল। খোঁজ নিতে হয়, কেন এলো না। 'তার' করতে 'কেবল' করতে হয়। খবর করতে হয় রেলোএ স্টেশানে। নানান আলোচনা, নানান রকম পরামর্শ প্রয়োজন হয় কৃষ্ণমূর্তির কাছে। পরামর্শ নির্দেশ অভিমত।

চালু হয়েছে সেণ্ট্রাল ওআর্কশপ। কর্ণধার আমি তার। ইঞ্জিনের ধড় আর মুণ্ডু, টারবাইনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাগরপার থেকে পৌঁছে প্রথম পদপাত করে সেখানে। মেরামতির কার্যের কেন্দ্রস্থল সেটা। বিভিন্ন বিভাগের সংযোগস্থল। সমস্ত প্রক্রিয়ার সমন্বয় হয় সেখানে।

এক বছর পুরানো কর্মচাঞ্চল্যের কেন্দ্রমণি হয়ে উঠেছে আজ সেণ্ট্রাল ওআর্কশপ। অনেক বিষয়ে। রেসিপ্রোকেটিং টাইপ ইঞ্জিন বসেছে। বিদ্যুৎ জন্মাচ্ছে পাঁচশো কিলোওআটের মতন। তাই থেকে শাফট লাইন চালিয়ে চলছে ওআর্কশপ।

পাকা দালান, পাকা বিলডিং। শ'দুই কাজ করছে লোক।

শহর বসে গেছে পুরো। তাঁবু নেই তা নয়—সংখ্যায় কমে গেছে অনেক। শহরের উপান্তে ছাড়া দেখা যায় না বিশেষ। বাজার বসেছে। সরকারী ডাক্তারখানা বসেছে। দিগ্বিজয় ঘোষ যার ডাক্তার। ক্লাব—নানান রকমের। ছোটদের বড়োদের মাঝারিদের। দোকান পসার পেট্রল-পাম্প। সিনেমা হচ্ছে শীগগীর। মাংসর দোকান, মদের দোকান, তাড়িখানা। মেয়েমানুষ। বাদ নেই কিছুই। জমী বিক্রী হচ্ছে। জুটেছে সুদখোর কাবুলিওয়ালা—

কয়েক শ' চলমান মেশিন গোঁ গোঁ করছে রাতদিন। কতো তাদের নাম কতো বিচিত্র তাদের উপকারিতা। কতো বিচিত্র আওয়াজ।

এক্সক্যাভেটার। মাটি কাটে। কাটা মাটি গর্তের মধ্যে থেকে সারস-গলা বাড়িয়ে তুলে দেয়। জমা করে পাশের সমতল জায়গায়। তুলে দেয় পাশের কোল পেতে রাখা ট্রাকে। ট্রাক নিয়ে যায় দূর থেকে দূরে। প্রয়োজনের পেট ভরাতে।

রোলার। আট দশ রকম।

শুঁয়োপোকার পায়ে হাঁটছে কেউ। ট্রাক থেকে ফেলে দিয়ে গেছে মাটির নৈবেদ্যের চূড়ো। সামনের লোহার বিরাট অর্ধচন্দ্র দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে কোনো রোলার। সমান বিছিয়ে দিচ্ছে মাটির বখেরা গলাধাক্কা দিয়ে দিয়ে। সমতল করে। কেউ বেশী না পায় কেউ না ঠকে।

রোড লেভেলিং রোলারের মতো কেউ। প্রচণ্ড চাপ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

সাধারণ ট্রাক। নেমে যাচ্ছে রঙ্গিনী নদীর জল ছোঁয়া তটের কিনারা অবধি। জল খেয়ে আসছে পেট ভরে। কর্পোরেশনের খাবার জল বিলোনর গাড়ীর মতো অনেকটা। ঝাঝরি দিয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে সেই জল, চলতে চলতে।

তারপর আসছে শীপসফুট রোলার, আমি বলি গাঁট্টা মারা রোলার। চাকা নেই—শুঁয়োপোকা পা। যুদ্ধের ট্যাঙ্কের মতো দুদিকে দুটো লোহার চওড়া ফিতে। ছোট ছোট টুকরো সমান দূরে কব্জা আঁটা যেন। সেই ফিতের গায়ে গায়ে লোহার পিন বসানো অজস্র। জলে ভেজা নরম মাটিতে তিনি যখন দুটি ফিতেয় ভর দিয়ে গড়ান দয়া করে খানিক দূরে দূরেই ঐ লোহার মোটা মোটা পিনেরা ইঞ্চি কয়েক করে মাটির মধ্যে ঢুকে ঢুকে যায়। এই জল ছিটোন নরম রোলারটিকে মাটিতে বার কয়েক চালালেই চাপে চাপে মাটি আর মাটি থাকে না। লোহা হয়ে যায়।

ওদিকে সিমেন্টের কাজের যাবতীয় মেশিন। কংক্রিট মিকসার। স্বয়ং সম্পূর্ণ, ডিজেল চালিত। ছোট ছোট পাকুড় বাসান্টে মশলা মাখছে সিমেন্টের।

ব্যাচিং মেশিন। ছাঁকনির ছ্যাঁদার মাপ অনুযায়ী বাছাই করে দিচ্ছে পাথরের টুকরো। এক এক মাপের পাথর জড়ো করছে এক সাথে।

কনভেআর বেল্ট। মাখা মশলা, চালান করে দিচ্ছে ড্যামের পেটে। ড্যামের কাছাকাছি পৌঁছে দিচ্ছে। মশলা মাখা পাথরকুচি তুলে নিয়ে গলা

ঘুরিয়ে সারস ঢেলে দিচ্ছে একেবারে ড্যামে। ড্যাম অর্থে সিমেন্ট কংক্রিটে জমানো বাঁধ।

নানা রকমের ক্রেন। নানা আকারের, নানা প্রয়োজনের।

এই এতো অষ্ট গণ্ডা রকমের কয়েক শো মেশিন, গাড়ী, ডিজেল ইঞ্জিন—এদের সর্দি হাঁচির জন্য, মাথাধরা পেট ব্যথার জন্য আমি আছি হাতুড়ে বদ্যি। বসে আছি সেনট্রাল ওয়ার্কশপের হাসপাতাল খুলে।

তাঁবুতে চিফ ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিআরের অফিস নেই আর। সেনট্রাল ওআর্কশপে উঠে এসেছে কবে!

এতো অজস্র কাজ এতো দিবারাত্রির ব্যস্ততা—কাজে ডুবে আছি, মগ্ন হয়ে গেছি কর্মসমুদ্রে। এ হেন কালে এতোবড়ো আঘাত দেবে কৃষ্ণমূর্তি, আন্দাজ করতেও পারি নি।

তা, কৃষ্ণমূর্তিরই বা কি দোষ! সে চাকর। আমার চেয়ে না হয় বড়োই।

হো হো করে হাসা একটা বদরোগ কৃষ্ণমূর্তির। ভালো খবর, কালো খবর যাই হোক।

যেতেই, বসতে বললে কৃষ্ণমূর্তি। বসলুম।

সেই হাসি। হাসতে হাসতেই বললে: আমার কোন দোষ নেই রয়। এ তোমার বরাত। আমি তোমার জন্য লিখেছিলুম।

হাঁ করে চেয়ে আছি। মনে মনে আঁচ করতে পারছি—উপাখ্যানটি প্রোমোশানের।

কৃষ্ণমূর্তি বললে আবার: তোমায় প্রোমোশান না দিয়ে ওপর থেকে পাঠিয়ে দিল লোক। তোমার ওপরওলা করে।—যে সে লোক নয়—স্ত্রীলোক!

বলে আবার হা হা করে হাসি।

এদিকে পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে আমার। উনি হাসছেন। রাগ ধরে না! এ পৃথিবীতে এই কি খাটুনীর পুরস্কার!

অবাক হয়ে গেছি। রাগ হলেও জিজ্ঞেস না করে পারলুম না। : স্ত্রীলোক মানে? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ হেড নিশ্চয়!

: না গো, ইঞ্জিনিআর! অবাক হচ্ছ, না? আমিও কম অবাক হই নি। প্রথম ভারতীয় মেয়ে ইঞ্জিনিআর। ইলেকট্রিকাল। সদ্য বিলেত ফেরৎ।

: ইঞ্জিনিআর! তাও বি-লে-ত ফে-র-ৎ। বলেন কি!

: স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দোষ নেই। আমাদের হেড অফিসেরও দোষ নেই। একদম বিলিতি য়্যাপএন্টমেণ্ট—

বললুম : কবে আসছেন? বাঙালী তো নয়ই—কোন জাত? পারশী?

এই সব আলোচনার অল্পক্ষণের মধ্যেই বিব্রতর সঙ্গে এসে পৌঁছল শীলা মজুমদার।

বিলেত ফেরৎ যে কালে বিস্ময় সৃষ্টি করতো পার হয়ে এসেছি সেকাল। কিন্তু বাঙালী মেয়ে বিলেত ফেরৎ—তাও ইঞ্জিনিআর। আগামী কতো-কালের মতো বিস্ময় সৃষ্টির সূত্রপাত করল আজ, কে জানে!

রঙ গৌরবে উত্তম শ্যাম। চার ফুট নয়-দশের বেশী নয় লম্বায়। মুখ-খানায়ও অস্বাভাবিক নেই কিছু। দুটি চোখ, একটি অনুন্নত নাসা, এক জোড়া ভ্রূ, অধর ওষ্ঠ—মানুষ মাত্রেরই যেমন থাকে। চোখে ভাব আছে কি না, ভাসা ভাসা চোখে বিশেষ ভাষা আছে কি না, অধর-ওষ্ঠ মদনের ধনুকের মতো বঙ্কিম কি না, অতো কিছু বুঝি নি তখন। মানুষ মানুষই। পরে হয়তো ঐ চোখে ভাব ভাষা সবই পেয়েছি খুঁজে। সেটা শীলার চোখের গুণ নয়, আমার মনের চোখের চশমার রং।

পুরোদস্তুর থ্রি পিস সুট। কোটের ঢংটা কিছু বিশিষ্ট, এই যা। টাই। মাথায় ফেল্ট। জানা না থাকলে মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল, অজাতশ্মশ্রু কোন সুকুমার কিশোর এ।

মৃদু হেসে উইশ করে দাঁড়ালো।

প্রথমেই সাফাই গাইল : আমার গোস্তাকি মাপ করবেন, টুপিটা খুলতে পারলাম না। অসুবিধা আছে একটু।

কৃষ্ণমূর্তি বলল : তাতে কি হয়েছে। বসুন আপনি। টুপিটা পরাই থাক—

কথাবার্তা হল। আলাপ আলোচনা হল—আমাদের তিনজনে। বিব্রত চলে গিয়েছিল নিজের কাজে। আলোচনা হচ্ছিল মজুমদারের প্রাক্তন অভিজ্ঞতা নিয়ে। ইণ্ডিআর কোন য়ুনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট—বিলেতে কোন কোন কারখানায় ছিল—স্পেশালাইজ করেছে কিসে, কোন বিষয়ে।

হাসিমুখে বলে যাচ্ছিল সবই মজুমদার। প্রথম মেয়ে ইঞ্জিনিআরিং গ্র্যাজুয়েটের গল্পে কৃষ্ণমূর্তি তন্ময়, কৃষ্ণমূর্তি ব্যস্ত নিজের বিলিতি দিনগুলির

রোমন্থনে। ভুলে বসে আছে, মেয়েটির স্নানাহারের খবর নিতে। কোথায় দেওয়া যায় বাসস্থান, মনে পড়ছে না সে সমস্যার আলোচনা করতে। এতোই মশগুল বিলিতি গল্পে—

গাড়ী পৌঁছয় বারোটার কাছাকাছি। অপিসে পৌঁছতে কোন না আরো মিনিট কুড়ি।

বেয়ারা জানতে চাইল সাহেব চা খাবে না কফি। অর্থাৎ আগন্তুক দক্ষিণ ভারতীয় কি না তার সাহেবেরই মতন। দক্ষিণ ভারতীয় হলে চা চলবে না। কৃষ্ণমূর্তির খেয়াল হল, তাই তো! জিজ্ঞেস করা হয় নি তো মেয়েটিকে—

ছুটোপাটি লেগে গেল তখন। কৃষ্ণমূর্তি নিমন্ত্রণ করলেন প্রথম কটা দিন তাঁর বাড়ী থাকতে! সবিনয় দৃঢ়তায় প্রত্যাখ্যান করল মজুমদার। কৃষ্ণমূর্তি চা আর স্ন্যাকস অফার করলেন। তাও অকুণ্ঠ ধন্যবাদের কঠিন পাথরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেল। অগত্যা বিব্রতকে ডেকে পাঠাতে হল আবার। বলতে হল, ইনসপেকশান বাংলো খুলে দিতে। বিব্রত বলেছিল দিন তিন চারেকের মধ্যে ভিজিটার আশা করা যাচ্ছে বিদেশী। তাও জন ছয় সাতেক। সে ক্ষেত্রে ইনসপেকশান বাংলো হাতছাড়া করা ঠিক হবে কিনা পাকা-পাকি। কৃষ্ণমূর্তি বলেছিলেন—পরের কথা পরে। বর্তমান সামলাও। এই সময় শীলা বলেছিল—ইনসপেকশান বাংলোর আযতন জানি না। আমার মোটে খান দুই ঘর লাগবে। কল পায়খানা বাথরুমের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র হলেই আর কিছু চাই না। ইঙ্গিতটা, আসুক না ভিজিটার—অসুবিধে কি? একাধিক কল পায়খানা থাকলে একসাথেই থাকবো না হয়। কৃষ্ণমূর্তি অনুরোধ করলেন বিব্রতকে—ইন্‌সপেকশান বাংলোয় জল, লোকজনের ব্যবস্থা করে দিতে। কোন রকম কষ্ট না হয় মজুমদারের। বিব্রত সবই করেছিল। সাধ্যমত। সাধ্যের অতিরিক্ত।

পরদিন সেন্ট্রাল ওআর্কশপে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল—সেও বিব্রত। গত মাস তেরো-চৌদ্দ ওর ক্রিয়াকলাপ দেখে মনে মনে নাম দিয়েছি ওর সেবাব্রত।

অনেক রাত পর্যন্ত একা একা তাঁবুতে বসে বসে ভেবেছি আমার প্রোমোশানের কথা। গেল। আমি কি ইনএফিশিএণ্ট? আমার কাজের সুখ্যাতি—কর্তা-ব্যক্তিদের মুখের কথা তা হলে! পাগলের মতো কাজ করি।

কাজ করতে থাকা কালে মনে হয় না একবারও, উন্নতির আশায় করছি। কাজ করি কাজের নেশায়—কাজ করি কাজের জন্যে। কিন্তু প্রত্যেকটি স্বেদবিন্দু কপাল থেকে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে মুহূর্তেকের জন্য হলেও স্ফটিক স্বচ্ছ হয়ে তারপর নিশ্চিহ্ন হয়। সেই একটি মুহূর্তই সে কামনার রং ধরে। এটা অস্বীকার করি কি করে?

বসে বসে ভেবেছি। যাওয়া হয় নি মনোরমাদের বাড়ী। ওদের বাড়ী যাওয়া আমার প্রতি সন্ধ্যার অবৈতনিক চাকরী। হাজিরা না দিলে মাইনে কাটা যায় না ঠিকই—মুখভার দেখতে হয়। মুখ বন্ধের মুখবন্ধ ওটা। ভয় করি ওটাকে।

সেদিন নয়, পরদিন নয়, তারপর দিনও নয়।

ক্লাব গজিয়েছে ব্যাঙের ছাতার মতো। পাড়ায় পাড়ায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে। আছে অনেক, আমার জন্যে নেই একটিও। চায়ের দোকান আছে। রক আছে অনেক বাড়ীর, রাস্তার কোলে প্রসারিত। রাস্তা আছে বেড়াবার। সান্ধ্য-ভ্রমণ, প্রাতর্ভ্রমণ করো না—আটকাচ্ছে কে?

আছে সবই। আমার জন্যে নেই কিছুই। ওসব করি নি কোনদিন।

এই শহরের প্রথম পরিচয় ভুলতে পারি নি। যেমন ভুলতে পারি নি প্রথম দিনের চাকরীর খুঁটিনাটি।

তাঁবুর জীবন শেষ হয়েছে। একখানা ফ্ল্যাট পেয়েছি অফিসার্স মেস-এ। দু কামরার।

মনোরমাদেরও উঠেছে পাকা বাড়ী। ছোট্ট মজবুত কিন্তু ছবির মতো সুন্দর। বাড়ী বড় নয়। সৌধ বা প্রাসাদ নির্মাণ করানর ক্ষমতা অবশ্যই চন্দ্রশেখর চৌধুরীর আছে। করান নি। এই কনট্রাক্ট শেষ হলে যেতে হবে তো অন্যত্র। এই বাড়ী তখন থাকবে—মাঝে মাঝে এসে বেড়িয়ে যাবার জন্য। শৈলাবাসের মতন।

মনোরমাদের বাড়ী, অফিসার্স মেস, ইনসপেকশান বাংলো—সব কটাই অভিজাত পাড়ায়। কাছাকাছি সব—লাগালাগি না হলেও। লোষ্ট্র নিক্ষেপের দূরত্বের বাইরে নয়।

চতুর্থ সন্ধ্যায় ডাক পড়ল। বনোয়ারী এলো মিসিবাবার ডাক নিয়ে। গিয়ে দেখি মুখ তো নয়—তোলো হাঁড়ি।

মনোরমা বলল: শুনলুম, সুস্থই ছিলেন। অফিসও গেছেন এসেছেন

নিয়মিত—তাও দেখেছি। খুব কাজে ব্যস্ত ছিলেন না কি? না, শরীরটা বাইরে থেকে সুস্থ দেখালেও ঠিক নেই ভেতর ভেতর?

মনে করলুম—ওগো মিথ্যে, পায়ে পড়ি তোমার—ধার দাও যা কিছু অস্ত্র। বাঁচি এই আক্রমণ থেকে। মনে হল, বলি—কাজ পড়েছিল অপিসে। কিন্তু মনোরমা তো বলেই ফেলল—গেছেন এসেছেন। দুটো কার্যই দেখে ফেলেছে তাহলে। প্রায় রোজই—

ঐ ভাবতে গিয়েই মুশকিলে পড়লুম আরো।

ধমক খেলুম একটা। মনোরমা বলল: উত্তর দেবেন না, না, দেবার মতো নেই। ভাবছেন কি অতো?

বললুম থতিয়ে: মানে—মানে—মনটা ভালো নেই আর কি। আর কিছু নয়। তাই—

মনোরমা বলল: তা জানি ভালো নেই মনটা। আবার এও জানি ইনসপেকশান বাংলোয় গেলে ভালো থাকে, না?

দুর্দান্ত ধরা পড়ে গেছি। কিন্তু সে তো—

উত্তরের জন্যে আকাশ পাতাল খুঁজতে হল না এবার। টপ করে জুগিয়ে গেল: সে তো একটা দিন মাত্র। মজুমদার যেদিন জয়েন করলেন, তার পরের দিনটা মিস মজুমদার ধরে নিয়ে গেলেন। একরকম জোর করেই যে—

মুখে গালে রক্ত ফেটে পড়ছে মনোরমার। পিঙ্গল চোখ থেকে ঝরছে আগুন।

: মিস মজুমদার এখানে আসার পর থেকেই মন-খারাপটা হয়েছে! এর আগের সন্ধ্যেবেলা পর্যন্ত ঠিকই ছিল, না!

: মানে—হ্যাঁ—ওঁকে দেখেই তো মন খারাপ হল। মানে—মানে—আর কিছুই নয়। আমার প্রোমোশানের আশা তো রইল না কি না!

: থাক থাক—শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করতে হবে না আর। আপনার অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিতে খুশী হলাম। কনফেশানের বোল্ডনেস আছে বটে। এ জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। সত্যি আপনি যে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে না বলে, এতো খোলাখুলি বলবেন—ভাবতে পারি নি।

আমাকে ভুল শোধরাবার বিন্দুমাত্র অবকাশ দিল না। দু হাতে মুখ ঢেকে ভেতরের ঘরে চলে গেল মনোরমা। ফোঁপানির আওয়াজও পেয়েছিলাম যেন—

বসেই আছি বুদ্ধুর মতো। ঐ যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভাবছি কি করা উচিত। ভাবছি আকাশ পাতাল। দিয়ে ফেরৎ আনা যায় ভালোবাসা। ধনুক থেকে ছোঁড়া তীর পর্যন্ত ফেরৎ আনা যায় হয়তো। শুধু এই একটিমাত্র জিনিষ—মুখের কথা—একবার বেরিয়ে গেলে রক্ষে নেই। যতোই সাফাই গাও, ফেরৎ পাবে না আর। সাফাই গাইতে গেলে উল্টো উৎপত্তি হবে আরো। হ্যাঁ, শীলাকে দেখামাত্রই মন খারাপ হয়েছে। অস্বীকার করি নি। কিন্তু কেন? সেটা খুলে বলার অবকাশ দেবে না তুমি? শীলা কি তোমার চেয়ে সুন্দরী? তোমার চেয়ে তো দূরের কথা—তোমার কাছেই দাঁড়াতে পারে সৌন্দর্যে? তবে কেন এই অমূলক সন্দেহ!

মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর করে বেরিয়ে এলেন আয়ী-মা।

: কি বলেছো তুমি রমাকে? সাহস তো তোমার কম নয় বাপু! অপমান করো বাড়ী বয়ে এসে!

বললুম: কিছুই বলি নি আমি—যাকে অপমান মনে করা যায়।

ধমকের সুরেই বললেন আয়ী-মা: ও কাঁদছে কেন তা হলে? অমনি অমনি! শখ করে? ও তো খুব কঠিন মেয়ে। সহজে কাঁদতে জানে না। তার চোখে জল—

অপমানিত বোধ তো করলামই, রাগও হল তেমনি। ডেকে এনে এ কি-রকম ধারা ব্যবহার?

বললুম: কান্নার কারণ শুধু ঐ একটাই হয় না। অনেক কারণেই লোকে কাঁদে, কাঁদতে পারে। মনে দুঃখু পেলে কাঁদে, আশার জিনিষ না পেলে কাঁদে চোখে কয়লা পড়লেও কাঁদে—

: অতো সব শুনতে চাই না। রমা কাঁদছে কি জন্যে সেইটে শুনতে চাই। বলো, বলো—চুপ করে রইলে যে!

দৃঢ়স্বরে মরীয়া গলায় বললুম: তা জানি না। আন্দাজ করতে পারলেও আপনাকে বোঝাতে পারবো না। সম্ভব নয়। সে যাই হোক, আমি যাচ্ছি—

আয়ীমা বললেন, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে: তাই যাও বাপু—

ভেতর দোরের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে এলাম। না, নাটক হল না। জীবনটা গল্প নাটক নয়। বেরিয়ে এলো না মনোরমা। জল ছলছল চোখ—ধরা গলায় বলল না: যেও না—কেন যাচ্ছ—মুখের

কথা শুনেই চলে যাচ্ছ। অন্তরের কথা শুনবে না বুঝি! ছাখো দিকিনি, কি ঝড়ের হাহাকার বয়ে চলেছে সেখানে। কিসের এ হাহাকার, তাও বোঝো না!

তারপর আরো দেখা হয়েছে। বহু, বহুবার। কথাবার্তা হয়েছে। শুধু সেই সহজ সুরটুকু ফিরে পাই নি বোধ হয় আর। ঝরা ফুল যেমন ফিরতে পারে না শাখায়, ভাঙা মনও তেমনি। জুড়বার আঠা নেই কোন।

অনেক দেখে অনেক ঠেকে একটু শিখেছি বোধ হয়। মানুষ যা বলে তার গুরুত্ব নেই। ততোটা না দিলেও চলে। যে কথাকে যতোখানি ওজনের বলে মনে হচ্ছে, সে কথার ওজন হয়তো অতোটা নয়। শিখেছি—বলে ফেলাটা বর্ষণের সামিল। বলে ফেলার পর অতোটা ওজন আর তার থাকে না। কমে যায়।

আর একটু শিখেছি। অন্তরে যেটা পাষাণের মতো গুরুভার—মুখে ব্যক্ত করা যায় না সেটা। আসল বেদনা নীরবে মনের তটের তলায় আবর্ত রচনা করে। ভাঙন ধরায়। সে নীরব। মুখের বাক্য মুখেরই বাক্য।

মিস মজুমদারের জয়েন করার পরদিন তাড়াতাড়িই গিয়েছিলাম অফিসে।

আজ আমার ইনচার্জের চেয়ার-স্বর্গ থেকে বিদায়ের দিন।

বিব্রত সঙ্গে করে নিয়ে এলো মিস মজুমদারকে। চিনিয়ে নিয়ে এলো অফিসে।

উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলাম। ঝেড়ে পুঁছে পরিষ্কার করে রেখেছি টেবিল। সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি যতোটা পেরেছি। টেবিলে কাগজে শো-কেসের দেখনাই পরিচ্ছন্নতা থাকে না আমার। পরিচ্ছন্নতার চেয়ে প্রয়োজন বড়ো আমার কাছে।

হাসি না এলেও হাসতেই হল। বললুম: সুপ্রভাত মিস মজুমদার, আসুন।

: সুপ্রভাত—মিষ্টার, বলে আমার নামটা না জানায় থেমে যেতে হল শীলাকে।

জুগিয়ে দিলুম: রয়—এ রয়—অনুপম রয়!—নিন বসুন।

আমার ছেড়ে দেওয়া সিংহাসনে বসতে দিলুম শীলাকে। ঘরখানার চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখল শীলা। দেয়ালে দেয়ালে মানচিত্র টাঙানো এখানেও।

কৃষ্ণমূর্তির অফিসের মতো নীল পটভূমিতে সাদা রঙের, ব্লু প্রিন্ট। জায়গাটার ইতিহাস ভূগোল। জায়গাটার অনুন্নত অতীত, উন্নত সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ। মা যা ছিলেন, যা হইবেন—সব। কৃষ্ণমূর্তির অফিসে, ড্যাম সাইটের আর ড্যামের ছবির প্রাধান্য। আমাদের এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন আর বিতরণের। জেনারেশান আর ডিষ্ট্রিবিউশনের। পাওয়ার স্টেশনের খুঁটিনাটি। কোথায় জেনারেটার বসবে, ট্রানসফরমার বসবে কোন ঘরে।

এ পাশে বাইরের দরজা। ওপাশে স্প্রিং-এর দরজা ওআর্কশপের দিকে যাবার। বাকী দুই দেয়ালে দুটো রাক্ষুসে জানালা। দেয়ালের বাদ বাকি জায়গাটা বড়ো বড়ো ব্লু প্রিন্টে ঠাসা। আমিই ঠেসেছি।

এই ঘরের সাম্রাজ্য হীরা জহরতে ঠাসা নেই ঠিকই। যে হীরে পাওয়া যায় খনিতে। এখানে কারবার অন্য হীরের। এ আমার কাছে সাম্রাজ্য। এর প্রত্যেকটি সম্পদ আমার তিলে তিলে সঞ্চয়। একটি একটি করে একটু একটু করে সংগ্রহ করেছি এই সম্পদ। ধ্যান ধারণার বাইরে ছিল তখন যে, কোনদিনও এই সম্পদ হাতে তুলে দিতে হবে অন্য কারো। ছেড়ে দিতে হবে এই সিংহাসন। তা হলে হয়তো সংগ্রহ করতুম না এতো করে। মবলি আসবে—ইবেকশান করে দিয়ে চলে যাবে। তার পরেও আমি থাকবো। তামার তারের হাত বাড়িয়ে ধরবো দেশ-দেশান্তরের হাত। অনুন্নতকে টেনে তুলবো উন্নতি আর আত্মপ্রতিষ্ঠায়।

শীলা বলল: মাথার মুখোশটা খুলি এবার—কি বলেন!—বলে মাথা থেকে হেল্‌মেটটা খুলে টেবিলে রাখল শীলা। কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল একরাশ প্রায়-কটা চুল। কোন কিছুতে চাপা থাকলে ঘাস যেমন বিবর্ণ হয়ে যায় —এ চুলও টুপি চাপা থেকে থেকে কালিমা হারিয়েছে। কিছুটা সোনালী রঙের। কড়া ব্রিলিয়ান্টিনের গন্ধ ছড়াচ্ছে।

এতোক্ষণে খেয়াল হল মিস মজুমদারের: আরে আপনি দাঁড়িয়ে! কি আশ্চর্য, বসুন বসুন।

ইতিউতি তাকাতে লাগল শীলা—চেয়ারের খোঁজে। নেই। রাখি নি আর—ইচ্ছে করেই।

শীলাই বলল আবার: আনতে দিন কোথাও থেকে। আচ্ছা, আমি কিন্তু আপনার বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না!

নিজ বাসভূমে পরবাসী লাগছে আজ নিজেকে। আমার আসন ছেড়ে

দিয়েছি। নিজের ব্যবস্থা করি নি কিছুই। আজ থেকে সে ব্যবস্থা করাব কথা আমার নয়, শীলার। শীলাই ইনচার্জ—আমি নই আর। আমি সাবরডিনেট মাত্র।

তা হলেও 'বস'। কথা শুনতে হয়। চেয়ার আনিয়ে নিলাম।

বসলাম মুখোমুখি। মাঝখানে টেবিল।

শীলা বলল : ছু একটা পার্সোনাল কোয়েশ্চেন কবব—কিছু মনে না করেন যদি।

ম্লানমুখে হাসি টেনে আনলুম। ভদ্রতা রাখতে। : বলুন—

: কোন সালে পাস করেছেন ? কোন কলেজ ?

: গত বছরেব আগের বছর। শিবপুব—

হাসল শীলা : সতীর্থ তাহলে। আমি রুরকী।

: জানি। আপনাব য়্যাকাডেমিক্যাল সবই জানি।

: ব্যক্তিগত ? তাও জানেন নাকি ?—হো হো কবে পুরুষালি হাসল শীলা।

বাহাত্তর ফুট উঁচু থেকে লাফিযে পড়ল নাকি জল ! ড্যামেব বেডিআল গেট খুলে দিল নাকি কেউ।

হাসিতে যোগ দিলাম, বললাম : মেযেদেব ব্যক্তিগত জানতে নেই।

হাসি থামায় নি শীলাও : কেন-কেন-কেন—তাদেব অপবাধ !

হাসির জলতরঙ্গ এ মুখ থেকে ও মুখে নেচে নেচে ফিবছে।

বললুম : মেয়েদের ব্যক্তিগতটা গোত্রান্তব হয় কি না। কুমাবী মেযেবা কিউপোলা থেকে 'মুচিতে' ঢালা তবল ধাতু। যেমন তপ্ত তেমনি তবল। বরং বলা যাক—তরল হওযা সত্ত্বেও তপ্ত। তারল্যে যদি সাবল্য ভ্রম হয, বাড়ানো যায যদি অসতর্ক হাত—ব্যস। দেখতে হবে না আব। তাপেব ছাপ রেখে যাবে। আর তারল্য ! বিবাহের ছাঁচে না ঢালা পর্য্যন্ত নিজেব রূপ নেই তার। বিবাহের আগে বাপের বাড়ীর ঢপ, বিবাহেব পর স্বামীব বাড়ীর—

অতোটা সরল রইল না শীলাব হাসি। অর্থপূর্ণ হযে আয়তনে কমে এলো।

বলল : কুমারী মেয়েদের ওপর ভারী রাগ দেখছি আপনার ! উদ্দেশে পাঁচ কথা দিলেন শুনিয়ে আমাকেই। কার ওপরে হযতো রাগ, কথা শোনালেন আমাকে—

এর পর কোন কথা কোন পথে বাঁক নিত কে জানে! কৃষ্ণমূর্তি এসে বাঁচিয়ে দিলেন।

সেই হো হো হাসি। : কি হচ্ছে তোমাদের সব। মেলাই কাজ করছ নাকি! অতো কাজ করা ভালো নয়—

এর পর কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে কাজের কথা হোল। বাজে কথা হোল। কাজের কথার মধ্যে আমাদের ডিউটি নির্ধারণ। আমি কি করব, শীলা কি করবে—করণীয়ের বাঁটোযারা। বলা বাহুল্য এতোকাল আমিই ছিলাম সব। তারই খানিক ভেঙে দেওয়া হোল শীলাকে।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন : লেখাপড়ার কাজটা মিস মজুমদারই করুন। আর তুমি? তুমি ওয়ার্কশপ নিয়ে থাকো। সাইটে ঘোরাঘুরির কাজটাও তোমারই। ওভারঅল চার্জ সর্ববিষয়েই অবশ্য মজুমদারের। তোমরা কি বলো? এই ভালো হল না?

বললুম : এক্সকিউজ মি, আমার সাজেশান আছে একটা। আপনারা শুনুন—ভালো লাগে কি না দেখুন। আমি বলি কি, মিস মজুমদার দেখে নিন আগে সবটা। যতোটুকু আর যেটুকু ভালো লাগে ওঁর, তাই নেবেন উনি। বাকিটুকু আমার থাকবে—

হাসতে লাগলেন কৃষ্ণমূর্তি : নট এ ব্যাড আইডিয়া। ইট ইজ ইয়র বিজনেস। ইউ শুড ডিসাইড ইয়র ওন শেআর অব পার্টনার শিপ। আমার কি। নাথিং—

তারপর বাজে কথাও হোল। মিস মজুমদারের কি কি অসুবিধা হচ্ছে—সেগুলোর জন্য বিব্রতকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, সে কথাও বললেন। বিকেলের চায়ে নেমন্তন্ন করলেন। সাড়ে তিনটেয় অফিসে বসে সেবন করা হয় যেটা, সেই চায়ে।

প্রথম দিন বলেই কিনা জানি না, মজুমদার বড়ো সায়েবের নেমন্তন্ন রাখতে গিয়েছিল। আমিও গিয়েছিলাম। আমারও নেমন্তন্ন ছিল। আর ছিল পথ প্রদর্শকের ভূমিকাটাও।

প্রচুর খাওয়ালেন বড়ো সাহেব। অতো কেক, প্যাষ্ট্রী, স্যাণ্ডুয়িচ কোত্থেকে যে যোগাড় করেছিলেন। পরে শুনেছিলাম—'শেফ'-এর নাম দিল বাহাদুর। মনোরমাদের কুক কাম বেয়ারা। এই পল্লীর সাহেবী-খানার যজ্ঞিবাড়ীতে তারই একচেটে সাম্রাজ্য। তা সে যার বাড়ীতেই হোক—

এখানকার হালচাল আর যাবতীয় কিছু জেনে নেবার কৌতূহল মজুমদারের না হওয়াটাই বিচিত্র। সেই দিনই তার বাসায় যাবার জন্য পেড়াপীড়ি করতে লাগল শীলা। আমিও গেলাম। মনোরমাদের ওখানে দু'রাত্রি যাওয়া হল না।

পরদিন আমিই প্রস্তাব করলাম। : বাইরে ড্যাম সাইটে, পাওআর স্টেশনের কনষ্ট্রাকশানের কাজ দেখতে নিয়মিত যেতে পারি নি এতোদিন। আপনি এসেছেন—সেই কর্তব্যটা কায়মনে সুরু করি, কি বলেন!

নতুন বলেই কিনা জানি না, মজুমদারের একটা স্বভাব, কোন প্রস্তাবেই বিশেষ বাধা না দেয়া। মন্তব্য না করে মোটামুটি মেনে নেওয়া।

আমার এ প্রস্তাবটিও সেই রকম নীরবেই মেনে নিল মজুমদার। সংক্ষেপে বলল: বেশ তো, দিন কতো দেখাই যাক না। অসুবিধে হয়, তারপর বিবেচনা করা যাবে।

বলে ফেলে মনে হোলো আমার—ভুল বুঝল না তো মজুমদার। নতুন লোক সে। হাতে কলমে একটু না দেখিয়ে দিয়ে, নতুন কাজ চাপিয়ে দিলাম তার কাঁধে। এর আর একটা সাদা মানে হতে পারে—যেটার নাম বিপদে ফেলা।

সেণ্ট্রাল ওআর্কশপের আমিই ছিলাম শেষ কথা। আজ আর নই। কোন হুকুম দিতে গেলে আজ থেকে মজুমদারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। সেইটে সহ্য হচ্ছিল না আমার। মুক্তি চাই আমি পলায়নের পাছ-দুয়োর দিয়ে। মুক্তি চাই এই অসহ্য অবস্থার হাত থেকে। আউটডোর কাজই আমার ভালো।

তৃতীয় দিনেই এই মুক্তি পাবো ভাবি নি। ভেবেছিলাম, বাধা দেবে মিস মজুমদার। বলবে—সে কি হয়? তা বলল না। গোপন মনে আমার দর-বাড়ানোর পরোক্ষ প্রচেষ্টা, এমনি ভাবে আমাকেই অপমান করে গেল। নিজের তৈরী ফাঁসি পরলাম গলায়। মুখের বাক্যই শুনলেন দেবতা, অন্তরের ব্যথা বুঝলেন না!

মন এতোই খারাপ হয়ে রইল যে, মনোরমার সঙ্গে সাক্ষাতের উৎসাহ পেলাম না।

মাটির অনেক গভীরে—লেভেলেরও ষাট সত্তর ফুট নিচে পর্যন্ত লোহার পিন পোঁতা হচ্ছে। সত্তর আশী ফুট লম্বা দশ বারো ইঞ্চি লোহার কড়ির

টুকরো। তাকেই পিন বললাম। কাজটা এতোবড়ো আর এতো বিশাল যে সত্তর আশী ফুট লম্বা কড়িও আলপিনের মতোই ছোট তার কাছে। কয়েক ফুট দূরে দূরে পোঁতা হচ্ছে। এমনি কয়েক শো। ভূমিকম্পের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচার জন্য বাড়ীর ভিত যে রকম করে গাঁথে কলকাতায়।

ওদিকে অনেক দূরে মাটি কাটা মেশিনে মাটি কেটে চলেছে। দু তিন মিনিটে এক এক্ক গাড়ী বোঝাই। সেই মাটি বয়ে আনছে বিশেষ ধরণের গাড়ী। এনে ফেলছে ঐ পোঁতা পিনের উপরে। পিনের খানিকটা মাটির মধ্যে বাকিটা ওপরে। এই জায়গাটা ভরাট হবে সিমেণ্ট কংক্রীট দিয়ে। কংক্রীট ঢালার আগে পিন পোঁতা হল যে মাটীতে, সেই মাটী দুরমুশ করে নেয়া হবে। জল ছিটিয়ে নিয়ে তার পর চালানো হবে গাঁট্টাগারা রোলার। রোলারটা যদি দুরমুশ ওয়ালা হয়—জল ছিটোন নরম মাটীতে সেই রোলার চালালে, দুরমুশের কাজ হবে নিশ্চয়ই। আবার জল ছিটোন, আবার মাটী ফেলা, আবার রোলার। বার কয় এমনি চালালে পাথরের চেয়ে কিছু কম শক্ত হবে না মাটি।

এমনি করে বাঁধের ভিত গাঁথা হচ্ছিল।

ওদিকে টিলার ওপাশে জমে আছে গত বর্ষার জল। ওপারের দূর দূরান্তের গ্রাম খালি করে দেওয়া হয়েছে। সেই সব গ্রামের লোকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। অন্য গ্রামে গিয়ে নতুন উপনিবেশ গড়েছে তারা। ভাবী লেকের পাড়ে পড়েছে তাদের বাড়ী—তাই আজ তারা উদ্বাস্তু। বাঁধের ভিতের মাটি কেটে আনা হচ্ছে সেই জায়গা থেকে, একদা যেখানে বাড়ী ছিল তাদের। স্বাভাবিক টিলার ওপাশে ছিল নাবাল জমি। তারি পাশে পাশে ছিল তাদের ঘর। প্রত্যেক বর্ষায় নিশ্চিন্ত থাকতে পারত না।

তাদের বসবাস ছিল যেখানে, সেখানে আজ জল। এ বর্ষায় তো কম। আগামী বর্ষায় তো চব্বিশ পঁচিশ বর্গমাইল ব্যেপে জল আর জল থাকবে। জলাধারে বারোমাস থাকবে জল। সেই জল দেড়শো ফুট ওপর থেকে ফেলবার ব্যবস্থা ক'রে, তাই দিয়ে তিনটে অলটারনেটার চালানো হবে। এই এ-সি উৎপাদক জেনারেটারগুলো দাঁড় করানো ডিজাইনের। সাধারণ জেনারেটারের মতো শোয়ানো নয়। দাঁড় করানো ডিজাইনের সুবিধে এই, তলায় একপাশ দিয়ে ঢুকে আর একপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে জল। গোল ড্রামের মতো বদ্ধ জায়গার মধ্যে ঘুরপাক খেতে হবে তাকে। ড্রাম ছেড়ে

যাবার আগে পাক মেরে যাবে অলটারনেটারের স্পিণ্ডল বা টাকুকে। ঘুরতে থাকবে অলটারনেটার মিনিটে ছশো পাক। বিদ্যুৎ জন্মাবে আট হাজার কিলোওয়াট। যার চাপ হবে এগারো হাজার ভোল্ট। এই এগারো হাজার ভোল্টকে ষ্টেপ-আপ ট্রান্সফরমারের সাহায্যে ছেষট্টি হাজার ভোল্ট! আবার একলক্ষ দশ হাজার ভোল্টও করা যাবে। এই রকম জেনারেটার ট্রান্সফরমারের প্রত্যেকটি তিন সেট করে।

তিন সেট অলটারনেটার। তিন সেট, ষ্টেপ আপ ট্রান্সফরমার। তিন-চার সেট এগারো হাজার থেকে চারশো চল্লিশ ভোল্ট ষ্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার। তাদের সঙ্গী সাথী ল্যাংবোট নানা আকারের সার্কিট ব্রেকার। পাঁচ আর দুই সাত আর নয়—একুনে যোল রকমের সার্কিট ব্রেকার। কনট্রোল প্যানেল। বাড়ীতে ব্যবহার্য চারশো ভোল্টের এ-সি উৎপাদক আর এক সেট অলটার-নেটার। এইগুলি বুঝে নিয়ে আসতে বিলেত গেছে মরলি সাহেব।

এই সব জিনিষ বিলেতের কারখানায় তৈরী হচ্ছে। কার্যক্ষমতা পরীক্ষা হচ্ছে তাদের, তবে সাগর পাড়ি দিচ্ছে তারা। মরলি নিজে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হচ্ছে, পৌঁছে দিচ্ছে, লিভারপুরের জাহাজ ঘাটায়। জাহাজে তুলে দিয়ে তবে ছুটি তার।

আমি প্যাকিং স্লিপ দেখে দেখে হিসেব মিলিয়ে এখানে বুঝে নিচ্ছি।

নিচ্ছি না, নিচ্ছিলাম।

আমিই সব ছিলাম, সর্বেসর্বা ছিলাম। এখন আর কেউ নই। মিস মজুমদারের সাবরডিনেট। আমি চাকর—আমি হুকুম বরদার।

জীপে ট্রাকে ঘুরে বেড়াই। সাইকেলে, পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াই। নকল লেকের পাড়ে চলে যাই। চলে যাই মাইলের পর মাইল ট্র্যাকশান লাইনের সাইটে সাইটে।

কাজে ঘুরি, অকাজে ঘুরি। মনের তাগিদে ঘুরি, নিজের হাতে গড়া অফিসে নিজেই ঢুকতে পারি নে। বাইরে ঘুরে বেড়াই মনের জ্বালায়।

এদিন জীপ ছিল সঙ্গে। কাটা মাটি এনে ফেলছে যেখানে ট্রাকে করে ট্রাক্টরে করে—তারই পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিরাট একটা দ' ভরতি করা হচ্ছিল একটু দূরে। এইখান থেকে মাটি ঝুড়ি বোঝাই করে নিয়ে দ'য়ের পাড়ে দাঁড়িয়ে ফেলা হচ্ছিল। এই একটা জায়গায় মেশিন চলে নি। চালানো যায় নি। মাথায় করে আনতে হচ্ছিল ঝুড়ি বোঝাই। কয়েকটি দলে—

আনা হচ্ছিল রীলে-রেসের মতো। একজন বোঝাই করে দিচ্ছিল ঝুড়িতে। আর একজন খানিকটা দূরে বয়ে আনছিল। তৃতীয় জন আরো খানিকটা। চতুর্থ জন পাড়ে দাঁড়িয়ে ঝুড়িটা রিসীভ করে মাটিটা ফেলে দিচ্ছিল দ'য়ে।

সবটাই কামীনদের কাজ। বেটাছেলে কুলি কম। প্রায় নেই-ই।

দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। এমনিই। ওটার সঙ্গে আমার ডিউটির সম্পর্ক নেই!

ক হাজার লোক কাজ করছে। কাছে, দূরে। কত রকমারি তাদের কাজ। কতো বিচিত্র আওয়াজ। যে যার কাজ করে চলেছে অবশ্য মুখ বুজেই। তা হলেও অতো হাজার লোকের স্রেফ নিঃশ্বাসের আওয়াজই কি কম!

কতো বিচিত্র যন্ত্র! তাদের চলারই বা কতো রকমের শব্দ। খোদার উপর খোদকারীর কতো আয়োজন!

মেয়ে কুলীরা কাজ করে চলেছে। মাথায় ঝুড়ি, ঝুড়িতে ভরতি মাটি।

আমাদের সামনে দিয়েই ঐ রীলে রেস চলেছে।

হঠাৎ একটি মেয়ে আমার কাছাকাছি পৌঁছে মাটিতে বসে পড়ল। তার হাতে তখন খালি ঝুড়ি। বসে পড়েই ডুকরে কেঁদে উঠল। গায়ে মাথায় কাপড়ের বাহুল্য থাকে না ওদের। তাই কাপড় টেনে মুখ ঢাকা সম্ভব হল না। দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

ওদের ঠিকাদার ছিল কাছাকাছি। সামনে এলো। ব্যস্ত পায়ে নয়, আস্তেই। : কি রে, কি হোলো বেউল্যো? বসে পড়লি কেন?

মুখ ঢাকা হাত একটু আলগা দিয়ে আঙুলের ফাঁকে চোখ তুলে তাকালো বেহুলা।

: আজ আর পারবো না সরদার। দরদ হচ্ছে বড়ো—

মেয়েদের দরদ হলে সে দরদটা কোথায় জানতে চায় না কেউ। তারা স্বেচ্ছায় বলে, ভালো। সরদারের বাঁ হাতের কবজিতে রিষ্টওয়াচ—আমপাড়া সিলিডার। তাই দেখে সরদার বলল: দুটো চল্লিশ—

অর্থাৎ আজ এই অবধি হাজিরী হল তোমার। এইবার যেতে পারো তুমি।

ঝুড়িটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা। চোখের জল গালে এসেছে নেমে—তারি ধারায় মিশেছে মাটি। ম্লান মুখখানা মলিন।

সুন্দর মুখশ্রী বেহুলার। সত্যি সুন্দর চিবুকের টোল। নিটোল দুটি গাল, ছোট্ট কপাল। তার ওপর থেকে ঘন চুল। ঘন কালো। উপস্থিত মাটি মাখা। মাথার বিড়ে থেকে দুপাশ দিয়ে দড়ি নেমে চিবুকের তলে বাঁধা। ভ্রূসন্ধিতে তিনটি ফুটকি বচিত একটি ছোট্ট উলকি।

রং কালো না হলে বেহুলা বা বেহুলাদের মোটে মানাতো না। এ কথা আমার মতো অনেকে মানেন। শরীরের কি অপূর্ব বাঁধুনি! ঢিলে হয নি একটুও, ঢিলে হয নি কোথাও। গোটা কয় বাঁকা তুলির টানে শরীর আর মুখের কনটুর আঁকা যায় বেহুলার। বেহুলার একা নয় বেহুলাদের।

মাথার বিড়ে খুলে ফেলে ঝুড়িতে রাখল বেহুলা। কোমরে জড়ানো কাপড়ের গোঁজা খুলে দিয়ে ওপর শরীরের আঁচল ঢিলে করল। তাই টেনে মুছে ফেলল মুখখানা।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে সঙ্গিনীরা দাঁড়ালো না। একটা কথা শুধোল না। মুচকি হাসলো কেউ, কেউ হাসলো না। যে যার কাজ করে চলল।

পৃথিবীর দাঁড়াবার সময় নেই, জিজ্ঞেস করবার অবকাশও নেই।

জীপে উঠে স্টার্ট দিয়েছি। কেমন যেন এক চোখে আমার মুখে তাকালো বেহুলা—

আমার ইচ্ছে থাকলেও সাহস হচ্ছিল না, সাহায্যের হাত বাড়াই। এই সব কামীনদের যৌবন এমনই উদগ্র যে, এদের সংস্পর্শে এলেই ছাই লাগে গায়ে। আগুনের তাপ অনেক সময় লাগে, অনেক সময় লাগে না। ছাইটা কিন্তু লাগে-ই।

বেহুলার করুণ চোখ দুটো সেই সাহস দিলো আমায়। লোকলজ্জা থেকে মুক্তি দিল। বললুম: কি রে বেহুলা—আমার গাড়ীতে যাবি?

বেহুলা বলল: তুই তো হুই উপারে যাবি এখন? যদি যাস আর লিয়ে যাস তো যাই—

বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল লেকের পাড়, মাটি কেটে আনা হচ্ছে যেখান থেকে। যেখানকার মাটি বইছে ও, সেই দিকে।

যাবার প্রয়োজন ছিল না ঠিক ওদিকটায়। বললুম: হ্যাঁ, ওদিকেই তো যাচ্ছি—

সকলের ব্যঙ্গভরা কটাক্ষের ওপর দিয়ে জীপের চাকা চালিয়ে দিলাম। ধুলো লাগল তাদের পরনিন্দার মুখে। পিছনের সিটে বসেছে বেহুলা তার

ঝুড়ি সামনে নিয়ে। আমার গাড়ীর পিছনে আছড়ে পড়ছে জোড়া জোড়া কুৎসিত চোখ। পড়ুক।

যেতে যেতে বললাম : ঐখানে বুঝি তোর ঘর! তা হলে রোজ এই এতোটা পথ সকাল সন্ধ্যে যেতে আসতে হয়? খুব কষ্ট হয় তো তোর।

হাতে ষ্টিআরিং—চোখ সামনে। পথ বন্ধুর। বেশ চড়াই উৎরাই। এতো বন্ধুর যে, জীপে করেই যাতায়াত সম্ভব। সাধারণ গাড়ীর পক্ষে ডিফারেনশিয়াল ভেঙে যাওয়া বিচিত্র নয়।

প্রশ্নের জবাব না পেলেও পিছনে তাকাতে পারছিলাম না।

খানিক পরে কি প্রয়োজনে বাঁ দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি, চোখে কাপড় তুলে নিঃশব্দে কাঁদছে বেহুলা।

বললুম : দরদটা বেড়ে গেল বুঝি বেহুলা। থামাবো এখেনে?

বাঁ দিকে গত বর্ষার জল জমে লেক সৃষ্টি হয়ে আছে। মাটির প্রয়োজনে মাটি আনা হচ্ছে, লেকের উদর বাড়াবার জন্যেও মাটি আনা হচ্ছে!

বেহুলার এই চোখের জল—কতো বর্ষার জমানো কে জানে? ধ্বস নেমেছে আজ পাড়ে—ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হৃদয়ের একূল ওকূল—দুকূল।

বেহুলা কান্নাভারী গলায় উত্তর দিল এবার। বলল : না বাবু, থামাবি কেনে? তাড়াতাড়ি চল। আরো জোর, আরো জোর চালা ক্যানে—। সব শ্যাষ হয়া গেল রে, শ্যাষ হয়া গেল।

বললুম : কি, কি শেষ হয়ে গেল! কোথায় দরদ বললি নে তো!

মুখের ঢাকা খুলে ফেলল বেহুলা। : ঐ যে, ঐ তুইই তো বললি—ঘর।

: হঁ্যা, ঘর! তা কি হয়েছে?

: শ্যাষ হয়া গেল!

: সব খুলে বল, বেহুলা।

থামালাম জীপ। সামনে একটা শুকনো ঝরণার খাত। সাবধানে পার হতে হবে। গাড়ীতে ঝাঁকুনিও লাগবে জোর।

নেমে পড়লাম। লোকের চোখ পৌঁছচ্ছে না এখানে। কৌতুহল আর সন্দেহের বিষবাণ নেই।

বেহুলা বলে যেতে লাগল গাড়ীতে বসে। পাশে মাটিতে দাঁড়িয়ে শুনে যেতে লাগলাম আমি।

ঐ যে ঐ গ্রাম দেখা যাচ্ছে সামনে—দেওগাঁও—ঐখানে ঘর ছিল তাদের।

এক বছর আগেও ছিল, আজ আর নেই। জিজ্ঞেস করি—কেন? আজ আর নেই কেন? ঝড়ে পড়ে গেছে বুঝি। বেহুলা বলে—আকাশের ঝড়ে নয়। মানুষের খেয়ালখুশীর ঝড়ে। ঐ যে বুলডোজার চলছে দেখছেন না। এক একটা গুঁতো মারছে নাক দিয়ে—কয়েক একর জমি সাফ। ওর গুঁতোর ঝড়ে পড়ে গেছে ঘর। পড়ে হয়তো যায় নি এখনও! তাই তো বলছি তাড়াতাড়ি চলুন। এখনও হয়তো দাঁড়িয়ে আছে ঘরটা—

একটু থেমে আবার বলে চলে বেহুলা। গ্রামকে গ্রাম উৎখাত করে দিয়েছে। উদ্বাস্তু করে ছেড়েছে দু-তিন শো ঘর লোক। উদ্বাস্তু করেছে অতোগুলি লোককে, কিন্তু ঘর ভেঙ্গেছে শুধু আমারই।

আমি বলি—তার মানে? তাদের তো ঘর ভেঙে মাঠ করে দিয়েছে বুলডোজার। দেয় নি? সেই মাঠ থেকে মাটি কেটে আনছে এক্স্‌ক্যাভেটার। লেকের আয়তন বাড়াবার জন্যেই তো! একা তোমার ঘর ভাঙে নি। অনেকেরই ভেঙেছে।

বেহুলা বলে—তা জানি নে বাবু। আর কার ঘর ভেঙেছে খবর রাখি না। আমার ঘর ভেঙেছে এইটুকুই জানি—

বেহুলা বলে চলে: খেসারৎ দিল সকলকে কম্পানী। আমরাও পেলাম।

: তোমরা মানে?

: আমরা মানে?—ম্লান হাসল বেহুলা। শীতের আকাশে কখন ভিড় জমিয়েছে মেঘ একটু একটু করে, লক্ষ্য করি নি আগে। ভিড় করেছে অকাল বর্ষণের আশায়। রোদ ঢাকা পড়েছে পাতলা মেঘের মসলিনে; অমনি ম্লান বেহুলার হাসি।

: আমরা মানে? আমি আর আমার ঘর, আমার মরদ।

সহানুভূতির সুরে বলি, আহা। তারপর?

: আমরাও পেলাম—তিন শো চল্লিশ টাকা। আমরা মানে এবার শুধু আমার মরদ! আমি নই। আর ঐ টাকাটা পেল বলেই ঘর ভেঙে গেল আমার—

: না নিলেও ঘর ওরা ভাঙতই। সব ঘর ভেঙে দিয়ে তোমার একখানা ঘর বাঁচাত না নিশ্চয়ই!

: না বাবু, আপনি মোটে বুঝছেন না! ঐ টাকাটা পেল বলেই ঘর ভেঙে দিল আমার মরদ! লোভ হল—নতুন ঘর পাতবার।

: তা বেশ তো। পুরোন ঘর যখন ভাঙলো-ই, নতুন ঘর তো পাততেই হবে। কোথাও না কোথাও ? তাতে অন্যায়ই বা কি, অসুবিধেই বা কি !

হেসে ফেলল বেহুলা। হাসল দুঃখের হাসি। : আপনি একটুও বোঝেন না কেন বলুন তো !

কথায় ভাবে ভঙ্গীতে খানিক ব্যক্ত করল বেহুলা। খানিক ব্যক্ত করতে না পেরে, বা অব্যক্ত রেখে এরপর বেহুলা যা বলল তার সরলার্থ এই—

ঘর মানে কি শুধু দরমার চারখানা বেড়া ? আর মাথার ওপর গোলপাতার চালের আশ্রয় একটুখানি। না ঘর মানে বরও! ওর দুই ঘরই ভেঙে গেছে। ওর মরদও ছেড়ে গেছে ওকে! সম্ভবতঃ, ও ঠিক জানে না, অন্য নারীতে আসক্ত এখন সে !

বললাম : তা তুমি এখন থাকো কোথা ? আর তোমার মরদই বা কোথায় ? কোথায় থাকে, কি করে, জানো ?

বেহুলা বলে : উদ্বাস্তু সকলেই এপারে এসে কাজ নিয়েছে। ঠিকাদারের আণ্ডারে। মাটি বওয়া কাজ, ওআর্কশপের কাজ, বাঁধ বাঁধার নানা রকমের কাজ। সবাই তাই করে। সেও তাই করে। তবে, বেহুলা থাকে আরো পাঁচজন বেওয়া আর বেওয়ারিস মেয়ের সাথে। এল-টি টাইপের কোয়ার্টারে। আর ওর মরদ! কাছাকাছিই থাকে, তবে অন্য কুলীদের সাথে কোয়ার্টারে নয়। এক বাবুর বাড়ীতে।—চলো এবার, তোমার জিরোন হল ?

গাড়ীতে স্টার্ট দিই আবার। মনটা পড়ে থাকে বেহুলার ঘর-ভাঙা ঘরে।

চলতে চলতে বলি : তা ওখানে যাচ্ছো কেন ?

উত্তর পাই না। বাঁধের পাড় ভেঙে বাড়তি জলের বাহুল্য নেমে গেছে দু চোখের ঝরণা ধারায়। আবার খানিক না জমলে বাইরে আসবার চাপ হয়তো প্রবল হবে না।

যেখানে মাটি ফেলছিল, সেখান থেকে এ জায়গাটা ধু ধু দেখা যায়। দেখা গেলেও দূর কম নয়। বুলডোজার রোজই দৃষ্টিটাকে বেশ খানিকটা সুদূর বিসারী করে দিচ্ছে। অরণ্য দূরে চলে যাচ্ছে। কয়েক হপ্তা আগে যা ছিল সবুজ আর ঢ্যাঙা, মানুষের আক্রোশে আর আক্রমণে ক্রমেই সে পরাজিত হয়ে পিছু হটে চলেছে। সবুজ হচ্ছে ধূসর, ঢ্যাঙা হয়ে যাচ্ছে দিগন্তলীন নীল রেখা।

রণক্লান্ত বুলডোজার ঝিমোচ্ছে তখন। বিশ্রাম নিচ্ছিল খানিক। আমার

জীপ পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তড়াক করে লাফিয়ে নেমে পড়ল বেহুলা। তার মুখে বর্ষণের চিহ্ন না থাকলেও ছায়া ছায়া ঘোর—

খানিকটা দৌড়ে গেল ঈশান কোণে। ফিরে আসতে আসতে বাঁয়ে বেঁকলো। ডাইনে গেল কয়েক পা—দৃষ্টি উদাস। কাছাকাছি খুঁজে ফিরছে কি যেন—!

না নেই। ঝড় উঠেছিল ঈশান কোণে। বুলডোজারও ঝড়। আকাশের ঝড়ের চেয়ে অনেক বেশী ধুলো ওড়ায়। আকাশের ঝড় যদি বাড়ী ফেলে একটা, গাছ ফেলে ছুটো, মানুষের তৈরী ঝড় বাড়ী ফেলে দশটা, গাছ ফেলে পঁচিশটা। ঐ এক পরিমাণ সময়ে। আকাশের ঝড সরস করে যায় মাটি। জল ছিটিয়ে ফসলের সম্ভাবনাকে ডাক দিয়ে যায়। বুলডোজারের সে বালাই নেই। ধ্বংস আর ধ্বংস। শ্মশান আর মরুভূমি। যে জনপদ গড়তে লেগেছে কুড়ি বছর, বুলডোজারের তাকে ভাঙতে লাগে কুড়ি মিনিট।

ইতস্তত গাছ পালা ভূপাতিত। ঝড়ের পরে কলাবাগানের অবস্থা তাদের। ভাঙা দরমার বেড়া গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছড়াছড়ি পড়ে গোলপাতার ছাউনির ভগ্নাংশ, তুলসী মঞ্চ। কোথাও বা সামান্য কিছু ইটের পাটল অবশেষ।

আমার জীপ পার হয়ে, ফেলে-আসা পথে কয়েক পা পিছনে গেল বেহুলা। হেঁট হল। দেখল ভালো করে। চোখ মুখের ভাষা—পাওয়া আর হারানোর লাল কালোয় আঁকা। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসে জীপ থেকে ঝুড়িটা নিয়ে গেল। ওখানটা থেকে মাটি কুড়িয়ে নিয়ে, ফিরে এলো জীপে।

সন্দেহের দোলা নেই আর। নিশ্চিত নিশ্চিন্ত এবার বেহুলা। উদ্বেগও নেই, দুঃখও নেই।

বলল: আপনার কাজ হল?

অর্থাৎ হয়ে থাকলে চলুন। ওর কাজ সারা।

কাজ ছিল না। হেথা হোথা বিনা কারণে একটু ঘোরাফেরা করে গাড়ীতে এসে উঠলাম।

ফেরার পথে, কৌতূহল বশেই তাকালাম—যেখানটা থেকে মাটি নিয়ে গেছে বেহুলা। পাকা বাড়ী ছিল না কারোই, বেহুলারও না। ভিত ছিল না পাকা। গুঁতো দরকার হয় নি বুলডোজারের। ফুঁয়েই উড়ে গেছে। মিশে গেছে পঞ্চভূতে।

বেহুলার ঘরের ভিত পাকাও যদি হত, যে-ঘর ভাঙবার সে ভাঙতোই।

আর পুরোন ঘরের ভিতের মাটি নতুন ঘর বাঁধবার কাজে লাগাতে চায় বেহুলা। মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে গেল তার। তাতে লাভ!

যার লাভ সেই বুঝুক, আমার কি দরকার।

জায়গাটায় দেখলাম—স্থলপদ্মের গাছ ছিল একটা। ঈষৎ গোলাপী রঙের ফুল শুকিয়ে পড়ে আছে মাটিতে।

ফেরার পথে একটা জিনিষ আবিষ্কার করলাম, বেহুলার কথা থেকে। বেহুলার বরের নাম—বনোয়ারী।

কথা দিয়েছি গায়ে পড়েই—বেহুলার ঘর বাঁধার সাহায্য করব। জানি না, কি করতে পারব।

হাটে মাঠে বাটে এই মতো মাস পাঁচ ছয় কাটালাম। একদিন শেষে দেশে ফিরবার বড়োই বাসনা হল। দেশ মানে অপিস—সেণ্ট্রাল ওআর্কশপ।

মনোরমাদের বাড়ী সেই ঘটনার পরেও গেছি। আমি যাই নি—আমার শরীর আর অবয়ব গেছে। অনেকবারই। তার গল্প বলে নি।

ঘটনার দিন সাত-আট পর সন্ধ্যাবেলা ডেকে নিয়ে গেল বনোয়ারী—দিদিমণি ডাকছে।

গেছি। সহজ স্বাভাবিক মানুষ। সেই মনোরমাই নয়। আশ্চর্য এই মেয়ে জাতটা। এক রত্তিও যদি চিনতে পারি। আমি আশঙ্কা করতে করতে গেলাম আরো অপমানের। আর তার বদলে কিনা—অভিমানের বদলে আজ নেবো তোমার মালা—

মনোরমা বললে: আরে বাবা, এতো রাগ থাকা কি ভালো! আমি ভেবে বাঁচি নে! শরীর গতিক ভালো আছে তো বাবুর? যা বাবা বনোয়ারী, খবর নিয়ে আয়। প্রায় রোজই পাঠাই! বনোয়ারী এসে বলে: না মিসিবাবা, ভালোই আছেন বাবু। খবর নিয়ে জানলাম, অপিস করছেন রোজ। আজ বললাম, বাড়ীতে হয়তো পারি নে বাবুকে, রোজই তো কোথা যায়। যদি পাস, ডেকেই নিয়ে আসিস একেবারে—

ও! তাহলে এই কদিন প্রয়োজনের খাতিরে যে শীলার ওখানে গেছি—সে খবর নেয়াও সারা! কই, আমাদের মেসের শ্রীহরি তো দয়া করে বলেন নি আমাকে যে, প্রায় রোজই খবর নিতে আসত বনোয়ারী।

বললাম : সন্ধ্যেবেলা কোথাও একটু না বেরুলে কি রকম লাগে যেন! তাই—

মনোরমা বলেছে : সে তো ঠিকই। সারাদিন অপিসের কাজ কর্মের পর। আচ্ছা, আপনি নাকি নিজে যেচেই বাইরের কাজ নিয়েছেন, সত্যি?

একটু খুশী খুশী দেখালো কি মনোরমাকে! কেন?

বললাম : ঠিক তা নয়। ওপরওলা—উনি যা বলবেন, তাই তো হবে! কাজ করলেই হোলো, বাইরের আর ঘরের!

মনোরমা কুটিল চোখে তাকালো। অন্তত, আমার তো তাই মনে হোলো।

বলল : নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন অপিস! সেই সাজানো অপিস অন্যের হাতে তুলে দিতে নিশ্চয়ই মনে লাগে। নিশ্চয়ই তা নিজের ইচ্ছেয় কেউ দেয় না। তাই বলছিলাম, কায়দা করে উনিই আপনাকে সরালেন, না—

সেদিন ঐ পরিমাণ অপমানের পর এই পরিমাণ হিতৈষণার মানে! মেয়েরা সবই পারে বোধ হয়। ময়ূরকণ্ঠী ওদের মনের রং। কি আছে ওদের মনের গভীরে, ওরা নিজেরাই জানে না বোধ হয়।

বললাম : ছি! তা কেন? আমার 'বস' খুব ভালো লোক। কোন রকম খারাপ ব্যবহার করেন নি তিনি!

আমার কথা শেষ হয় নি—মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠল মনোরমা। যা বলল তাতে আশ্চর্য হলাম কম না। এ কি উক্তি!

মনোরমা বলল : উনি ভালো মানুষ বলেই তো আমার ভয়।

মনোরমা চুপ করে গেল। আমিও স্তম্ভিত। এবং স্তব্ধও।

বেশ খানিক সময় কেটে গেল একটা উত্তর খুঁজে পেতে। আঁচলের পাড়টা মুড়িয়ে মুড়িয়ে গোল করছে আর খুলে ফেলছে মনোরমা। খুব জরুরী কাজ—নিবিষ্ট হয়েছে তাতে। রাজ্যের ভাবনা আর দুর্ভাবনা দক্ষযজ্ঞ বাঁধিয়েছে ওর মাথার মধ্যে। সেইটে লুকোতে চায় আমার কাছে।

ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠল। দেয়াল গিরির আলোয় মনোরমার মুখের রক্তিমা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তবু বেশ বোঝা যাচ্ছে, মনোরমার মনে তোলপাড় করছে সামুদ্রিক ঝড়। নোঙর করা জাহাজ নোঙর ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছে। মাঝ সমুদ্রের জাহাজ আছড়ে পড়ছে এসে তীরে—

ব্যাপারটা ভালো মনে হোল না আমার। যেন এই সেদিনের অপমানের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে আজো।

জোর করে হেসে বললাম: আগে বললেন আমার অসুখ হয়েছে মনে করে, ভেবে বাঁচেন না। এবার বলছেন আমার 'বস' ভালো মানুষ বলেই আপনার ভয়। আমার জন্যে ভাবনা-ভয় দুই-ই আছে আপনার। কেন বলুন তো? আমি কে, যে—

মুখের কথাটা এবারও কেড়ে নিল মনোরমা। হেসে ফেলে বলল: জানেন না, আপনি একটি নাবালক শিশু। দেখা শোনা করতে হবে তো— নজর রাখতে হবে তো কারো! এখানে তেমন কে আছে আপনার! মার কোল থেকে আমার কাছেই তো এসে পড়লেন! আমি আপনার সেই নিজে-নিযুক্ত গার্জেন—

এইবার হাসির পালা—অকপট হাসাহাসি।

বললাম: খুদে গার্জেন। জানেন, গার্জেন কথাটা লিখতে গেলে আগে লিখতে হয় গার্ড।

হাসতে হাসতে মনোরমা বলল: জানি বৈ কি। খুব জানি। আর, সেটি ভুলবেন না। ভুললে বিপদ হবে। আর-একটি কথা ভোলা হয়েছে! শাস্তি পাওনা হয়েছে তার জন্যে, স্মরণ থাকে।

হাত জুড়ে বললাম: আজ্ঞা হয়, এই অধম আপনার দেওয়া শাস্তি শিরোধার্য করবার জন্য মাথা পেতে দিয়েছে, দেবি।

মনোরমা বলল: সময় মতো পাওয়া যাবে সেটা। তোলা রইল এখন—

বললাম: অপরাধটা জানতে পারি না ম্যাডাম?

মনোরমা বলল: তুমি ছেড়ে আপনি বলা—

আগেকার কথার জের টেনে আর একদিন বলেছিল মনোরমা, বলেছিল গম্ভীর হয়েই। : আমি গার্জেন আর গার্ড দুটোই—মনে আছে তো।

: হ্যাঁ দেবী! নিশিদিন ভুলতে পারছিনে, দুটো সি. আই. ডি. চোখ সর্বদা নজর রাখছে আমার গতিবিধির ওপর—

গম্ভীর হল যেন মনোরমা। বলল: না, ভুলে গেছেন। ইচ্ছা করে এই জন্যেই কি বাইরে চাকরী নিয়েছেন? আমি ভাবলুম, অপিসে না থেকে ভালোই হয়েছে। কিন্তু এ যে—

কথাটা শেষ করতে পারল না মনোরমা। আগের চেয়ে দ্রুত পড়তে লাগল নিঃশ্বাস।

সত্যি, বুঝতে পারি নি। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম মুখে।

ঃ কি বলছ, খুলে বলো মনোরমা—

মনোরমা বলল ঃ কথাটা এমন-ই, আর আপনি ভালোই জানেন যে—আমার মুখ দিয়ে বেরোন সম্ভব নয়। নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন, জানতে পাবেন।

ভান নয়, সত্যি অবাক হয়ে আছি। বললুম ঃ একটু হিন্টস অন্তত। এমন কি কথা, যে উচ্চারণ করাই যায় না।

বেশ ফুঁসছিল মনোরমা। ভিতরে কতোটা জানি না, বাইরে বেশ খানিকটা।

বলল ঃ একদিন বলেছিলাম, আপনার 'বস' ভালো লোক বলেই আমার ভয়।

ঃ তা তো বলেছিলে। তার সঙ্গে বাইরে চাকরীর কি সম্পর্ক। আবার এই দুটোর সঙ্গে মুখে আনা যায় না, এমন কথারও যোগ আছে। সব যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে—

ঃ দেওগাঁও-এ আপনার সত্যি কাজ থাকে, না, এমনি এমনি জীপে করে বেড়াতে যান? ওদিকে কি কাজ থাকতে পারে আপনার? ওখানে তো একস্‌ক্যাভেশান চলছে সিম্পলি। প্রত্নতাত্ত্বিক নন আপনি, আপনি ইঞ্জিনিআর—

ঃ আমি তো ওদিকে দু-একদিন গেছি মাত্র। তার খবর এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে? কিন্তু সেখানে গিয়ে অন্যায় কাজ করেছি মনে হচ্ছে।

বলতে বলতেই বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল বেহুলার কথা। আর লম্বা একটা টান জুড়ে বললাম—

ঃ ও—! বুঝেছি এবার। এই কথা—

বলে হাসি থামাতে পারলাম না, চেষ্টাও করলাম না তার। হাসতে লাগলাম।

ধমকের সুর লাগালো কথায়। মনোরমা বলল ঃ হেসে সব কিছু উড়িয়ে দেওয়া যায় না, মিস্টার রয়।

আমি হাসি থামালাম ব্রেক কষে। ঃ তার প্রয়োজনও নেই, মিস চৌধুরী!

ক্রমশঃই বিরক্তির উদ্রেক হচ্ছিল। আমার চলাফেরার ওপর এমন গার্জেনগিরি সহ্য হচ্ছিল না আর। কি দরকার আমার ওপর এমন খবরদারির—তাও বুঝতে পারছিলাম না। মিস মজুমদার ভালো লোক নয়, এই অযাচিত ইঙ্গিতেরও প্রযোজন নেই তো! আমার গাড়ীতে করে বেহুলাকে নিয়ে গেলাম কিনা, সে খবরে মনোরমার উত্তেজনার কারণ! তাও বুঝছিলাম না।

তবে এই পটভূমিতে মনোরমার মনের একটা দিগন্ত আলোয় উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল মনে হচ্ছিল। অপিসে কাজ করি না। অর্থাৎ মিস মজুমদার একটি উদ্‌ভিন্ন যৌবনা মেয়ে। তার কাছ থেকে দূরে থাকি—এতে খুশী হযেছিল মনোরমার ঈর্ষা। আবার মিস মজুমদারের কোয়ার্টারে যাই, এই জন্যে রাগ আর অভিমান কম ছিল না মনোরমার। অপিস ছেড়ে বাড়ীতে দেখা করা আবার! মজুমদারকে একেবারে বাদ দিলে কি হয়!

এর ওপর যোগ হল বেহুলার ঘটনা, বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতন। তাতেই এতো বিচলিত করেছে মনোরমাকে।

মনোবমা অতিমাত্রায় সুন্দরী। বাঙালিনীদের মতন একটুও নয় সেই সৌন্দয। সে সৌন্দর্য স্ফুরন্ত ধারা। চোখ কটা না হলে, চুল সোনালী না হলে অতি উঁচুস্তরের বাঙালী সুন্দরী হত সে। উজ্জ্বল তার রং, চোখ ঠিকরে আসে। তাকিযে থাকা যায় না।

মনোরমা পরিবর্তী প্রবাহ—অলটারনেটিং কারেন্ট। টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। শিরা উপশিরার রক্তধারার মধ্যে দিযে সেই প্রবাহ হার্টে হাতুড়ি প্রহার করতে থাকে। দিক পরিবর্তন করে সেকেণ্ডে পঞ্চাশবার।—তার রূপ আমায টানে, তার ব্যবহার দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয।

আমার কাছে মনোরমা ভয়ংকর ভালো-লাগা। দুষ্প্রাপ্য দূরে বসে কেবলই আকর্ষণ করছে।

কিন্তু কেন? আমি সামান্য য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিআর। আমার ভালো মন্দে, মনোরমার যাবে আসবে কেন?

আর দু-একটা কথাবার্তা বলে চলে এসেছিলাম। আমার গতিবিধি চালচলনের কোন কৈফিয়ৎই কারোকে আমি দেবো না। মনোরমাকে তো নয়ই—

আমার মনের মাধবীলতাটি আশ্রয় খুঁজছিল আকাশে। তার আকর্ষটি কোন সহকার শাখার অবলম্বন খুঁজছিল মনে হয়। সেটা ছিল বয়সের ধর্ম। আর অস্বাভাবিক না হলেও স্বীকার করতে নিজের মনেই প্রচ্ছন্ন লজ্জাবোধ ছিল বোধ হয়। আত্মানুসন্ধানের বয়স বা সময় নয় সেটা। নিজের মনে ডুবুরী নামিয়েও সে সময়ে ও-কথাটি আবিষ্কার করতে পারতাম কিনা—জানি না।

বিদ্যুতের পরিভাষায় পরা অর্থে পজিটিভ, অপরা অর্থে নেগেটিভ। পরা আর অপরা আকর্ষণ করে পরস্পরকে। আবার পরা পরাকে, আর অপরা অপরাকে বিকর্ষণ করে, ঠেলে দেয়।

মিস মজুমদার শরীর থেকে স্ত্রীচিহ্নগুলি তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন। পারলে ফেলতেনও। তেমন চেষ্টা না করলেও ডাক্তারী পরামর্শ নিয়েছিলেন। আর বেশী এগোতে পারেন নি। পরামর্শের ফল ফলে নি ভালো, নিরুৎসাহ হয়ে এসেছেন। বিফল হওয়াটা কথা নয়, তার মনের এই ভাবটাই আসল। তার মনের ইচ্ছা দেহে রূপান্তরের। তিনি মনে করতেন স্ত্রীজন্মটা নিরর্থক, ভারবাহী পশুজন্মের সামিল। ভগবান আছেন কি না জানতেন না, নেই বলেই ধারণা ছিল তাঁর। না থাকলেও না-দেখা কোন শক্তি আছে, যার অবিচারের ফল—এই তাঁর স্ত্রীজন্ম। তাঁর মনে নিরবধি বাস করত একটি পুরুষ। পুরুষজন্মকে তিনি ভালোবাসতেন তার অকাট্য প্রমাণ, পুরুষজন্মকে ঈর্ষা।

সে ঈর্ষা চরিতার্থ করবার আর কিছু না পেয়ে তিনি শোধ তুলতে লাগলেন জামায় কাপড়ে চুলে। চুলের ওপর এমন শোধ তুললেন যে, আয়না বর্জন করতে হল প্রায় মাসাবধি। আবার একটু বড়ো হয় চুল, তবে ভরসা পান আয়নার মাধ্যমে নিজের মুখোমুখি হবার। চিবুক আর গালের যে মসৃনতাহীনতা পুরুষকে পৌরুষ দেয়, তা পাবেন কোথায়? চুল ছেঁটে ফেলাটা তাঁর নির্দেশ আর ক্ষৌরকারের সে নির্দেশ পালনের ওপরই একমাত্র নির্ভরশীল। তাই বলে তাঁর চিবুক কথাও শোনে না, কণ্টকিতও হয় না।

সৃষ্টিকর্তার এই অবিচারের প্রতিবাদের চেহারাটা এই রকম দাঁড়ালো।

দশ বারো বছর পর্যন্ত অন্তরঙ্গরা ছাড়া কেউ টের পেলো না অন্তর আর অঙ্গের খবর। তার পরের চার পাঁচ বছর কাটলো, যারাই সংস্পর্শে আসে তাদের চোখে অবাক হবার ভাষা পড়ে। তাদের চোখে প্রতিফলিত দেখতে পেতেন শীলা—শীলার মুখের সৌকুমার্যের অতিরিক্ততার দরুণ দারুণ বিস্ময়। তারপর কলেজের দিনগুলিতে আর সে সব নয়। তখন নিশ্চিত জেনেছেন শীলা, এ যাত্রাটা এমনি ব্যর্থতার মধ্যে দিয়েই কাটলো। পরে অবশ্যই বিলেত থাকা-কালীন ডাক্তারী পরামর্শ নিয়েছিলেন একবার। সার্জারীর ইরেজারের সাহায্যে চিহ্নগুলি উঠিয়ে ফেলা যায় কি না। সুবিধে হয় নি।

দেহেই যা নয়! মনে প্রাণে পুরুষই নন শুধু শীলা, বিশ্বাসীও পুরুষকারে। মেয়ের মতো মিনমিনেপনা—কোথাও ছিল না তাঁর চরিত্রে! ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে ভিক্ষা যাচা—কোথাও ছিল না স্বভাবে। কি তফাৎ মানুষে মানুষে! মানুষের আগে স্ত্রী আর পুরুষ, এই কথা দুটি বিশেষণ মাত্র। যেমন ভালো মানুষ, দুর্বল মানুষ। আসলে, কোন তফাৎই নেই। পুরুষকার থাকলে পৌরুষও আয়ত্তে আসে। আর, কাজের মধ্যে বেছে বেছে ভালো আর কৃতিত্বের কাজ নিজেদের জন্যে সংরক্ষিত রাখা—পুরুষের স্বার্থ-বুদ্ধির উলঙ্গ পরিচয় ছাড়া কিছুই নয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিআর, উকীল, ব্যারিষ্টার, পোলিটিশান—

এই বিশ্বাসের পাল উড়িয়ে নিজের মধ্যে কম নির্ভর পায় নি শীলা। মাঝ দরিয়ায় পৌছল বৈ কি। বলিষ্ঠ পুরুষালী মন, হাতে পায়ে নরমের লেশও নেই, মেয়ে হয়েও শীলা ইঞ্জিনিআর হলো।

সেই মদ্দা মেয়েকে আর যাই করি, অপরাশক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায় না! তার বিষয়ে মনে এই ভাব আনাও কঠিন। সে পুরোপুরি পরা শক্তি—পজিটিভ। আমাতে তাতে বিকর্ষণের সম্পর্ক, আকর্ষণের নয়।

কাজেই এ যে তার আকর্ষণ নয়, এ কথা জোর করে আজো বলতে পারি।

সেণ্ট্রাল ওআর্কশপে ফিরে গেলাম, বাইরে প্রচুর বর্ষা নেমেছে বলে। জীপের পক্ষে পথ দুর্গম। বিহারী বর্ষা—নামে তো একাদিক্রমে এগারো দিন থামার নাম নেই। বেশী সময়ই প্রবল বেগে আর তোড়ে। মাঝে মাঝে ছিপ ছিপ ফিসফিসও নেই তা নয়। কিন্তু একেবারে শ্রান্তিক্লান্তিহীন, অবিরাম।

বর্ষাতি গায়ে চপিয়ে অপিসে যেতে পারাটাই সমস্যা। জামা কাপড়

শুকনো পরবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না। আমাদের হয়তো হয়, তার জন্য মেহনত করতে হয় যথেষ্ট। পয়সা শ্রম বুদ্ধি খরচ করতে হয় প্রচুর।

আগের রাত থেকে বৃষ্টি নামল। তখন আমি 'ছিলাম মগন গহন ঘুমের ঘোরে' যখন বৃষ্টি নামল। নামবার আগেকার তোড়জোড়ে অটুট ছিল আমার ঘুম, জলধারার কলস্বরেও টোটে নি। কিন্তু সজল হাওয়া যখন তাড়িয়ে নিয়ে এলো বারিবিন্দু, শীকর এসে অনধিকার প্রবেশ করল জানালার গরাদে টপকে, ঘুম আর না-ভাঙা থাকে কি করে।

পরের দিন থামে নি বৃষ্টি। থামবার নাম করে নি, লক্ষণও দেখা যায় নি তার।

মেসের ঠাকুর-কাম-চাকর শ্রীহরি ভরসা। শ্রীহরি বাঙালী। লাগসই চাকরী খুঁজছে একটা, বাংলা থেকে এসে। ঠিকে কাজ করছে এখন—পাকা চাকরী চায় আমার কাছে। সেই আশাতেই বিদেশে পড়ে আছে। নইলে নাগাদ তার হাতে ভোজন সমাপন করে আকাশে তাকাচ্ছি অসহায়ের মতো।

গ্যারাজ থেকে জীপ বের করবার উদ্যোগ করতে যেতেই শ্রীহরি বললে: এ কী জল—ওরে সব্বোনাশ। বেরোবেন কি করে? নাই বা বেরোলেন আজ।

নিঃশব্দে হেসে উত্তর দিলাম ওর কথার।

বর্ষাতির ভেতর বুকের কাছে আর এক সেট শুকনো জামা কাপড় বগল দাবা করে গ্যারাজে গেলাম। জীপেও ষ্টার্ট দিলাম।

সবার প্রথমেই কিন্তু মনে পড়ল শীলার কথা। অপিসে যাবে কি করে? আমিই বা আউটডোর ডিউটি কি করে করব আজ? বাইরের কাজ আজ কিছুই হবার নয়।

মিস মজুমদারের দরজায় গিয়ে হর্ণ দিতেই জানলা খুলে গেল। খোলা জানলায় মুখ উঁকি দিল মিস মজুমদারের। তার চোখে জিজ্ঞাসা নীরব হলেও, আমার যাবার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট।

বললাম: তৈরী তো! না, দেরী আছে?

শীলা বলল: ওআন মিনিট, রয়।

ম্যাকিনটোশে ভারী গামবুটে শীলাকে আর চেনবার উপায় নেই। পুরো পুরুষ।

পাশের সীটে এসে বসল শীলা। একবারের মতন ব্রিলিয়ানটিনের মিষ্টি আর তীব্র গন্ধ নাকে এসে লাগল। আরেক বারের মতন মনে হল—শীলা মেয়ে। তারপর সে সুগন্ধ হারিয়ে গেল বাদলা হাওয়ায়।

সুরু করল শীলাই : আজ আর বাইরে বাইরে কি কাজ করবে রয় ?

হাতে ষ্টিআরিং, মনোযোগ গাড়ী চালানোয। বললুম : তাই তো ভাবছি—

: এই বর্ষার কটা মাস অপিসেই থাকবে চলো। অনেক কাজ জমেছে—

বললুম : বলো নি তো কখনো। অপিসে রোজই তো যাই দু-একবার, বললেই হোতো—

কেমন মেয়েলী রহস্যময়তা শীলার বাঁকা ঠোঁটের হাসিতে। শীলার পক্ষে অসাধারণ।

: বলি নি, তুমি বাইরের কাজ কর্ম নিয়ে মেতে আছো। জীপ নিয়ে মেতে আছো। জীপ নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াও বাইরে—তোমায় বলি কখন ?

অপিসে পৌঁছে দুজনেরই প্রয়োজন য্যান্টিরুমে যাবার। পায়ের কাছে পরিধেয়—দুজনেরই ভিজে জবজবে। আশু বদলানো দরকার।

শীলাকে বললুম : লেডিজ ফাষ্ট—

মুচকি হেসে পুঁটলিটি নিয়ে পাশের ঘরে গেল শীলা। ফিরল যখন, দেখি—সত্যি চেঞ্জড। আমূল পরিবর্তন হয়েছে তার। সর্বদার ট্রাউজার স্ল্যাকসের মুখোশ নেই আর। ফিরে গিয়েছে শীলা নিজের স্বরাজ্যে।

ফ্রক পরে এসেছে পাশের ঘর থেকে। বাড়ীতেও যা দেখি নি কখনো !

মুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিলুম হয়তো। অনেকক্ষণ। চমক ভাঙল শীলার সহাস্য মন্তব্যে : কি দেখছো রয। যাও, জামা কাপড় বদলে এসো। শীতে ধরবে যে।

ছোট্ট য়্যান্টিরুমখানা। শীলা তৈরী করিয়ে নিয়েছে। আমার আমলে অস্তিত্ব প্রয়োজন কোনটাই ছিল না।

একটা টেবিল। ছোট্ট দুখানা আর্মলেস চেয়ার। ঘরের কোণে ঈজি চেয়ার একখানা। দেয়ালে ছোট্ট ব্র্যাকেটে মাঝারি সাইজের আয়না। চিরুণী। এক কৌটো ঈয়ার্ড্লি ল্যাভেণ্ডার পাউডার। ওয়াশ বেসিন। আর বাকিটা নিরাসবাব।

টেবিলে জামাকাপড় পড়ে আছে শীলার। মুহূর্তে বিজয়িনী মনে পড়ে গেল আমার।

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন লুটাইছে একপ্রান্তে স্খলিত গৌরব অনাদৃত, শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ এখনো জড়িত তাহে—

একবার ইচ্ছে হল, ঘ্রাণ নিই সুনীল বসনের। শ্রীঅঙ্গের উত্তাপও আছে, আছে হয়তো—সৌরভও।

ট্রাউজার শার্ট বদলানো হলে ঘর ছেড়ে আসার আগে দেখলাম—দুজনের ভিজে জামাকাপড় জড়াজড়ি পড়ে আছে। দুটোই ট্রাউজার। একটা ট্রাউজার একটা শাড়ী নয়। দুটোই পরাশক্তি—কাছাকাছি এসে যাদের বিকর্ষণ হয়, আকর্ষণ নয়।

মেয়েরা এক নজরেই পুরুষের মন পড়ে নিতে পারে, নির্ভুলভাবে। কথাটা জানা ছিল। এ বৃত্তি তাদের সহজ।

আমার চোখের আয়নায় মন ছায়া ফেলেছিল কি না জানি না। অপিস ঘরে ফিরে আসতেই শীলা বলল : বোসো রয়। একটা কথা বলব, রাগ করতে পারবে না—

সামনের চেয়ারে বসলাম। শীলার গলার আওয়াজে তারল্য ছিল না। বললাম : বলো—রাগ করতে তো নিষেধই করলে তুমি। রাগের কথা হলেও রাগ করব না।

এর পর শীলা যা বলল, খুব প্রস্তুত ছিলাম না সে কথা শুনতে। শীলার মুখে আশা করি নি অন্ততঃ।

শীলা বলল : তোমার গতিক-সতিক ভালো নয় রয়।

: কেন বলো তো। কি হোলো?

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকালো শীলা : প্রেমে পড়েছ তুমি। বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও তাই—

শীলার মুখের ভাব কঠিন, ভর্ৎসনা-উদ্যত। জেনেও মুখে হাসি ফোটালাম। আস্তে আস্তে বললাম : ঠিক জানি না, হয়তো হবে। হয়ে থাকলে কার্যটা কি অন্যায়।

: ন্যায় অন্যায় জানি না। কাজটা মামুলী। কাজটা বিলাসিতা। অকর্মণ্য অলসদের কাজ। বড়ো লোকের ছেলেদের কাজ। যাদের আর কোনো কাজ নেই, তাদের কাজ। তাদেরি সাজে, তোমার নয়!

আমি চিন্তা না করেই বললুম : ওপিনিয়নস ডিফার—

শীলা হেসে ফেলল কেন জানি না। বলল : কার প্রেমে পড়েছ বলো তো। বলবে? আপত্তি নেই তো।

এতো পরিহাস তরল শীলাকে দেখি নি কোনদিন।

নিভৃত নির্জন চারিধার। আকাশে অনিবার জল ঝরছে। দুজনে মুখোমুখিও বটে—গভীর দুঃখে দুঃখী হয়তো নয়। বৃষ্টির আওয়াজে কারখানার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না আর। শুধু একটানা ঝরঝরানি। পরিবেশটি মন নরম করার। শীলার আলোচ্য বিষয়টিও তাই।

চট করে উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। চুপ করে ছিলাম তাই।

শীলা হয়তো বুঝল, সরাসরি উত্তর দেবার উপায় নেই আমার। প্রতিপ্রশ্ন করল: বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও কেন রয়! তোমার মনে কি কোন অভিমান আছে?

এ কথার জবাব প্রস্তুত ছিল আমার। : অন্দরে জায়গা পাই না বলে বাইরে বাইরে বেড়াতে হয়!

শীলা জিজ্ঞেস করল: অন্দরে না অন্তরে—কি বললে? ভালো করে বলো।

বললুম: দুই-ই—

রহস্যময়ী নারী কণ্ঠে তরল ছলছলানি।

: কার?

: যাকে ভালোবাসি তার! যার প্রেমে পড়েছি তার!

: কায়দা করে নামটা তো বললে না। আকারে ইঙ্গিতে বলবে?—আচ্ছা, আগে বলো, আমি তাকে চিনি?

সাহস আসছে আস্তে আস্তে। পরিবেশটাই ভালো লাগার, ভালো লাগার কথা বলবার। দেয়ালে দেয়ালে ইলেকট্রিক পরিবেশনের মানচিত্র। বাইরে বিদ্যুৎ। ঘরের মধ্যে কার যেন মনের বিদ্যুৎ চমকে ফিরছে। ঝিলিক হানছে চোখে।

লম্বা টানে শেষ করে ছোট্ট একটি এক অক্ষরের কথা বললাম: হ্যাঁ।

: অর্থাৎ—

গম্ভীর হল না শীলা। তেমনি পরিহাস তরল তার কণ্ঠ। মনের অভিনিবেশে; আবার অন্যমনা যখন—এই দুই বিপরীত মনের অবস্থায়ই আঙুর দোলানো অলকগুচ্ছ আঙুল দিয়ে পাক মারতে থাকে শীলা। বাইরে জলধারার কলস্বর।

শীলা পেড়াপীড়ি করতে লাগল: কেমন দেখতে বলো না একটু শুনি!

: ছোট ছোট চুল—

আরো অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। না শুনেই বাধা দিয়ে উঠল শীলা। তার চোখে বিদ্যুৎ নেই, বজ্রদহন। মুখ কঠিন, চোয়াল দৃঢ়, নাকের পাটা ঈষৎ ফুলছে। এ কি অদ্ভুত অভাবনীয় পরিবর্তন! আমাকে অতো পেড়াপীড়ি করে জিজ্ঞেস করাই বা কেন, এখন ক্রোধই বা কেন অকারণ!

শীলা বলল: প্রেম প্রেম আর প্রেম। তোমরা পুরুষেরা কি বলো তো? দুদণ্ড কাছে বসলেই মনে করো—মেয়েটাও তোমাদেরই মতো হ্যাংলা। প্রেমে পড়বার জন্য পাগল হয়ে আছে! দ্যাখো পিয়ারলেস, একথা আমার জীবনে অনেকবার শুনেছি। এও জানি—তোমরা পুরুষেরা দিনের মধ্যে কুড়িবার প্রেমে পড়ো। যে কোন যৌবনবতী মেয়ে দেখলেই হোল—ব্যস। তোমাদের ভালোবাসার জন্ম মুখে, হৃদয়ের গভীরে নয়। মেয়ের সংস্পর্শে এলে তোমরা আর কিছু ভাবতেই পারো না। কেন বলো তো।

: দ্যাখো, মিস মজুমদার, আমার কথায় সেই মেয়েটির বর্ণনা শেষ হয় নি। না হতে দিয়েই মনগড়া একটা কিছু এঁচে নিয়েছ। আর খামোকা ক্রুদ্ধ হচ্ছ। এটা তোমার অন্যায়।

: কি বলতে চেয়েছ তুমি? ছোট ছোট চুল কার? কার কথা বলছিলে?

: ছোট চুল একজনের, আর ছাঁটা চুল আর-একজনের। ধৈর্য ধরে শুনবে তো!

: ও—! আমার অন্যায় হয়ে গেছে, পিয়ারলেস। বলো—যার কথা বলছিলে।

খুব বেঁচে গেছি। চুলের দৈর্ঘ্য নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, প্রয়োজন মতো পলায়নের পথ প্রশস্ত রাখবো বলেই। পালাতেই হল। আমার তরুণ মনের নবজাত হরিৎ আকর্ষ আশ্রয় খুঁজছিল। মনোরমার সহকার প্রত্যাখ্যান করেছে তাকে। মনোরমা বড়ো খুঁৎখুঁতে, বড়ো বেশী যাচাই করতে চায়। অতোখানি বাঁধন বা শাসন—কোনটাই সহ্য হবে না আমার। মনোরমা বড়ো বেশী সুন্দরী, বড়ো বেশী বড়োলোক। কোনটাই আমার পক্ষে অনুকূল নয়। শীলা সুন্দরী নয়, কার মেয়ে কি বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। না জানলেও বুঝতে পারি দুরন্ত বড়োলোক নয় ওরা। আমার ভালো লাগায় যদি আন্তরিকতা থাকে, কেন ফিরে চাইবে না সে! সে যেই হোক! আন্তরিক কথাটা অন্তর কথাটা থেকেই জন্মায়।

এ আশ্রয়ের জন্যে হাত বাড়াতে না বাড়াতে বাতাস এলো দুরন্ত। ধুলোয় লুটোল মাধবীলতা।

নিপুণ করে মনোরমার বর্ণনা দিতে লাগলাম: ছোট ছোট চুল, বাঁকা বাঁকা। সোনার মতো রং। চোখের তারা কটা! এই তারার রং-এর সঙ্গে চোখ-এর সন্ধি করলে কটাক্ষ পাওয়া যায়। গাল দুটি আমেরিকান আপেলের মতো নিটোল। চিবুকে সুন্দর একটি টোল। গায়ের রং—বৈশাখ দুপুরের রোদ বলা যায় বরং।

গম্ভীরই নয় শুধু। ভালোলাগার পাত্রী পরিবর্তনে ঈষৎ যেন বেদনার্ত মনে হল শীলাকে। উদাস গলায় বলল: পিয়ারলেস, ঝলসে গেছ তুমি বুঝতে পারছি। আচ্ছা, অপর তরফের সাড়া পেয়েছ কিছু? না এক-তরফাই—

: 'আমার অন্তরের ধ্বনি ডাক দিয়ে ফেরে উদাস প্রান্তরে।' বাধা পায় না—কারণ, পর্বত নেই সেখানে। পর্বত নেই—শুনবেই বা কে, প্রতিধ্বনি দেবেই বা কে? না মজুমদার, খোঁজ রাখি না প্রতিধ্বনির। সাড়া পাই নি।

সত্যি কি আমি সাড়া পাই নি! না'য়ের নাড়া পাই নি, মনে। এই সেদিন মনোরমার কাছে, আজ শীলার কাছে। মনোরমার কাছে তো বার দুই হল। জেনে শুনেই মিথ্যা বললাম।

মনে আছে দূর প্রান্তর কাঁপিয়ে মেঘ ডেকে উঠল এই সময়েই। তার প্রতিধ্বনির রেশ কাছে থেকে দূরে, আরও দূরে, কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল। এক সময় মিলিয়ে হয়তো গেল, সময় লাগল ঢের।

শীলা সেইদিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল: ধ্বনি থাকলে প্রতিধ্বনি তার হবেই। শুনছো তো। ঐ শোনো। ফাঁকা মাঠেও আওয়াজের সমারোহ চলছে তার—

বললুম: ফাঁকা মাঠের আওয়াজ ফাঁকা আওয়াজই। শূন্যগর্ভ। সার নেই কিছু। আচ্ছা মজুমদার, সত্যি বিশ্বাস কর তুমি—ধ্বনি যতোবড়ো, প্রতিধ্বনিও ততো বড়োই। ছোট নয় তার চেয়ে, কম নয়!

শীলা বলল: বিজ্ঞানের বিধান অমান্য করি কি করে? এভরি য়্যাকশান হ্যাজ ইটস ওওন য়্যাণ্ড ইকোআল রিঅ্যাকশান। সেটা ওওন তো বটেই ইকোআলও।

বললুম: বায়োলজি বা প্রাণীতত্ত্বে, ফিজিকসের ও-আইন অচল।

শীলা বলল : ফিজিক এক অর্থে শারীরিক গঠন। ফিজিকসের চেয়ে দূর নয় খুব। ওই এক আইনই চলবে—

: ধরো আমি হাত বাড়ালুম! এমন জায়গায়, যে মনে করে সে অনেক বড়ো, অনেক উঁচুতে। আমি হাত বাড়িয়েই রইলুম। বেদনায় টন টন করতে লাগল হাত, অবশ হয়ে এলো। পেলুম না কিছুই।

: অবশ হয়ে গেলে চলবে কেন? তা হলে হাতটা তো ঝুলে পড়বে। উদ্বাহু থাকলো কই? অবশ না হয়ে রাখতে হবে স্ববশে। ক্লান্তি আসুক, দুর্যোগ দুর্বিপাক আসুক। আমার চাওয়া থেকে বিচ্যুত হবো না আমি। এই যদি করতে পারো ধনুক-ভাঙা পণ, দেখি—নেমে আসে কিনা চাঁদের হাত—তোমার হাত ধরতে। ভালোবাসা পরশ পাথর। সোনা করে দেয় কামনার কালো লোহাকেও। সেই পরশ পাথর সারাজীবন খুঁজেও পায় না কেউ। কেন জানো? 'কেবল অভ্যাস মতো নুড়ি কুড়াইত যতো ঠন করি ঠেকাইত শিকলের পর। চেয়ে দেখিত না নুড়ি দূরে ফেলি দিত ছুঁড়ি, কখন ফেলেছে ছুঁড়ি পরশ পাথর!' পরশ পাথর খুঁজে ফিরতে হয়। কখন একবার চকিতে পাওয়া যায় তাকে। পাওয়ার সেই পরম ক্ষণটিকে শাশ্বত করতে পারে ক'জন। খুঁজতে খুঁজতে খোঁজাই দাঁড়িয়ে যায় অভ্যাসে। কি খুঁজছি সেটির চেহারা মনের চিন্তা থেকে সরে দাঁড়ায়। বিবাহ মানে পরশ পাথর খোঁজার অভ্যাস। পরশ পাথর খোঁজা নয়। প্রত্যহের দৈনন্দিনতায় আসল জিনিষটি যখন গেছে হারিয়ে। ভালো লাগা মানে কি? না-পাওয়ার মধুর বেদনা। পেলে তো পাওয়া হয়েই গেল। তামাম শোধ। ভালোবাসার ভালো গেল প্রাত্যহিকতায় ডুবে, বাসা গেল কবরে। ভালোবাসারও তামাম শোধ। যতোক্ষণ না পাচ্ছ ভালো লাগা ততোক্ষণই! ভালোলাগা মানে আনন্দ নয়, বেদনাই।—দ্যাখো, কতো বড়ো লেকচার দিয়ে ফেললুম ভালোবাসার ওপরে!

সত্যি অবাক ও অভিভূত, দুইই হয়েছিলুম। শীলা এতোও জানে। এতোও ভেবেছে এই মদ্দা মেয়ে! বললুম : তন্ময় হয়ে শুনছিলুম। তনু দিয়ে শুনছিলুম, শুনছিলুম মন দিয়ে। অবাক হয়ে গিয়েছি—এতোও ভেবেছো তুমি! তোমার মধ্যে এতো ভাবনাও আছে।

: না ভেবে উপায় আছে : শীলা বলল হাসতে হাসতে। : তোমরাই ভাবিয়ে তোলো যে!

হঠাৎ বলে-ফেলার হঠকারিতায় নিজেই লজ্জিত হোল বোধ হয়। শোধরাতে গিয়ে লজ্জার জালে আরো জড়িয়ে পড়ল যেন। বলল ঃ মানে—মানে আর কি—মননশীলতার ত্রুটি থাকবে কেন? ভেবে দেখতে হবে সবই। বুঝলে না!

মনে মনে হেসে ফেললুম। বললুম : বুঝেছি সব, বুঝেছি বৈ কি!

ভালোবাসা সম্বন্ধে আজ নিয়ে হ'তো রকমের কথা শুনলুম শীলার মুখে। ভেবে দেখার সবগুলোই, ফেলবার নয় কোনটাই। কোনটাই উপেক্ষার নয়। মনে লাগুক আর নাই লাগুক।

আমি শুধু ভাবছিলাম—শীলা এতোও ভেবেছে! শীলার মনও কি তা হলে অন্য সবার মতো কাদা মাটিতে গড়া, সবটাই পাথরে তৈরী নয়!

মনোরমার এই কঠিন ব্যারামে অবশ্যই আমার যাওয়া উচিত। এই কথা ভাবতেই কয়েকটা দিন কেটে গেল। এ পাড়ার ধন্বন্তরী রাজবৈদ্য দিগ্বিজয় ঘোষ। দৌড়চ্ছে প্রহরে প্রহরে। ব্যাগ নিয়ে, ব্যাগ না নিয়ে। বিনয়ব্রত দৌড়চ্ছে অনবরত—বিব্রত হয়েই। আনছে ওষুধপত্তর শহর থেকে, আনছে পথ্য পাঁচন।

যাবো, যাওয়া উচিত সন্দেহ নেই এতে। সন্দেহ ছিলও না, ছিল উৎসাহের অভাব। এই কথা ভাবতে ভাবতে একদিন বনোয়ারী এসে হাজির হল।—দিদিমণি বলছিলেন, আপনার যদি সুবিধে হয়, একবার যেতে পারবেন কি?

বললুমঃ হ্যাঁ বনোয়ারী, আজই যাচ্ছিলাম। এতোদিন যাওয়া উচিত ছিল। যাওয়া হয় নি—অন্যায়ই হয়ে গেছে কাজটা! তুমি দিদিমণিকে গিয়ে বলো, আমি আসছি!

মাথার কাছে বসে বিব্রত, খাটে ডাক্তার। দেয়ালগিরির আলো মাথার ওপরের দেয়ালে। রোগিণীর চোখে না লাগে। কথাবার্তা বলছে রোগিণী। খুব অসুস্থ মনে হোলো না। হয়তো এর চেয়ে গুরুতর হয়েছিল, আগের চেয়ে সুস্থ আছে এখন।

বনোয়ারীর সাথে ঘরে ঢুকতেই একটু নড়ে চড়ে শুলো। বালিশের ওপর দিয়ে দুটো বিনুনীও নড়ে চড়ে জায়গা বদল করল একটু।

খাটের পাশে চেয়ারে বসলাম।

মনোরমা ডাক্তারবাবুকে উদ্দেশ করে বলল : ঐ কথাই রইল তাহলে! অতো ভাবেন কেন? আমি তো ভালোই আছি। বেলায় বেলায় আসতে হবে না আর।

দিগ্বিজয় ঘোষ বলল : আমার যা করবার বলে আমি মনে করবো, সেটা আমি করবোই। যদি বুঝি ঘণ্টায় ঘণ্টায় আসা দরকার আমার, আমি তাই আসবো। আপনার মানা শুনবো না। আপনি রুগী—পেশেণ্ট! ইমপেশেণ্ট হওয়া উচিত নয় আপনার—

হাসল একটু মনোরমা। বলল : আমি ভালো আছি কি নেই, সেটাও কি আপনি বলে দেবেন? রুগী বলে কি সেটুকু স্বাধীনতাও থাকতে নেই?

দিগ্বিজয় ঘোষ বলল : যদি ডাক্তার বদলাতে চান, আপত্তি করবার কথা নয় আমার। কিন্তু আমি যতোদিন আপনাকে দেখছি, আমার কর্তব্য-বুদ্ধিটা আমারই থাকতে দিন, মিস চৌধুরী। এতে আপত্তি করবেন না, এই আমার সবিনয় নিবেদন।

তাতেও মনোরমা দমল বলে মনে হল না : ব্যারাম পীড়া দেখা দিয়েছে শহরে। আরো রুগী আছে তো আপনার। রোগ আরো কঠিন, পয়সা কড়ি তেমন নেই। তারাও তো আপনারই রুগী।

ডাক্তার তার ব্যাগ গুছোতে গুছোতে উঠে দাঁড়াল। বলল : তাঁরাও আমারই রুগী। আচ্ছা, আমি চললাম।—তবে আমার প্রয়োজন মতো আমি আসবো-ই!

এইখানে ডাক্তারের কথা কিছু বলা দরকার। টাটকা এম্. বি.। বাঁধা মাইনের লোভে ছিট্‌কে এসে পড়েছে বিহারের এই শহরে। চেহারা মন্দ নয়। মাঝারি গায়ের রং। মাঝামাঝি দৈর্ঘ্য। অকৃতদার। এই দেড়-দু বছরে শতংমারী হতে পারে নি—তাই বৈদ্য হয়ে ওঠে নি এখনও।

ডাক্তারের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল মনোরমা। আবার ক্ষীণ হাসি দেখলাম মনোরমার ঠোঁটে।

কি মনে করে জানি না হাতের পাখা রেখে উঠে পড়ল বিব্রতও। তারই সামনে বনোয়ারীকে পাঠিয়েছে মনোরমা—আমাকে ডাকতে! আমি যখন এসে পড়েছি, তার আর থাকা উচিত নয়! ঔচিত্যবোধই বিব্রতকে উঠিয়ে নিয়ে গেল।

যাবার আগে বিব্রত বলল : চলি মিস চৌধুরী। দরকার মনে করলে—খবর পাই যেন।

কথা বলল না মনোরমা। নিঃশব্দে তারও চলে যাওয়ার পথে দৃষ্টি মেলে রাখল মাত্র।

আর এক দফা অপমান হবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আমার দিকে মনোযোগ দিল এবার মনোরমা। হয়তো মনও।

গালের তলায় হাত রেখে পাশ ফিরে শুলো। বলল : রাগ করেছেন খুবই, বুঝতে পারছি। কি করি বলুন তো! টানাটানি করতে গিয়ে ছিঁড়ে যেতে পারে—এইটে খেয়াল থাকে না।

আক্রমণের নতুন পথটার কথা চিন্তা করছিলাম। উত্তর দিতে পারি নি। অসুস্থ লোক—যা বলে বলুক, যা অপমান করে করুক। আজ আর কিছু বলব না। একদিন আশ্রয় দিয়েছিল, উপকার করেছিল—এটাই বা ভুলি কেমন করে! হ্যাঁগো, 'এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে', মনে হয়েছিল প্রথম দিন। সেদিন সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয়েছিল—'এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী'। তাই বা অস্বীকার করি কি করে!

মনোরমা বলল : যাচ্ঞা কথাটার মানে প্রার্থনা। যাচাই করা মানে বোধ হয় খোঁজ খবর নিয়ে মূল্য নিরূপণ করা। করব যাচনা—করে ফেলি যাচাই। দুটো কি একই মৌলিক শব্দ থেকে এসেছে!

উত্তর দেবার মতো খুঁজে পেলাম কিছু মনে হচ্ছে। বললাম : যৌগিক মৌলিকের খবর ছেড়ে দিন। বুৎপন্ন নই উৎপত্তি যাচাইয়ে। এতো কথা মনে উদয় হচ্ছে কেন বলুন তো।

ম্লান হাসল মনোরমা। শুক্লা দ্বিতীয়ার জ্যোছনার মতো যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি ক্ষীণ সে হাসি। জানালার বাইরে পাঠিয়ে দিল উদাস দৃষ্টি। তারপর ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ফিরে এলো যেন নিজেও। বেশ খানিকক্ষণ কাটল নিঃশব্দে। থমথম করতে লাগল ঘরের হাওয়া—বাঙ্ময় মৌনতায়।

আবার আমার মুখে চোখ রাখল। বলতে লাগল : না, ও কিছু নয়! আচ্ছা, ডেকে না পাঠালে আসতেন না নিশ্চয়!

আমতা আমতা করার পালা এবার আমার। : না মানে, আপনার অসুখের খবর পেলাম এই তো সেদিন। সেই থেকেই আসব আসব করছি! এসে উঠতে পারি নি আর।

খুব মৃদু ভৎর্সনার সুর বাজলো মনোরমার গলায়। ঃথাক মিষ্টার রয়, অকারণ মিথ্যার বোঝা বাড়িয়ে কি লাভ! ডেকে না পাঠালেও যদি আসতেন তা হলেই আপনার দাম যেতো কমে। মনে মনে আপনাকে হ্যাংলাই ভাবতুম, মুখে না বললেও। তা আসবেন কেন? আত্মসম্মান জ্ঞান নেই আপনার! না ডাকতে আসেন নি, খুশী হয়েছি আমি!

শাঁখের করাত শুনেছি আসতেও কাটে, যেতেও কাটে। হাঁ-করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কাজ পেলাম না আর।

মনোরমা বলল ঃ সময় আছে একটু, না কাজ আছে হাতে! মনটা পালাই পালাই করছে নাকি? তাহলে ধরে রাখবো না।

মনের ভাবটা তখন, উঠতে পারলে বাঁচি! মনোরমার কাছে ধরা পড়ে যাওয়াতে অবশ্যই বলতে হল ঃ না, না কাজ আর কি! বলুন না—কি বলবেন!

একটু সময় নিল মনোরমা। গলার আওয়াজ ধরে এলো যেন। বলতে লাগল ঃ আমার বাবাকে দেখেছেন তো—কেমন কর্মবীর! সেলফ-মেড ম্যান। নিজের অধ্যবসায়ে এতো বড়ো হয়েছেন। বিলেত গিয়েছেন নিজের চেষ্টায়, নিজের খরচে। এখানে বসে করসপণ্ডেন্স করে চাকরী জুটিয়েছিলেন বিলেতে। চাকরী করতে করতে পড়েছেন। পাশ করেছেন। বিলিতি ডিগ্রী নিয়েছেন। দেশে ফিরে এসে গোলামী করেন নি। নিজের ইনডিপেণ্ডেণ্ট প্রতিষ্ঠান খুলেছেন কনট্রাকটরীর। সারা ভারতে গঠনমূলক কাজে যেখানে যেখানে পেরেছেন সি-সি-কো—কে কাজে ভিড়িয়েছেন। দৌড়চ্ছেন দেশ-বিদেশে। বাইরে যাঁর এতোখানি প্রতিষ্ঠা এতো প্রতাপ, তাঁর মনটা কিন্তু মরুভূমি। অনেকেই জানেন না সেকথা। আপনি তো আমাদের বাড়ীতে কাটিয়ে গেছেন—বেশী না হলেও কয়েকটা দিন। টের পেয়েছেন আপনি?

কি বলছে মনোরমা? যাচাই করে নেওয়া, বাবার মন মরুভূমি—সংযোগ কোথায় এ সবের! বললাম ঃ না তো! মনের খবর জানব কি করে? কেউ কি কারো হৃদয় গহণে ডুব দিতে পারে? আমি তো বাইরের লোক! অতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ অমন কর্মবীরের মনও যদি মরুভূমি হয়ে থাকে—সে তো দুঃখের বিষয়ই!

মনোরমা বলল ঃ আচ্ছা আমার মা আছেন কি না, এ জানার কৌতূহল আপনার হয় নি কোনদিন?

এ বিষয়ে যা জানতাম, ঠিক জানা নয় তা। জ্ঞানের চেয়ে মননকর্ম তাতে বেশী। বললাম : হয় নি এ কথা বললে মিথ্যে বলা হয়। হলেও বা জিজ্ঞেস করি কি করে? বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, আপনার মা বেঁচে নেই! কেন, বলি শুনুন। মা যদি বেঁচে থাকেন, অন্যত্রও থাকেন, তাঁর প্রভাবটা থাকে ঠিকই। গিরিশিখরে জন্ম হয় যে ছোট নদীটির, সে যতোদূর যায় মাতৃস্নেহও দ্রুত চরণে তারি সঙ্গে সঙ্গে যায়। মরণের মহাসমুদ্র পর্যন্ত—। আপনাদের যেন তা নেই। ঠিক যেন স্নেহ-স্নিগ্ধ নয় আপনাদের ঘর সংসার। যেন কিঞ্চিৎ শ্রীহীন, কিছুটা বা রুক্ষ নীরস। মাপ করবেন, এমনি মনে হয়েছে আমার। আমার মনে হওয়া, আমারই মনে হওয়া, তার বেশী দাম নেই তার।

নড়ে চড়ে পাশ বদলে নিলো মনোরমা। পায়ের তলা থেকে চাদরটা তুলে টেনে দিল বুক অবধি। আজ মনোরমার পরণে পাঞ্জাবী শালোয়ার।

টুং টাং আওয়াজ হচ্ছে ঘর সংসারের কাজের। হাল্কা পায়ের আওয়াজ হচ্ছে এঘরে-ওঘরে, কাছে-দূরে। আয়ীমা কোথায় গেল! আচ্ছা আয়ীমাটি কে? খুব গার্জেনগিরি করে কিন্তু মনোরমার ওপর।

অপমান হবার ভয়টা এসেছে কমে। তাই বোধহয় অতো কথা বলতে পারলাম। ভুলে গিয়ে অনেক কথাই বলে ফেলেছি। না বললেই হোতো!

বালিশের ওপর থেকে বিনুনী দুটো নিয়ে এলো সামনে। ফেলে দিল বুকের ওপর। নাড়াচাড়া করতে লাগল অন্যমনে।

মনোরমা বলল : আপনারও নজরে পড়েছে তাহলে! এড়ায় নি। আপনার জানা কিন্তু ভুল মিষ্টার রয়! আমার মা আছেন। সাধারণ আর পাঁচজনের মতন নন। ব্যক্তিত্ব আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। সব চেয়ে বেশী যে জিনিষটা আছে, সেটি—আত্মবিশ্বাস।

আবার চুপচাপ। হৃদি রত্নাগারের অগাধ জলে ডুবরী নামিয়েছে মনোরমা। স্মৃতির দীঘির তলা থেকে উঠিয়ে আনছে—মণি মুক্তো নয়, শৈবাল আর দাম। নিস্তরঙ্গ জলে দোলা লাগছে অল্প অল্প। জাগছে ছোট ছোট ঢেউ।

মনোরমা বলতে লাগল। মনে হল নিজের মনের সঙ্গেই কথা বলছে সে। আমার উপস্থিতি ভুলেই গেল যেন।

: বিবাহের মধ্যে দিয়ে মিলন হল বাবা মার। কিন্তু মিল হল না মনে। দুজনেই ব্যক্তিত্বপ্রধান। মাথা নোয়ালো না, নতি স্বীকার করল না কেউ। এমন কি, ভালোবাসার মুখ চেয়েও মীটিং হাফওয়ে—তাও করলো না। একটু

নম্র নরম নমনীয় না হলে—এক পক্ষ একটু ক্ষতি স্বীকার না করলে কখনও চলে। লোহার সঙ্গে লোহা পাশাপাশি থাকতে পারে। একাত্ম হবে কি করে?

একটা কথা মনে হল বলে ফেললাম। জানতাম—সার নেই কথাটার। বললাম: একাত্ম হতেই হবে মানে আছে তার! পাশাপাশি থাকলেই বা ক্ষতি কি? একজনকে গালাই করে আর একজনের মনের মুচিতে ঢালাই করতেই হবে—তার কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?

: হয়তো নেই, বলল মনোরমা।—না থাকলে অশান্তি আছে, দুর্গতি আছে। আর ঠিক একজনই বা সম্পূর্ণ রূপান্তর হবে কেন? গোত্রান্তর হয়েছে বলেই। দুজনেই তো খানিক খানিক ছেড়ে দিতে পারে, কমপ্রোমাইজ।

হেসে বললাম: মন্দ নয় ফরমূলাটা। যাঁরা বিবাহ করেন তাঁদের এ ফরমূলা না জানাও নয়। তবু বোধহয়, জেদের মুহূর্তে জেদই দখল করে বসে মনটা। জেদই চেপে বসে কমপ্রোমাইজের বুকের উপর। আসে অমিল—দম আটকে কমপ্রোমাইজ যায় মরে।

কোন দূর থেকে বলতে লাগল মনোরমা। আমার কথা তার কানে গেছে বলে মনেও হোলো না। নিজের কথারই জের টেনে গেল: মায়ের রূপ আকর্ষণ করল বাবাকে—বাবার কৃতিত্ব আর পৌরুষে মুগ্ধ হলেন মা। বিবাহ করলেন বাবা মাকে নয়—উভয়ে উভয়কে। হয়তো যাচাই না করে, বাজিয়ে না নিয়ে বিবাহ করেছিলেন। একে অন্যের ধাতু ভালো ভাবে পরখ করে নেবার আগেই বিবাহ কার্যটি সেরে ফেলেছিলেন। তাই বোধ হয় দৃঢ় হল না বন্ধন। গিঁট হয়ে গেল ঢিলে আলগা। সুরুতে তাই তো যাচাইয়ের কথা বলছিলাম—

এতোক্ষণে মুখবন্ধের কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম হল আমার। বললাম: ভালো তো। মানুষ ঠেকে শেখে। সেই শিক্ষাই স্থায়ী-শিক্ষা সন্দেহ নেই। কেউ যদি দেখে শিখতে পারে, ভালোই। আপনি আপনার বাবা মাকে দেখে যদি শিখে থাকেন—উত্তম। যাঁকে বরণ করবেন জীবনে, তাঁকে বাজিয়ে নিন। বাজিয়ে নিন ফুটো ফাটা আছে কিনা। ঝন্ ঝন খন্ খন্ করছে কি না। পরখ করে নিন তার ঘাতসহতা, তার সইবার ক্ষমতা। ভালো প্রস্তাব—

: কিন্তু টান সইবার ক্ষমতা পরখ করতে গিয়ে আমার নিজের হাতই ছিঁড়ে যেতে চাইছে যে। তার কি করি, মিষ্টার রয়!

কোন কিছু অভাব পূরণের জন্য বা দুঃখ নিরাকরণের জন্য নিরুপায় মানুষ শেষ উপায় হিসেবে ভগবানকে ডাকতে থাকে। বিশেষ করে যে অভাব মানুষ পুরোতে পারে না—মানুষের হাত নেই যেখানে। আমরা ডাকি ভগবানকে, ঈশ্বরকে, যারা ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় তারাও অপার্থিব কোন শক্তিকে স্মরণ করে—শরণ নিতে চায় তাঁর।

এই ডাকের সময় আমরা প্রার্থনার সঙ্গে তার আকার-প্রকার বেঁধে দেওয়া বিশেষণ জুড়ে দিতে ভুলে যাই। ভগবান খোঁড়াকে ঘোড়া দেন—খঞ্জের মনের বাসনা মিটিয়ে। কিন্তু দেন এমন ঘোড়া যার নিজেরই মোটে তিনটে পা। পা যার নিজেরই নেই সেই খোঁড়া ভগবানকে ডেকেছিল—তার পদহীনতার বিপদ্ থেকে ত্রাণ পেতে। খোঁড়া ঘোড়াকেও কাঁধে বয়ে নিয়ে যাবার কষ্ট পাবার জন্য নয় নিশ্চয়।

প্রার্থনাগুলোর মধ্যে আমাদের মনে না-পড়া ফাঁক খুঁজে বেড়ান বাঞ্ছা-কল্পতরু ভদ্রলোকটি। 'উল্টা বুঝলি রাম'-এর রহস্য করে মজা দেখেন তারপর!

গত বছর ক্রমাগত অনাবৃষ্টির ফলে গ্রীষ্মের দাবদাহে মাঠের মাটি ফুটিফাটা হয়েছিল। অরুণ দেবতার দারুণ কৃপায় ঝলসে যাচ্ছিল এ অঞ্চল। মাঠের মাটি অরুণ বরুণ দুটোই চায়। মাপমতো। সময় মতো। কম নয়, বেশী নয়। অসময়েও নয়।

অরুণ দেবতার দারুণ অগ্নিবাণে মৃতপ্রায় হয়ে এ অঞ্চলের লোক বরুণ দেবতাকে ডেকেছিলেন। তাতে গুণবাচক বিশেষণ জুড়ে দেন নি—যে অমুক সময়ে এসো তুমি, এসো অতো জালা জল নিয়ে। অসময়েও এসো না—আমাদের প্রয়োজনের বেশীও জল পাঠিয়ো না।

গত বছর বৃষ্টি এলো অসময়ে—জল যখন ক্ষতি করে ফসলের। এলো এতো বেশী—জল আর জল রইল না, প্লাবন হয়ে দেখা দিল। ফসল যা হয়েছিল প্লাবনে ডুবে গেল তা।

এই প্লাবন যাতে ক্ষতি না করতে পারে মানুষের বাসগৃহের, মানুষের

খাবারের—তারই জন্যে তো এতো কাণ্ড। ড্যাম তৈরী, বাঁধ তৈরী এই পাগল নদীর পাগলামিকে লাগাম লাগানো। ড্যাম তৈরীর অনুসঙ্গ হিসেবে তৈরী করতে হয়—ছোট ছোট খাল। ক্ষেতের আকার বুঝে সমতলের থেকে উচ্চতা বুঝে ক্ষেত্রবিশেষে পয়ঃপ্রণালী। পয়নালা, ড্রেন আর নযানজুলি তৈরী করে নেয় চাষীরাই। বড়ো বড়ো নালা আর খাল—এই বাঁধ পরিকল্পনার অঙ্গ।

মানুষের তৈরী এই খালের জলাধার থেকে জলসেচের জন্য জল ধার নিতে পারে চাষী—মুখের গেট খুলে দিয়ে। ক্ষেতে যখন প্লাবন, এই গেট খুলে দিয়েই বাড়তি জল বার করে দিতে পারে চাষী। এই খাল কখনো খাতক কখনো মহাজন। এই খাল ড্যামের ওপাশের লেকের জলাধার থেকে জল ঋণ নিয়ে চাষীকে দেয়। কখনো ক্ষেতের উদ্বৃত্ত জল পৌঁছে দেয় লেকে। লেক নিজের ভুরি ভোজন সেরে—আড়াই শো ফুট নিচের ইতর জনকে বিলিয়ে দেয়। রেডিয়াল গেট খুলে দেওয়া হয—লেক থেকে মুক্তি পাওয়া জল নিচে লাফিয়ে পড়ে। ফেনা নয়, ফণা তুলে তুলে। গর্জন করতে করতে। ধ্বংস-পাগল উন্মাদ, যুঁই ফুলের মতো শুভ্র বিষ অঞ্জলি ভরে নিয়ে ছুটতে থাকে।

এ বছর যথা নিয়মে জল হয়েছে—সময মতো আর মাপ মতো। জলাধার তৈরী হয নি সম্পূর্ণ—এ বছরের বর্ষার বহর দেখে বোঝা গেল সেটা। ড্যাম তৈরী হতে সময় এমনিতেই লাগে গোটা দুই বছর। অত বড়ো ব্যাপারটা—ধরুন তিন শো ফুট খাড়াই, তিন হাজার ফুট লম্বা ড্যাম। এর ওপর রইল চওড়ার বহরটা। সে যে কি বিরাট। ইংরিজি ভি-কে উল্টে দাঁড় করিয়ে দিন। তীরের ফলা আকার দুটো পায়ের জোড়াটাকে একটু নিচে কেটে সমতল করে নিন। চওড়াটার সাদৃশ্য পাবেন।

একটা ড্যামের ক্ষেত্র প্রস্তুতি মানে লাখ লাখ টন মাটি কাটা। ডিনা-মাইটের সাহায্যে হাজার হাজার টন পাথর উড়িয়ে দেওয়া। একটা ড্যামের নির্মাণ অর্থাৎ কোটি কোটি টন সিমেণ্ট কংক্রীট জমানো।

কাছাকাছি ক্ষেত খামার থেকে জল কুড়িয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসে জলধারাটি। যখন পুষ্ট হয়, তাকিয়ে দেখে তার সদ্যপাওয়া যৌবনের উচ্ছল পরিপূর্ণতার দিকে! আনন্দ আর বাঁধন মানে না—মানে না তীরের শাসন। আসলে অবশ্যই পাহাড়ী নদীরা দুরন্ত আর বন্য। সমাজ আর শৃঙ্খলার

তটের সীমানা নেই—গভীরতা নেই মনের। খাদের স্থিরতা নেই পথেরও নয়! মনের এ বর্ষায় আজ রামের বুকে, পরের বর্ষায় শ্যামের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আটকায় না তাদের। বর্ষায় বর্ষায় খাদ বদলালেও তবু মোটামুটি এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায় সে। নাবাল জমিতে ছোট্ট আকার জলাধারে এসে একটু দাঁড়াত। ক্ষণিক মাত্র। তারপরই অন্তর পূর্ণ হয়ে যেতো তার। অন্তরে জলতরঙ্গ বাজতো ছলাৎছল। তারপর আরো জল আসতো গড়িয়ে আরো পাহাড়ের মাথা থেকে। না-চাওয়া জল আসতো ক্ষেত খামারের বুক ভাসিয়ে। ঐটুকু সীমানায় ধরে রাখা সম্ভব হত না নিজের জীবন যৌবনকে। সিন্ধু তাকে ডাকছে। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব উচ্ছল জলধারা দেখত, সে পর্বতের কিনারায় দাঁড়িয়ে। সাগরের ডাক যে শুনেছে, ফিরে যাওয়া চলে না তার। হোক না সাগর নিচে। নামাক না হাত ধরে নিচের থেকে নিচে। তখন সে পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ত—সিন্ধুসন্ধানী। উপায় নেই আর। ফেলে আসা অতীতের উঁচুতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় আর। স্নেহের অচল শিখর থেকে চ্যুতি ঘটেছে যার, সে মেয়ে পথে নেমে কি আর ফিরে যেতে পারে। প্রেম তাকে ডাক দিয়েছে যে!

আগে পড়ত পঞ্চাশ ফুট। এর পরের বর্ষায় পড়বে তিনশো ফুট।

ভগবানের তৈরী পাহাড়কে উড়িয়েছি ডিনামাইট দিয়ে। আসল পাহাড়কে উঁচু করব বলে। পঞ্চাশকে গড়বো তিনশো। ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে তার ওপর নিজেদের পছন্দ মতো কারিগরী করবো। খোদার ওপর খোদকারী করবো বলে। ভূগর্ভে মোটা মোটা লোহার থাম পুঁতে খাড়া করবো বনিয়াদ। কি জানি ভগবান এই পাহাড় গড়ার সময় কাজে ফাঁকি দিয়ে থাকেন যদি! বনেদ যদি নরম থেকে থাকে! থেকে থাকে যদি চোরা ফাটল।

পঞ্চাশ ফুটের আসল পাহাড়কে তিনশো তৈরী করা মানেই পিছনের নকল লেকেরই একটি পাড়কে আড়াইশো ফুট উঁচু করে দেওয়া। এক পাড় উঁচু হওয়া মানে লেকের আয়তনকে পিছনে ঠেলে হঠানো। প্রায় সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত না অন্য পাড় এই আড়াই শো ফুটের উচ্চতা পাচ্ছে! আসলে, অতো উঁচু হবার দরকার হয় না কোনদিনই, শ খানেক ফুটের বেশী গভীর হতে হয় না লেকের জলকে।

এই জন্যেও গোটা দুই বর্ষা দেখতে হয়। জলের বিস্তার কতোখানি হয়,

পিছনের কতোখানি জমি জলপ্লাবিত হয়। সেই বুঝে সেচের খালের গভীরতা, সেচের খালের দিক-নির্ণয়।

গত বর্ষার অশ্রু নকল লেকের চোখ জলে ভরিয়ে রামগিরি পর্বতে ফিরে গেছে আবার। এক বছরের মতো।

একদা যেখানে ছিল বেহুলার বাড়ী সেখানে এখন জলকেলি করতে পারা যায়। দেওগাঁও ছাড়িয়ে ওপাশে অনেকটা পর্যন্ত আস্তানা নিয়েছে জল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে আকাশের আগুন যখন ঝরে ঝরে পড়বে, জলও নেমে যাবে তখন। শুষে শুকিয়ে লেকের গভীরতা যাবে কমে। ওপারের পাড় নামতে থাকবে। পলিমাটিতে পায়ের চিহ্ন রেখে নেমে আসবে দেওগাঁও অবধি। মাইল খানেকের মতো জায়গা আগামী বর্ষায় আবার জলভার সহ্য করতে হবে বলে নির্জন পড়ে থাকবে। শুকনো। মাস ছয়-আট পলিমাটিতে ভালো ফসলের উশুল দিতে পারবে অবশ্যই।

দেওগাঁওয়ের আরো মাইল তিন পশ্চিমে ফুলডহর। ছোট্ট গ্রাম।

গ্রাম নয়, ছোট্ট টিলার ওপর হরিৎ ফ্রেমে বাঁধানো একখানি ছবি। তার পাশে লেক ছিল এককালে। লেকে কিছু মাছ।

টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সমস্ত দুনিয়া ছাড়িয়ে আকাশে ছিল ফুলডহর। দুনিয়ায় সঙ্গে সম্পর্কও ছিল কম। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ। ক্ষেতে ক্ষেতে সবজি।

সেখান থেকে চালান আনা-নেওয়ার অসুবিধা প্রচুর। মর্ত্যের মাটির চেয়ে আকাশের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিল তার বেশী। আরো পঞ্চাশ-ষাট ফুট কাছে কিনা—আকাশও খাতির করত ফুলডহরকে। জল দিত, রোদ দিত। ফুলডহর নিজের খাবার নিজেই জন্মাতো। কারো কাছে খাবারের জন্য হাত পাততেও যেতো না—বেচতে বা ধার দিতেও চাইত না কারোকে।

আটচল্লিশ সালে সমতলে চাল যখন আঠারো-বিশ টাকা, ফুলডহরে তখন দশ বারো। মাছ যখন দু টাকা ন সিকে—ওদের তখন দেড় টাকা, তরিতরকারীর তো কথাই নেই। ঐটেই সব চেয়ে সস্তা। দু পয়সায় এই এতগুলো বেগুন।

সেই ফুলডহর পছন্দ করলো না ওদের গ্রামে সভ্যতা ঢুঁ মেরে ঢোকে।

ইলেকট্রিসিটি মানে সভ্যতা। সভ্যতা মানে বিশিষ্টতা হরণ। ইলেকট্রিসিটি মানে যানবাহনের সুযোগ সুবিধা। তার পিছু পিছু যোগাযোগের আদান-প্রদান। লোকজনের যাতায়াত। লোকজনের যাতায়াতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু লোকজন মানে যেখানে ফড়ে বেপারীর আমদানী—সেখানে অবশ্যই তাদের আপত্তি আছে। জিনিষপত্তর সস্তা থাকবে না আর। ব্যস্ত হয়ে উঠবে সবাই। বাইরে চালান যাবার ফলে দাম বেড়ে যাবে। ইলেকট্রি-সিটি মানেই নকল জীবনের নকল আরাম। আর সভ্যতা মানে একরকমের পঙ্গুতা।

তা ওরা চাইলো না।

চাইবে কেন? একেই ড্যামের নকল লেক হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলতে ছুটে আসছে—ওদের আসল লেক এ বর্ষায় একাকার হয় নি এখনো। আগামী বর্ষায় হবে না, তার নিশ্চয়তা কি! উৎখাত হবার ক্ষতিপূরণও পেলে না—উল্টে পুকুরের মাছ যেতে বসল।

ফুলডহর তাই প্রতি পদে—ড্যামের কাজে, ইলেকট্রিসিটির কাজে, বাধা দিতে লাগল। ওরা টিলার ওপর বলে উৎখাত হল না—উদ্বাস্তু হোলো না বটে। কিন্তু ওদের বুকের ওপর দিয়ে থাম পড়তে লাগল। হাই টেনশান ইলেকট্রিসিটির, ক্রস কানট্রি দৌড়ের জন্য—ওরা চাক, না চাক যায় আসে না।

হাই টেনশানের থাম পড়ছে-আর রাতারাতি উপড়ে ফেলছে কে বা কারা! এক বিচিত্র রহস্য। প্রথম প্রথম থামগুলো পর্যন্ত নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছিল—পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে পাওয়া যেতে লাগল। লেকের জলে।

আর তাই তো টের পাওয়া গেল দুর্বৃত্তদের কীর্তি!

কয়েক ফুট নিচে পর্যন্ত পোক্ত করে সিমেণ্ট কংক্রেটে গাথা লোহার থাম—নটা হাত বের করে আছে। হাতের মুঠোয় কাচকড়া। কাচকড়া অবলীলায় ধরে রেখেছে এক লক্ষ বত্রিশ হাজার ভোল্ট। নব প্রহরণ-ধারিণী নবভুজা।

এক পাগলের কীর্তি। ইলেকট্রিসিটি মানে সভ্যতার অগ্রদূত। তার পিছু পিছু বিজলী বাতি, পাখা, রেডিয়ো, তার পিছনে নকল জীবনের আরাম। ইলেকট্রিসিটি মানেই যা কিছু সনাতন তার বিনাশ।

এই সনাতন পাগল ক্ষেপিয়ে তুলছে তার গ্রামের লোককে। ছোট্ট গ্রাম

—দেড়শো ঘর লোকের বাস। মাঝি সাঁওতাল শ্রেণীর। তাদের চোখে বিষ নেই—চোখের চাহনি ববং সরল সোজা। বিষ আছে কাঁড়ে। আর গায়ে আছে অসীম ক্ষমতা। মনে আত্মবিশ্বাস। আর আছে বিশ্বাসের জন্য প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছা ও পণ!

ইলিকট্রিকের থাম ফুলডহর গ্রামের টিলা ঘুরিয়ে নিয়ে যাওযা যায না—এমন কথা নয। খবচ অনেক, অসুবিধাও বিস্তার। থাম লাগবে অনেক বেশী. তা ছাড়া কারিগরীগত অসুবিধাও প্রচুব।

পুলিশ লেগেছে পাগলের দলকে ঠাণ্ডা করতে। এ দলকে ক্ষেপানো যায না—যাই তারা করুক! আস্তে আস্তে মেজাজ বুঝে তাদেব সঙ্গে ব্যবহাব করতে হয। এ খবর পুলিশেরও জানা। পুলিশও সেই ভাবেই অগ্রসব হয়।

গ্রাম ঘুরিযে নিতে গেলে কি রকম প্ল্যানে থাম পোঁতা যায়—তাবও একটা খসড়া চেযে পাঠিয়েছে ওপব থেকে আমাদেব কাছে। আমাদেব কাছে ঠিক নয়—কনট্রাকটবেব কাছে। আমবা ভালোমন্দ খতিযে দেখব সে প্ল্যানের।

জাযগাটা বেড়িযে আসতে শীলা আব আমি যাবো। ঠিক হযে আছে।

বর্ষাকালে বাইবেব কাজ ছিল বন্ধ। থাম পোঁতাব কাজও। বর্ষা অন্তে কাজ সুরু হযেছে আবাব। থাম পোঁতার কাজ চলছে পুবো দমে, উপড়ে ফেলার কাজ পুরোত্তব দমে।

সার্ভে করতে যাবার তাগিদও এসে গেছে বার তিনেক। ঠেকিয়ে রাখা যায় না আর।

শীলাকে বলছিলাম—যাবার দিন ঠিক করতে হয। আযোজন কবতে হয় যাবার। কবে যাবে বলো?

শীলা বলেছিল: আযোজন আবাব কিসের? চৌদোলাও লাগবে না, হাতি-ঘোড়াও নয—

বলেছিলাম: দেবীর দোলায় গমন হবে না তো—ঘোটকেও আগমন নয় নিশ্চয়ই। দেখো কিন্তু। সেই হিসেবে গজেন্দ্রগামিনীব গজে গমন মন্দ হবে না।—জানো তো—ও দোলা ঘোড়া দুটোই ডেঞ্জারাস। গজ ভালো।

হেসে বলেছিল শীলা: জোগাড় করো হাতি তাহলে।—ভেবো না

অভ্যেস নেই। ঘোড়া হাতি মটর—তিনটেই চলবে। ও দোলাফোলা চলবে না বাপু! টিকিয়ে টিকিয়ে ও মান্ধাতার আমলের বাহন—না না, সত্যি কিসে যাবো বল তো! তোমার জীপ চলবে ওধারে!

ঃ মোটেই নয়। এক পাও নয়। তুমি জানো না ফুলডহরে মোটোরেবল রোড নেই। ইচ্ছে করেই রাখে নি ওরা কমুনিকেশানের ব্যবস্থা। পাছে তুমি আমি সভ্য মানুষ 'যাই—সভ্যতা' নিয়ে যাই সঙ্গে করে। আলো নিয়ে যাই পকেটে করে। ওরা আলো চায় না, ওরা প্যাঁচা—অন্ধকারে থাকতে চায়।

এই ধরণের কথায় শীলার কাছে গালাগাল খাওয়া এই নিয়ে অনেকবার হোলো। আমার চেয়ে শীলা অনেক বেশী ফরোয়ার্ড অনেক বেশী সংস্কৃত। দেশ বেড়িয়েছে কতো। পার হয়েছে সাত-সাতটা সমুদ্র আর তেরোটা নদী। ওর মুখেই হয়তো শোভা পায় আমার মুখের উক্তি। আর আমার মুখে ওর। তবু বারে বারেই উল্টে যায়। আর কটাক্ষ সইতে হয় শীলার।

শীলা বলল, বেশ ধমকের সুরেই বললো ঃ ওরে আমার দিনের আলোর প্রাণী! নিন্দে করা হচ্ছে প্যাঁচাকে! প্যাঁচা তবু লক্ষ্মীর বাহন। লক্ষ্মীর পায়ে নিবেদনের ফুল—প্যাঁচাও ভাগ পায় তার। তার গায়ে গিয়ে পড়ে ফুল আর চন্দনের ছিঁটে। আর তোমরা আলোর প্রাণী না। কি চারটে হাত চারটে পা গজিয়েছে তোমাদের! যতো আলোয় আলোময় হচ্ছে দুনিয়া—হিংসা আর দ্বেষ, দ্বিধা আর দ্বন্দ্বই বাড়ছে। বাড়লে অতৃপ্তি আর অশান্তি। অন্যকে দেখতে পাচ্ছি। স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি তার সুখ সম্পদগুলোকেই। আর জ্বলে মরছি হিংসেয়। হিংসে মানেই কষ্ট, অতৃপ্তি মানেই অশান্তি। শান্তিই যদি না রইল, আলো দিয়ে করবো কি, বলতে পারো? ফুলডহরের লোকেরা অন্ধকারে আছে—অস্বীকার করি না। কিন্তু আরামে আছে, শান্তিতে আছে! ঐটেই কাম্য কামনার জিনিষ।

মৃদু কণ্ঠে বলেছিলাম ঃ নিজে অতো আলোকপ্রাপ্তা হলে কেন তুমি, বুঝি না! না'হলে আরাম পেতে অন্ততঃ—ঐটেই তো চাও।

এর পর যাবার পরিকল্পনাটা রইল, পরিবহনের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা হল না আর। চাপা পড়ে গেল।

রোগটা খুব বড় ছিল না সাধারণ লোকের পক্ষে। বড়লোকের রোগ মানেই বড়ো রকমের রোগ। তাদের সব কিছুই বড়ো। তাদের জীবন বড়ো, সাধারণ আলোচনার বিষয়। তাদের মৃত্যুও বড়ো—আড়ম্বরের বিষয়। তাদের সুকৃতির তিল—খবরের কাগজের হেডলাইনে তাল। দুষ্কৃতি অস্তিত্বহীন হলেও লোকের মুখে বিশাল।

রোগমুক্তি না হয়ে বার্থ-ডেও হতে পারতো। বড়োলোকের মেয়েরা পার্টি দেবার খাতিরে বছরে তিনচারবারও জন্মায়। পাণিপ্রার্থীরা তিন চার-বার প্রেজেণ্টেশান দিতে গিয়ে মুখ চেয়ে করুণা প্রার্থনা করে—দেবী প্রসীদ।

মনোরমার রোগমুক্তির উৎসবে সারা শহরের লোক নিমন্ত্রিত হল। গণ্যমান্যদের তো বাকি রইল না কেউই, নগণ্যরা বাদ পড়লো হয়তো কিছু!

সব রকমের খানা, সব রকমের রান্না, সব রকমের ডিশ। দিশী, বিলিতি। দিশীর মধ্যে আবার রকমফের—বাঙালী, উত্তর ভারতীয়, দক্ষিণ ভারতীয়।

টেম্পোরারি লাইন টেনে ইলেকট্রিসিটি নেওয়া হয়েছে। ঝলমল করছে বাড়ীখানা বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোয়। উৎসবের অর্ধেক সার্থকতা ঐ ইলেকট্রি-সিটিতে পুষিয়ে নিয়েছে।

বাড়ীখানা ছোট। একতলার সামনের ঘরখানা হল ঘর। হলেও শ' দেড়েক লোকের বসবার মতো বড়ো নয়। শুধু তো বসতে দেওয়াই নয়—হাত পা ছড়িয়ে বসতে দেওয়া। টেবিল পেতে খেতে দেওয়া, ওএটারদের আসা যাওয়ার পথ রাখা। জায়গা দরকার অনেকখানি।

শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে সামনে। শহরে একমাত্র ডেকরেটার তো আগরওয়ালারা। এতো বড়ো বড়ো শামিয়ানাও তাদের আছে। সাজানোর আছে এতো সরঞ্জাম। চাঁদোয়ার মাঝখানে লাল শালুতে উৎকীর্ণ ফুল। প্রান্তের দিকে ওমনি ফুল আরো আটটা। প্রত্যেকটা ফুলের নিচে নিচে বৈদ্যুতিক ঝাড়। প্রাচীন দিনের ঝাড়ের মতোই—মোমবাতির পরিবর্তে বিজলী বাতির লম্বা লম্বা লাঠি। শামিয়ানা মাথায় ধরে রেখেছে শালবল্লী। চওড়া ফিতের মতো করে শাদা আর লাল কাপড় পেঁচিয়ে মোড়া। তার গা থেকে পরিচ্ছন্ন কাট-গ্লাসের শেডের ব্রাকেট আলো।

সমস্ত সবুজ মাঠটা মোটা আর টুকরো কার্পেটের নরমে মোড়া।

চারজন চারজনের টেবিলে পাতা টেবিল ক্লথ—টাওএল রাখা।

টেবিলে টেবিলের ফাঁকে কাঠের আর মাটির টবে ফার্ণ পাতাবাহার আর

পাম। কোথায় মৃদু গান বাজছে স্পিকারে—বিলিতি ব্যাণ্ড। বাজছে আস্তে আস্তে—বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতির মতো।

সে আমলে ও জিনিষ সহজে পাবার কথা নয়—আগরওয়ালা জোগাড় করল কোথা থেকে কে জানে। নিঅন সাইনে ইংরাজিতে লেখা—মনোরমার দীর্ঘায়ু। মনোরমা জ্বলে আছে—দীর্ঘায়ু জ্বলছে নিভছে। জ্বলে নিভে দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সবার। রান্নাবাড়ীর দিকটা আড়াল করা আছে, শামিয়ানার একটা দেয়াল টেনে। মনোরমার দীর্ঘজীবন জ্বলছিল নিভছিল তারই ওপর। মনোরমা লিখতে গিয়ে বানান ভুল করে বসে আছে—এম-এ-এন-ও-আর-এম-এ—।

আহারের ব্যাপারটা প্রকাশ্যে। কারণ আহার্য্যে তফাৎ থাকলেও গোপনীয়তার কিছু নেই। কিন্তু পানের ব্যবস্থাটা লোক-লোচনের অন্তরালে হল ঘরে। গণ্যমান্যেরা চুপি চুপি যাচ্ছেন ঐ ঘরে। ও ঘর থেকেই গাড়ীতে গিয়ে উঠছেন, ঈষৎ স্খলিত চরণে ঈষৎ রক্তচোখে। নজর করলে চলার তাল আর কাছে গেলে গন্ধ—এ ছাড়া ও ঘরে যাবার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না আর।

সামনের রাস্তা। বাঁয়ে মোড় ঘুরে এ বাড়ীর পথ ধরেছে। সেই মোড়ে দাঁড়িয়ে পিতা—মণ্ডপে ঢোকার মুখে পুত্রী। স্বাগতম অবশ্যই বিজলী আলো জানাচ্ছে। জ্বলে নিভে দূরের মানুষকে ডাকছে কাছে। তার তলায় করজোড়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রশেখর চৌধুরী। কখনও জোড় করে, কখনও এগিয়ে গিয়ে মোটরের দরজা খুলে ধরছেন। অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন—তিনটে ভাষায়, যাকে যেমন দরকার।

আমাদের চেনা লোক যেমন আছেন, অচেনা লোকও আছেন ঢের। কনট্রাকটরীর লোক। ঠিকেদার কুলী সরদার, অর্ডার সাপ্লায়ার—ইট চুণ সুরকীর বেপারী, লোহা সিমেন্টের আড়তদার। যাঁরা আসছেন—কৌলীন্য আছে সকলেরই। হয় বংশে, পদ মর্যাদায় নয় পয়সায়।

আমি ডাক পেলুম বোধহয় অন্য কারণে।

শীতের সন্ধ্যা। সাড়ে ছটা নাগাদ বেরোলুম। এই তো ক'পা! আলো-গুলোই যা দেখতে পাচ্ছিলাম না। আলোর ছটা উঠছিল আকাশে, আত্মঘোষণার মতো—তাই দেখছিলুম দূর থেকে। দেখতে না চাইলেও দেখতে হচ্ছিল। অন্ধকার আকাশে আলোর উচ্চকিত আর্তনাদ উঠছিল!

কান বন্ধ করেও যা শোনা যায় চোখ বুজলেও যা দেখা যায়। মনের নিজস্ব কান আছে চোখ আছে। আলোটা তো আলো নয়—মনোরমা।

ওদের বাড়ীর মোড় থেকে গজ কয়েক এপাশে আছি, আলোয জায়গাটা হাসছে। পিছুন থেকে ছোট করে ডাক এলো—রয়।

মজুমদার। দাঁড়িয়ে পড়লুম।

ঃ না ডেকে চলে এলে যে। দেরী হচ্ছে দেখে' পায পায় এগোলুম। তোমার মেস থেকে কযেক গজ ওপাশে—দেখি তুমি বেরোচ্ছ।

অপরাধী মন। বলেছিলাম ডেকে নিয়ে আসবো—ডাকি নি। পরে ভেবে চিন্তে সাহস ইচ্ছা কোনটাই হয নি। চুপি চুপি একাই চলে আসছিলাম।

বললাম ঃ এতোক্ষণ ডাকলে না কেন? আমি যদি ভুলে গিযেই থাকি।

ততোক্ষণে মজুমদার ধরে ফেলেছে আমায়। তাই ওর শুক্লা তৃতীযার মতো হাসিটুকু দেখতে পেলাম। মজুমদার বলল ঃ ভুলে যাওযা আর এড়িয়ে যাওযা এক জিনিষ কি, রয?

ঃ নিশ্চযই নয। তা হলে যেচে তোমায় বলতে যেতুম না—এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে, কি বলো!

শীলা বলল ঃ ঠিকই। মনটা ঘুরেছে তার পরে, এমনও তো হতে পারে!

কপট ভর্ৎসনার সুর আনলুম কণ্ঠে ঃ ছাখো, কাল রাত্তিরে জোলাপ নিযেছি, সকাল থেকে খাই নি কিছু। খামোকা মিথ্যে দোষারোপ করে ক্ষিদেটা নষ্ট করে দিও না, দোহাই তোমার। পেটের জ্বালায ভুলে গেছি তোমার কথা—

খুব স্বাভাবিক হতে পারে নি শীলা ঃ তা হলে বলো, স্থূল উদরের জ্বালার চেযে বড়ো নই আমি! কি বলো!

ঃ স্থূল বলেই বাদ দিই কি করে উদরটাকে! যাই বলো, বাদ দেওযা যায না ওটাকে—

চৌধুরীর অভ্যর্থনার আওতায় এসে পড়েছি।

অল্প হেসে চৌধুরী বললেন ঃ বাদ দেবেন কেন! কোন কিছুই বাদ দেবার নেই দুনিয়ায—ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না! ধন্যবাদ কথাটার মধ্যে বাদ ঢুকে গেছে একটা কি করে যে! আসুন আসুন—আসুন মিস মজুমদার আসুন মিস্টার রয়, আপনার তো এটা নিজের বাড়ীর মতনই। মিস মজুমদারের শুভাগমন এ বাড়ীতে বোধহয় এই প্রথম—

শীলা স্মিত হেসে বলল: কতোদিন ভেবেছি আসব—কিছুতেই হয়ে ওঠে নি।

চৌধুরী বললেন: মোনোর সঙ্গে চেনা নেই বুঝি!

শীলা বলল: তাতেই বা কি যায় আসে!

যাই হোক—নতুন নিমন্ত্রিত এসে পড়ল, আমরা ভিতরের দিকে পা বাড়ালুম।

শীলা আজ মেয়ে। শাড়ী আছে তাহলে ওর বাক্সে! তুলে রেখে দেয়—উৎসবে ব্যবহারের জন্য! ওর মনটার আলমারীর কোন খোপে একটি মেয়েও আছে না কি তা হলে! উৎসবে উৎসবে বেরোয়! আজ কি শুধু শাড়ীই বেরোল—না মেয়ে-মনটাও!

ঠিক জানি না—শাড়ীখানায় মনে হয় নেই এ বছরের ছাপ। আধুনিকতা নেই তাতে—কিছুটা সে-আমলের। হাল ফ্যাসনের নয়।

ছাপা শাড়ী—ভয়েলের। পাড় নেই। জমিতে অত্যন্ত হাল্কা রঙের বড়ো বড়ো ফুল।

বললুম: কার কাছে ধার করলে এই শাড়ী! আগরওয়ালার কাছে শাড়ীও ভাড়া পাওয়া যায় না কি? জানতুম না তো।

ধমকের চোখে তাকালো শীলা: আগে বলো শাড়ীখানা কেমন—তার পর জবাব দেবো তোমার কথার।

বললুম: আমার মনটা বড়ো নরম। কারোকে মুখের ওপর খারাপ বলতে পারি নে।

শীলা বলল: মনে রেখে দিও কথাগুলো। কাজে লাগাবো কিন্তু।

এই রাস্তাটুকুর দু পাশে ফুট দুই উঁচু করে আলো সাজানো। ঘষা কাচের গ্লোবের মধ্যে বিজলী বাতি। রাস্তার দু পাশে ফুট দশ অন্তর দাঁড় করানো। মাঝে মাঝে ফুলের টব।

বললুম: ভদ্রে, আপনার শাড়ীর মতো এমন সুন্দর শাড়ী আমি আর অবলোকন করি নি।

শীলা বলল: চালাকি হচ্ছে! জানো এখানা কোথাকার শাড়ী?

কোত্থেকে মনোরমা বলে উঠল: হায়রে—বাঁচি নে আপনার কাণ্ডজ্ঞান দেখে! আসুন মিস মজুমদার, নমস্কার। ও-কি বুঝবে শাড়ীর মর্ম! ঐ যে কি বলে না—কারা বোঝে না মুক্তোর মালার মর্ম! হুকুম করেন তো

আমি বলি। ইটালিয়ান ভয়েল। নামে ইটালিয়ান, জন্মায় বিলেতে।

মনোরমার পরণে চমৎকার ঘি রঙের জর্জেট—কোথাও এক একটি জরির তারাফুল। দূরে দূরে বসানো।

ফাঁপানো চুল—বঙ্কিম, সোনা রঙের। দু ভাগ করা—প্রান্তে ছোট্ট একটি করে গ্রন্থি।

সব চেয়ে আশ্চর্য, আভরণ নেই কোথাও। সোনার সংস্পর্শ নেই গায়ে।

'বোকে'র ডিশটা তুলে ধরল সামনে মনোরমা: নিন, মিস মজুমদার।

শীলা গোলাপ কুঁড়ি নিল একটা। খোঁপা নেই যে পরবে—হাতেই ধরে রেখে দিল।

এইবার আমার পালা।

: নাও দেখি, তোলো! সাবধান, এই থেকে মন জানা যাবে কিন্তু তোমার। সুগন্ধ, চাও না সুন্দরে তোমার পছন্দ।

ওরে বাবা, কঠিন পরীক্ষা। আমি নিজেই জানি না আমার মন। যতোটুকু জানি—আমার মন সুগন্ধি আর সুন্দরকে চায় একটি আধারে। চায় ও দুটোকেই। বাড়ানো হাত গুটিয়ে নিলাম।

: কাজ নেই আমার পরীক্ষা দিয়ে। আমার চাই না। অনেক পরীক্ষা দিয়েছি জীবনে—

: নাও—হাত গুটোলে যে! তুলে নাও।

বললুম: বাটন হোল কই যে রাখবো? পরে এসেছি তো পাঞ্জাবী। নেবো যে, মর্যাদা দিতে হবে তো তার! নিয়ে কি ফেলে রাখবো ধূলোয়—

মনোরমা বলল: হাত বাড়িয়েছিলে কেন তাহলে?

কপট ভয়ে বললুম: দেখাদেখি! কুঁজোরও তো সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে।

ডিশ থেকে লাল টুকটুকে গোলাপ কুঁড়ি একটা তুলে দিল মনোরমা: নাও—তোমার তো বেছে নেবার চোখ নেই। আমিই বেছে দিলুম। গন্ধও আছে রূপও আছে—নাও, ধরো!

বললুম: গোলাপকে যে সকলে চায়! সকলেরই নজর এদিকে। সিন্দুক কই গরীবের যে, রাখবো অমন ঐশ্বর্য! লুটে নিয়ে যাবে না! তা ছাড়া—গোলাপে বড্ডো কাঁটা যে। রক্তাক্তই হবো শুধু—লাভ হবে না কিছুই।

মনোরমাকেও মন দিতে হল অন্য নিমন্ত্রিতে। বললে: লেকচার রাখো।

ঘরের ছেলের মতো কাজ কম্মো করো, দেখাশোনা করো। লোভীর মতো টপ করে আগেই খেতে বসে যেও না যেন।

শীলা ফোড়ন দিতে পেয়ে বাঁচল যেন: জানেন কি বলছিল বয়। বলছিল—পার্গেটিভ নিয়েছে কাল। আর না খেয়ে আছে সকাল থেকে। কাজেই টপ করে খেতে বসে যেতেও পারে!

মনোরমা বলল: আপনি দেখে রাখুন, আমার ঢের দেখা আছে। ও ওমনি লোভী বরাবর—। আপনাকে বলতে পারি না, তবু বলছি। যদি আপত্তি আর খুব খিদে পেয়ে না থাকে, আমরা তিনজন পরেই খাবো—একসঙ্গে। কি বলেন।

শীলা বলল: এ তো খুব ভালো প্রস্তাব। খাওয়া মানে কি খাওয়াই শুধু।

কি কাজে লাগতে পারি জানতাম না। হাত বাড়িয়ে ডিকেণ্টার এগিয়ে দিতে পারতাম সাদা জলে ভরা। বাঙালী মতে পরিবেশন করব, সুযোগ নেই তার। ওএটারে ওএটারে বোঝাই। সাদা উর্দি পরা ওএটার ঘুরে বেড়াচ্ছে নীরবে। কেউ সাউথ ইন্দিআন খানা পরিবেশন করছে। কেউ ট্রে-তে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে পোলাওয়ের ডিশ। চামচে দিয়ে তুলে তুলে নিচ্ছে প্রয়োজন মতো। মাংসের গন্ধের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ইডলির ঘ্রাণ। গন্ধ মিশলেও ডিশ মিশছে না—ওএটারও মিশছে না।

একবার ভাবলাম—গান বাজাই গিয়ে লাউড-স্পিকারে। কিন্তু ভাবী ছেলেমানুষী মনে হল।

তা ছাড়া শীলা করবে কি একা বসে! মনোরমা তো কাজে ব্যস্ত।

একপাশে একটা টেবিলে বসে আছি আমরা। শীলা আর আমি।

মাঝে মাঝে আমাদের সামনে দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে মনোরমা। ভ্রূভঙ্গী করছে, করে যাচ্ছে একটু কটাক্ষ। কখনও আমাকে বলছে—কি লোভী রে, খাওয়া দাওয়া সেরে আর একবার খাওয়ার মতলব। আমি বলছি—এতোক্ষণ তো খাবি খেলাম—এইবার যদি খাবার খেতে পাই। কখনও শীলাকে বলে যাচ্ছে—এই হয়ে এলো। আর একটু। খিদে পেয়েছে খুব? শীলা বলছে—কচি খুকী নই। খিদে পেলেও চাপতে শিখেছি। খিদে যদিও পায় নি মোটেই—

শরৎকাল—শীত নয়, শিরশিরানি এসেছে হাওয়ায়। এই অল্প অল্প

শীতেও মনোরমার কপালে স্বেদবিন্দু জমেছে—কনে চন্দনের মতো। ফুরফুরে চুলের একটি দুটি ঘামে জড়িয়ে যাচ্ছে কপালে গালে গলায়।

অমনি আর একবার কাছে আসতে জিজ্ঞেস করেছিলাম: অলঙ্কার নেই কেন গায়ে? থীভস আর য়্যাবাউট—নাকি?

মনোরমা কি লজ্জায় ফেলেছিল আমাকে! ও মোটে বোঝে না—চালাকি হলেও এ সবের অনেক কূট অর্থ হতে পারে!

বলেছিল: তুমি আমার অলঙ্কার যে। অহঙ্কারও। খনির সোনা অঙ্গে ধারণ করব কেন আজ? তুমি যখন স্বয়ং এখানে!

আড়চোখে তাকিয়ে দেখি অমাবস্যার আভা নেমেছে শীলার মুখে।

এমনি করে উৎসবের শেষ হতে চলল এক সময়। যাবার আগে অনেকেই আড়চোখে চেয়ে গেছে আমাদের দিকে—এরা না খেয়ে বসে আছে কেন? শীলা শুনতে পেয়েছে কিনা জানি না, কারা তো বলেই গেল—ওরা দুজনেই ইলেকট্রিক, একজন পজিটিভ, একজন নেগেটিভ। খাবার দরকার হয় না ওদের।

কটু কটাক্ষ সহ্য করে বসেছিলাম দুজনে। চুপি চুপি আলোচনা করছিলাম—সাজপোশাকের, চালচলনের, কারো না খাওয়ার বহর এবং বকমের। ঠোঁটের প্রান্তে লেগেই ছিল হাসি। পরচর্চায় মানুষ ভাবী আনন্দ পায়—

সব মিটে গেলে ওএটারদের বিদায় দিল মনোরমা। রয়ে গেল ওদের পুরনো—দিলবাহাদুর যমুনাপ্রসাদ।

চৌধুরী সাহেবও একটু আগে মণ্ডপ থেকে গেছেন, দেখতে পাচ্ছি নে তাঁকে আর।

রাত ভারীই হয়েছে। দশটা বাজে।

গান বন্ধ করিয়ে দিল শীলা। বিলিতি ব্যাণ্ড, বিলিতি জ্যাজ বন্ধ হল। বিলিতি কায়দার ওএটার চোখের সামনে থেকে চলে গেল। জায়গাটার পরিবেশ বিলেত থেকে ফিরে এলো বিহারে। বিহারে কেন বাংলায়।

গোটা কতক আলোও নিভিয়ে দেওয়ালো মনোরমা। আমাদের সামনে এসে বলল: এতোই বসেছেন, আর একটু। একটুখানি মুখ হাতটা ধুয়ে আসি। অসহ্য মনে হচ্ছে।—এই যাবো আর আসবো।

খানিক পরে, এই মিনিট দশেকের বেশী হবে না, আবার দেখা দিল মনোরমা। মনোরমা নয়—বৃষ্টিস্নাত যুঁই একমুঠো, ল্যাভেণ্ডারে মাজা।

শান্তিপুরী পরণে, তেমনি নিরাভরণ। গায়ে সম্ভবতঃ ওটা গরম ব্লাউজ, হাল্কা এক রঙা। বাফ কালার বলা যেতে পারে।

এসে বলল : চলুন। ওঠো রয়—

বললুম : পাদমেকম ন গচ্ছামি। এই আমি গ্যাঁট হয়ে বসলুম। বেশ যা হোক তুমি—সারাক্ষণ নাকের ডগায় খাবার ঝুলিয়ে রেখে এখন বলছ চলুন!

মনোরমা বলল : আরে বাপু, লোভ ভালো নয়। লোভ দমনেই আনন্দ।

শীলা উঠে পড়েছিল আগেই।

আমি বললুম : লোভ দমনে আনন্দ হতে পারে, ক্ষুধাকে দাবিয়ে নয়। ভালো আহার্য পাবার বৃত্তিটা লোভ—ক্ষুন্নিবৃত্তিটা প্রয়োজন। লোভ আর প্রয়োজনে তফাৎ নেই বুঝি!

মনোরমা বলল : আরে খেতে দেবো—ডাকছি সেই জন্যেই।

হঠাৎ নজরে পড়ল মনোরমার—লং লিভ মনোরমা, জ্বলছে নিভছে তখনও। ওদিকে গিয়ে স্যুইচটা টেনে দিতে দিতে বলল—কাজ নেই লং লিভে আর। আজ থেকে নিভে যাক মনোরমাও।

মনোরমার পিছু পিছু হল ঘরে গেলাম।

পরিচ্ছন্ন হল ঘর। টেম্পোরারি আলো একটা—জ্বলছে মাঝ বরাবর। তারি তলায় টেবিল। টেবিল-ক্লথ পাতা। বোঝা গেল—ঐটাতেই বসতে হবে।

বসা গেল। দুদিকে দু খানা করে চেয়ার। মনোরমা ছিল না। আসন নির্বাচনে মুশকিলে পড়া গেল। শীলা বসল আগে। মুখোমুখি চেয়ারের একখানায় বসলাম আমি।

নিজে হাতে খাবারের প্লেট এনে এনে রাখতে লাগল মনোরমা। টাওএল ঢাকা। গোটাচারেক প্লেট এনে রাখল।

মনোরমা বসল শীলার পাশে।

বলল : তোমাদের খাবার আলাদা করে তুলে রেখেছিলাম। আগেই!

পোলাও মাংস মাছ ভাজাভুজি—বাঙালী খাবার।

মনোরমা শীলার দিকে তাকিয়ে বলল : কষ্ট দিলুম আপনাকে। না! খুব ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়। নিন সুরু করুন। রয় কই! এতোক্ষণ খাবার জন্যে হামলাচ্ছিলে। জানি, খেতে বসে পারবে না খেতে। ঐ মুখেই যতো—

খাওয়াটা কিছু নয়—মানে আহার্যটা কিছু নয়। আমরা কি খেয়ে তৃপ্তি পাই। আহার্যের উপাদান না আন্তরিকতার উষ্ণতা? নিশ্চয় আহার্যের উপাদান নয়।

খাওযা চলছিল। না চলার মতোই—টুক টুক করে। প্রায় নীরবেই।

কিছু বলতে হয়। বললুম: মিস্টার কৃষ্ণমূর্তিকে দেখলুম না যেন।

মনোরমা বলল: এসেছিলেন তো। রাত্তিরে খান না বিশেষ কিছু।

আবার প্রায় নীরব নয় শুধু, নিঃশব্দও। বাইরে স্তব্ধ নিশীথ প্রহর গণিছে বিরলে। নিশীথের হাতে প্রহরের অক্ষমালার আওয়াজও পাওযা যেতে পারে কান পেতে থাকলে। প্রহরের মালা জপ করে চলেছে রাত্রি—অন্ধকারেব কুড়োজালির মধ্যে।

শুধু একটা সুপসাপ। তাও মৃদু। মুখগহ্বরে আহার্য চালান করবার আওয়াজ।

তৈরী হয়ে নিচ্ছিল বোধহয় মনোরমা। মুখের আপাতগাম্ভীর্যে সে কথা মনে করার হেতু আছে। শীলা অনেকটা ভাবলেশহীন। বর্তমান পরিবেশের অনেক অনেক ওপাশে যেন। কিছুই বিশেষ স্পর্শ করছিল না তাকে। এমনি নিস্পৃহ, উদাস মুখের চেহারা।

নীরবতা ভঙ্গ করল মনোরমা ঘরের মধ্যে একটি বোমা নিক্ষেপ করে।

: একটি কথা বলব বলে কায়দা করে ধরে রেখেছি আপনাকে মিস মজুমদার!

শীলা এইবার ফিরে এলো এই ঘরে। সচকিত। : আমাকে?—কি কথা?

এতোক্ষণের গাম্ভীর্যের মুখোশ কোথায় ফেলে দিল মনোরমা। বেশ হাসি খুশী।

: ঘাবড়াবার কিছু নেই। সামান্য কথা। রয় বলতে পারছে না সাহস করে।

সে কি! আমি! আমি তো কোন কথা বলার ভার দিই নি মনোরমাকে। আমার সঙ্গে কোন কথাই হয় নি।

আমি বলতে চেষ্টা করলুম অনেক কিছুই। গলার দরজার এপাশে বেরোল শুধু একটুখানি আওয়াজ: কই-আমি-আমি তো—

মনোরমা বলল: রয়কে চেনেন তো, ভীষণ লাজুক। এই দেখুন—লাল হয়ে গেছে লজ্জায়।

শীলার হাত থেমে গেছে। রক্তমাংসের মানুষের মুখ নেই সেখানা আর। পাথরের হয়ে গেছে। চোখের পাতা পড়ছে না, মণিও স্থির। রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় বুকের টিপ টিপ চেষ্টা করলে শোনা যায় বোধহয়।

মনোরমা বলল: রয় বড্ড টায়ারড ফীল করছে, বোরড—একঘেয়ে। ছুটি দেবেন ওকে মাসখানেকের?

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম: কই—আমি তো—এ কথা-কই-তোমাকে তো—

মনোরমা বলল: দেখুন—আপনাকে বলতে পারে নি তো! জানি পারবে না, যা লাজুক।

শীলা বলল: ছি রয়, তুমি আমাকে ডাইরেকট বলতে পারলে না। তোমার কোন কথায় না বলেছি আমি? অফিসের কাজ আমি এখন মোটামুটি বুঝে সুঝে নিয়েছি! মাসখানেক স্পেয়ার করব তোমাকে। এর মধ্যে কিন্তু করার তো কিছু নেই। তোমার ছুটির দরখাস্ত পেতে হোল ওঁর মুখে!

মনোরমা বলল: দেখুন, আপনি না মনে করে বসেন, আপনাকে বিপদে ফেলার জন্য ছুটি নিচ্ছে ও। মুখ ফুটে বলতে পারে নি এই কুণ্ঠায়। আর একটু লজ্জাও ছিল। আমার শরীরটা সারাতে মুসৌরী যাবো কিনা, ও—

কথাটা শেষ করল না মনোরমা।

শেষ করে নিল শীলা: ও থাকবে সঙ্গে, এই তো! এতে লজ্জা পাবার তো কিছু নেই। এ তো আনন্দের কথা!

শীলাও চেষ্টা করে হাসি নিয়ে এলো কোথা থেকে যেন। শীলার মনে আর দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, শঙ্কা সন্দেহও নেই। সব পরিষ্কার। নির্মল নীল, নির্মেঘ।

আমার সন্দেহ হতে লাগল, আমি বেঁচে আছি কিনা। কথাগুলি মনোরমা অবলীলায় বলে গেল। এতো মারাত্মক কথা, এতোখানি সীরিয়স কথা। শুনতে যখন পেলাম—শ্রবণশক্তি ঠিকই আছে তা হলে। মাথা? হ্যাঁ, মাথায়, মানে অনুভূতিতেও তো প্রতিবাদ রি রি করে উঠল। তবে ওটাও ঠিক আছে। তা হলে গেছে জিভটা। ওটাই প্রতিবাদের কথাগুলি উচ্চারণ করে উঠতে পারল না সময়মতো। আড়ষ্ট হয়ে রইল। যখন করতে পারল—তখন নৌকো ছেড়ে গেছে।

মনোরমা বলল: দেখুন, সারাদিন অফিসে একসঙ্গে থাকেন। সন্ধ্যে-

বেলায় আপনার ওখানে যায় রয়, থাকেন একসঙ্গে। আজও এসেছেন সেই একসঙ্গে। আপনাদের ছুটির জুটি এমন চমৎকার! ছাড়াছাড়ি হন নি একবারও! তবু রয় এমনই লাজুক নিজে বলতে পারল না। বলবে কি করে! সাধারণ এমনি ছুটির ব্যাপার হতো, হয়তো বলতে পারতো! এর সাথে আবার আমার সঙ্গে মুসৌরী যাবার ব্যাপার রয়েছে যে!

মনোরমা এতো ভালো তীরন্দাজ, একটি তীরও টারগেট মিস করল না। প্রতিটি কথা এমন লাগসই—শীলা কেন, যে শুনবে কারো কানেই বেমানান লাগবে না। মাংস খাই না, মাছটা চলে। পলান্ন ভালোবাসি দস্তুর মতো। সেই পলান্ন এমন বিস্বাদ হয়ে যেতে পারে—তাও আবার এক মুহূর্তের মধ্যে, সেই জানলাম।

আমার মনে হতে লাগল—'কাত্যায়ন নাড়ী দেখতে জানো?···ত্যাখো তো ইহকাল না পরকাল?···ত্যাখো তো আলোকের উচ্ছ্বাস না অন্ধকারের বন্যা, সৃষ্টির সঙ্গীত না প্রলয় কল্লোল?···ত্যাখো তো আমি বেঁচে আছি, না মরে গেছি!'

শীলা বলল : রয়, এ যে তোমার কতো বড়ো অন্যায়। আমি এমন কিছু একটা বাঘ ভালুক 'বস' নই, যে খেয়ে ফেলব একেবারে। কেন তুমি আমাকে বলতে পারলে না! কবে থেকে ছুটিতে যাবে বলো! তারিখ আর ডিউরেশানের ব্ল্যাংক চেক দিলুম তোমায়—

মনোরমা বলল : সেটা পরে বলবে। উপস্থিত কালকে আমায় লেক-এ নিযে চলো তো রয়। সবাই বেড়ায় লেকে, আমার বেড়ানো হয নি। ঐ মোটর 'লঞ্চ'টা কাল সকালেই বুক করে রেখো কিন্তু। নইলে পাওয়া যাবে না বিকেলে, বুঝলে তো!

রেগে মেগে এতোক্ষণে বার্স্ট করলুম আমি : আমার যাওযাব সুবিধে হবে না কাল!

মনোরমা বলল : রয় প্লীজ—বাধা দিও না।

শীলা বলল ম্লান হেসে : যাও না রয়! মিস চৌধুরী বলছেন অতো করে! আপত্তি করছো কেন?

বললুম : আমার একটু কাজ আছে।

মনোরমা বলল : পরশু তা হলে! পরশু তো কাজ নেই আর—

আমি নিরাসক্ত গলায় বললুম : পরশুর কথা কাল হবে। আজ কেন?

বেশীদূর এগোয় নি খাওয়া—যখন মনোরমা ঐ বম্বশেলটি ছুঁড়েছিল। ও কথার পর স্বভাবতই খাওয়া মাথায় উঠেছিল তিনজনেরই।

মনোরমা এতোতেও দমল না, থামল না। বলল : আচ্ছা কাল না হয় পরশু।

সঙ্গে সঙ্গে গলার সুর মনোরম করে নিল। মেয়েদের শ্রেষ্ঠতম পাশুপত নিক্ষেপ করল চোখভরা কটাক্ষ হেনে। চূড়োন্ত ন্যাকামী ভরা কণ্ঠে বলল : কি কাজ আছে তোমার রয়! থাক না কাজ কালকের মতো। কালই চলো না। আমার বড্ডো যেতে ইচ্ছে করছে যে!

এইবার মনোরমা শীলার কাছে য়্যাপীল করল : মিস মজুমদার!— দিন না ভাই ওকে ছুটি। পুরো দিনটা চাই না। হাফ-ডে ছেড়ে দিন ওকে। প্লীজ—

কঠিন কণ্ঠে বললুম : আমার 'বস' আমায় ছুটি দিলেও আমার অন্য অসুবিধে আছে। আমার পক্ষে সম্ভব হবে না যাওয়া।

অন্য সময় মনোরমার যে কটাক্ষ আমায় মুগ্ধ করত, এখন সে-দৃষ্টি আমায় দগ্ধ করতে লাগল। ওই সুন্দর মুখের কোন মোহই এ মুহূর্তে আমার নেই। ও মনোরমা নয়—ও সাপিনী।

সব চামচে হাতে হাতে স্তব্ধ হয়ে ছিল। মনোরমার ছলা, আকাঙ্খিতকে পাবার জন্য কলা কৌশল! এর আমদানীর সমাচার জানতে পাচ্ছিলাম শুধু আমি। শীলা তো অবাক হয়েই গেছে। মনোরমাকে দেখছে না, শুধু নিরীক্ষণ করছে! নির্বাক বিস্ময়ে!

ফেরার পথে দেখি রাত হয়েছে ঢের। বিহারী পল্লীতে প্রথম শরতের শীতের শিরশিরানি। নীল ধোঁয়ার একটা আস্তরণ মাটির বুক থেকে খানিকটা উঠে আর উঠতে পারে নি। থমকে স্তব্ধ হয়ে আছে। কম্বল চাপা দেয়া হয়েছে যেন পৃথিবীকে।

ভেবেছিলাম; সারাটা পথ কোন কথা হবে না। আর সেইটেই বোধ হয় স্বাভাবিক হত। তা হল না।

শীলা বলল : এই জন্যেই কি নেমন্তন্ন করে নিয়ে গিয়েছিলে! এই কথাগুলো শোনাবে বলে! তারিখ স্থির হয়ে গেছে তো!

সত্যিই, তারিখ কিসের—প্রথমটা বুঝতে পারি নি আমি। শুধোলুম : তারিখ, কিসের?

কাল বিলম্ব না করে শীলা বলল : তোমাদের বিয়ের !

আমি এই সুযোগটা পেয়ে খুব খুশী হলাম। সঙ্গে সঙ্গে বললাম : জানি, তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারাটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন কাজ। কঠিন নয়, অসম্ভব। তবু শুনে রেখে দাও, আজকের সমস্ত ঘটনাটা মনোরমার মনগড়া। আমাতে ওতে কোন কথা হয় নি। ও মুসৌরী যাবে, এ খবর জানা নেই আমার। ছুটির কথা আমার মনেও হয় নি।' ওকে বলি নি আমি ছুটির কথা। আমার ছুটির কথা তোমাকে অনুরোধ করতে ওকে সুপারিশ ধরব, এ তো আমি ভাবতেও পারছি না। যাই হোক এ কথা কটি তুমি শুনে রেখে দাও। পারো তো—প্রয়োজন মনে করো তো মিলিয়ে নিও পরে।

ভাবতে ভাবতে চলেছিলুম।

আমার রাগটা না-বোঝার কথা নয় মনোরমার। মনোরমা নিশ্চয় বুঝেছিল।

আর এই মুহূর্তে শীলা কি ভাবছে সেটা আমারও না বোঝার বা অনুমান না করতে পারার কথা নয়। শীলা নিশ্চয় ভাবছে, আমার আর মনোরমার ভালোবাসা গড়িয়েছে অনেকদূর। নইলে মুসৌরী যাওয়ার কথা ওঠে একসঙ্গে! নইলে কথা ওঠে নৌকা বিলাসের। আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল মনোরমা ; নিমন্ত্রণের আসরে একথা খুলে বলবে। এও ঠিক ছিল আমাদের গভীরতার কথাটা, কায়দা করে জানিয়ে দেবে মনোরমা। আর সে কায়দাটা লেকে বেড়ানোর প্রস্তাব।

শীলার মন থেকে আমার নাম এমনি করে মনোরমা মুছে দিতে চায়। অবশ্যই মনোরমা জানে না শীলার মনে দাগ কাটার ধার বা ভার, কোনটাই আমার নেই। আমার কেন, কোন পুরুষেরই আছে কিনা সন্দেহ। মনোরমা জানবে কি করে শীলার মনের গঠন! তা জানে না বলেই এই নীচ উপায়ে মনোরমা নিজেকে উদ্ঘাটন করল।

শীলা বলল : রাতটা অন্ধকার—তোমার মুখখানা দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এ সৌভাগ্য তোমার না আমার রয় !

বললুম : গলাবাজী করব না। সত্য জিনিষ প্রমাণে একটি বিবৃতিই যথেষ্ট। মিথ্যে জিনিস প্রমাণ করার চেষ্টা করতে গেলে গলা ফাটাতে হয়। আজ বলে রেখে দিলুম, মিলিয়ে নিও—সময় যে-দিন আসবে।

কি মনে হল শীলার, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল : কাল—কালই তোমার কথার সত্যি-মিথ্যের পরীক্ষা নেবো। অগ্নিপরীক্ষা। য়্যাসিড টেস্ট—

সত্যি খুশী হলুম : রাজী—ভেরী হ্যাপি যে পরখ করে দেখার ইচ্ছা তোমার হয়েছে।

আমার মেস বরাবর পৌঁছে গিয়েছি। বলা বাহুল্য আমার মেসে যাবো না এখন। পৌঁছে দিয়ে আসব শীলাকে।

মেস ছাড়িয়ে যাচ্ছি—শীলা বলল : বাড়ী যাবে না? চললে কোথায়?

বললুম : মাথাটা ধরেছে বড্ডো—একটু বেড়িযে আসি। পৌঁছেও দিয়ে আসি তোমাকে।

শীলা বলল : আরে তাই নাকি! আমারও বেজায় মাথা ধরেছে! কি যে করি!

আমি বললুম : মনোরমার ধরা-মাথাটা ছেড়ে গেছে!

শীলা বলল : ও কথা বলছ কেন রয়!

: এমনি। সব কথাই কি আগু পিছু ভেবে ন্যায়-অন্যায় চিন্তা করে কারণ-কৈফিয়ৎ স্থির করে বলে লোকে।

বাকি কয়েক পা নিঃশব্দে চলে ইনসপেকশান বাংলোয় পৌঁছে গেলাম!

পাকা দেয়াল, টালির চার-চালা। চতুর্দিকে কম্পাউণ্ডের চার পাশে বরফি কাটা কাঠের বেড়া।

এ পাশের বারাণ্ডায়, টালির চালার কাঠের ফ্রেম থেকে হ্যাসাগ জ্বলছে। স্বভাবতই শীলার ফেরার প্রতীক্ষায়। পাম্প গিয়েছে কমে। ম্লান হয়ে জ্বলছে।

কম্পাউণ্ডের কাঠের গেট খুলে ধরলাম। শীলার পিছু পিছু আমি।

কালো সিল্কের বড়ো একটা স্কার্ফ মাথায় বেঁধে নিয়েছিল শীলা। কোণাকুণি দু'ভাঁজ করে। মাথার ওপর দিয়ে দু কান ঢেকে চিবুকের তলায় টেনে বাঁধা। ত্রিভুজের আর একটা কোণ পিঠে বিলম্বিত।

স্কার্ফটা বাঁধা ছিল সম্ভবতঃ ঠাণ্ডা আটকাবার জন্যে। কম্পাউণ্ডে ঢুকেই সেটি আগে খুলে ফেলল শীলা। আর এক ঝাঁক সাপ ঝাঁপি থেকে মুক্তি পেয়ে পিঠে ছড়াছড়ি হয়ে পড়ল। কোথায় দূরে মুকুল ধরেছিল মহুয়ার, পূর্বরাত্রে শিরীষে এসেছিল ফুলের সুগন্ধ-প্রতিশ্রুতি! এতোক্ষণ

গন্ধ পাচ্ছিলাম তার। এইবারে এক ঝলক পেলাম ব্রিলিয়ান্টিনের গন্ধ! মহুয়ার মতই কেন, তারো চেয়ে মাতাল করা। নেশা ধরে গেল যেন! একেবারে কাছাকাছি আমরা দু জন। যেখানে গন্ধ গন্ধর নাগাল পায়।

আমার মনে হচ্ছিল, কাছাকাছি আমরা তো সর্বদাই থাকি। ড্রয়িং দেখতে গিয়ে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি হয়েছে কতোবার! 'নরেন বিজয়া'র তুলনা টেনে আনন্দ পেয়েছি মনে মনে। এমন নেশা তো লাগে নি কখনো। কতো রাতে কতো রাত্রি পর্যন্ত কাছাকাছি থেকেছি, এমন করে মনের পা টলে নি কখনো এর আগে!

এ কি তবে রাত্রির মায়া!

হ্যাজাগের তীব্র আলোর পটভূমিকায় অজস্র ফাঁপানো চুলের চিকন আমায় বারে বারে দংশন করতে লাগল।

গোটা চারেক সিঁড়ি টপকে বারাণ্ডায় উঠলাম। দুজনে প্রায় পাশাপাশি হয়ে গেছি তখন।

শীলা যেন চমকে উঠল: এ কি পিয়ারলেস! টলছ তুমি!

বলে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেললো আমায়। আমিও ততক্ষণে সামনের ঘরের একখানি চৌকাট ধরে ফেলেছি!

মাতালের মতো টলতে টলতে নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেললাম, একখানি ডবল সোফায়। শীলারই ঘর সেখানা।

তার পর, আধো ঘুমে আধো জাগার আলো-আঁধারিতে যা যা হল, তার কিছু বা স্মরি কিছু পাশরি। সোফার পিছনে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিল শীলা। কপালের দু পাশের শিরা দুটো দপদপ করছিল। টিপে ধরেছিল ঝুঁকে পড়ে। মুখে বলেছিল—আরে বাবা! এ যে ফেটে যাচ্ছে মাথাধরায়। তারপর পিটার গোমেজ এসেছিল। বিশ্রুত কীর্তি দ্রৌপদী সে, এ অঞ্চলের। যেমন রান্নায়, তেমনি সেবা-পরিবেশনেও। সে ঘুম থেকে উঠে এসে মাথার দরদ আচ্ছা করে দিতে সাহায্য করেছিল।

কিন্তু মনের ওপর ঝড় বয়ে গেছে সেই খাবার টেবিলে বসে। তার গভীরে গোআনিজ পিটার গোমেজের হাত পৌঁছবে কি করে!

বেশ খানিকক্ষণ পর পিটার ছুটি পেয়েছিল। অর্ধ চেতনায় টের পাচ্ছিলাম বেশ। তারই কাছাকাছি মনে পড়ে ঘড়িতে অনবরত ঘণ্টা বেজেই চলেছিল। ওর চেয়ে বেশী ঘণ্টা ঘড়ির আর নেই বোধহয়।

এইবার শীলা নিজে সেবা করছিল। ঐ শীতের রাত্রেও কপালে জলপটি দিয়েছিল। এবং বেশ আরাম পাচ্ছিলাম। অ-ডি-কোলোনের গন্ধটি বেশ কিন্তু!

ঐ মগ্ন চেতনায়ও শীলার জন্য কষ্ট লাগছিল। সোফার পিঠের ওপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে বেচারা! আমি তো একটা কোণ আশ্রয় করে চিৎপাত। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে আমি সে.কাটায় শুয়ে পড়লে আমার দেহকাণ্ডটা সোফার লম্বায় এঁটে যাবে। তাতে পা দুটো সোফার একটা পাশ আশ্রয় করে আকাশে লাথি দেখাতে থাকবে হয়তো। কিন্তু মেঝেতে বসার সুযোগ পাবে শীলা। দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

কিন্তু আমি যে স্ববশে ছিলাম না। চেষ্টা করেও কাৎ হয়ে শুয়ে পড়তে পারি নি।

শীলার নিঃশ্বাস এসে কখনও কখনও আমার মুখে চোখে পড়ছে। আতপ্ত। প্রাণের পরিচয় তো উষ্ণই হয়। চুল তো এসে পড়ছে প্রায়ই। সেই হাফ প্রমাণ সাইজের চুলগুলো নিয়ে বেশ মুশকিলে পড়েছিল শীলা। চেপে চুপে হাতখোঁপা গড়ে। কয়েক সেকেণ্ড পর বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে নেয় তারা—শীলার সমস্ত চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করে।

স্বজ্ঞানে থাকলে হয়তো ঘণ্টা দুয়ের বেশী হয় নি। পূর্বরাত্রের নিমন্ত্রণের ঘটনা আমার কাছে মনে হচ্ছিল কয়েক যুগ আগেকার। ধূ ধূ স্মৃতির মতো।

রাত্রি দীর্ঘ। যন্ত্রণা দীর্ঘতর। হোক। অনন্তকাল এই যন্ত্রণা নিয়ে পড়ে থাকতে পারি, কোন আপত্তি নেই। এ কোমা তো আনন্দময় যন্ত্রণার।

তা হোলো না। ভগবান অতো সুখ লেখেন নি আমার ভাগ্যে। টের পেলাম, মূর্তিমান ছন্দোপতনের মতো—শ্রীহরির আবির্ভাব।

মজুমদার বলল শুনতে পেলাম: মাথার যন্ত্রণায় অজ্ঞানের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। আগের চেয়ে একটু ভালো হলেও, পুরোপুরি সুস্থ হতে দেরী আছে—

শ্রীহরিকে বলতে শুনলাম: আমি কি দেরী করব একটু, না চলে যাবো! সাহেব কি যাবেন?

মজুমদার বলল: না না চলে যাও তুমি, আজ রাত্রে যাবার মতো অবস্থা হবে না আর। এখানেই থাকবেন।

টলতে টলতে হলেও উঠে দাঁড়ালাম আমি। একবার দাঁড়িয়েই বসে

পড়তে হল অবশ্য। জড়িত স্বরে বলেছিলাম মনে আছে : শ্রীহরি এসেছে— আমার যাওয়াই ভালো—

: না না এ তুমি কি করছ, রয় ? দাঁড়াতে পারছ না যাবে কি ! যাবার দরকারটা কি তোমার ?

বলেছিলাম : এটা ইনসপেকশান বাংলো নয়—জতুগৃহ। কলঙ্কের বারুদে ঠাসা। একটা কাঠি ঘষে দেবে কেউ জনমতের দেশলাই বাক্সে। জতুগৃহ পুড়ে ছারখার—

শীলা বলেছিল : তুমি তো জানো, আমি কেয়ার করি না !

: এটা বার্মিংহাম নয়, আমিও অটো গ্রুবার্ট নই, মজুমদার। খারাপ লোক হতে পারি তো ! আমি যাই।

এইবার চমকাবার পালা আমার।

যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে রইল। আমার বাহু ধরল না এসে, বন্ধ করল না দরজা। এমন কি নিজ হৃদয়ের স্নেহ অধিকারও প্রচার করল না— যেতে আমি দিব না তোমায় ! শুধু বলল : শ্রীহরি, কাজ করো একটা। পিটারকে আর ওর ঘরে আর যারা থাকে তাদের দু একজনকে ডেকে নাও।

টানাটানি করতে গিয়ে শুধু কি মনোরমাই ছিঁড়ে ফেলে, না আমারও সে ভুল হয় !

কপালে অ-ডি-কোলোনের গন্ধ আর মনে ব্রিলিয়ান্টিনের। ওদের কাঁধে ভর করে এলাম। গেট দিয়ে যখন বেরুচ্ছি তখনও শীলা বলল না—থেকে গেলে পারতে !

পরদিন ভোরে উঠতে একটু বেলা হল। মাথাটা ঝিমঝিম করছে অল্প। তা ছাড়া বিশেষ গ্লানি নেই আর।

অ-ডি-কোলোনের গন্ধ বাসি হলেও পাওয়া যাচ্ছে। পাওয়া যাচ্ছে না ব্রিলিয়ান্টিনের গন্ধ, চেষ্টা করেও। অ-ডি-কোলোন তো সান্ত্বনার প্রলেপ— তাই গন্ধ আসছে তার। কাল রাত্রের কোন গন্ধই নেই কোথাও আর।

যথারীতি খাওয়া দাওয়া সেরে অফিসে যেতে কম অবাক হয় নি শীলা : এ কি ! তুমি ! অফিসে এলে যে বড়ো ? আছো কেমন ?

সেই অফিসিয়াল দূরত্ব। কাল রাত্রের সন্নিধির লেশ নেই কোথাও একটুও।

বললুম : ভালোই আছি। তোমার পিটারটি চমৎকার মাথা টেপে কিন্তু।

শীলা হেসে বলল : উঃ কি আনগ্রেটফুল তুমি। আমি অতো করলুম, একবার মুখেও আনলে না!—আর কক্‌খোন কিচ্ছুটি করে দোব না—

বললুম : সত্যি, তোমার কথা বলে ধন্যবাদের তুচ্ছতা জুড়ে দিতে চাই না।

: সত্যি বলছ? না, মন-রাখা কথা বলছ!

বললুম : আর একটু খোলসা করে বলি, অভয় দাও তো। তোমার কাছে থাকলে সারা রাত্রেও সেরে উঠতুম না আমি! তাই চলে এসেছিলুম। আধো জ্ঞান আধো অজ্ঞানের গঙ্গাজলি তখন আমার। শ্রীহরির চলে আসবার কথা মন্ত্রের মতো কাজ করল। শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে একটা হাই ফ্রিকোয়েন্সির কারেন্ট বয়ে গেল। আমায় যেতে হবে—। এ ঘরে থাকলে আরাম হবো না আমি। আরো অসুস্থ হবো মাত্র। আর মগ্ন চৈতন্যে কলঙ্কের আতঙ্কের কথাগুলো বাইরে বেরিয়ে এলো। বললুম জতুগৃহ, বললুম কতো কি।

শীলা হাসছিল মুচকি মুচকি। যেন আমাকে থামিয়ে দিতে চায়! আমার কথা শেষ না হতে দিয়েই বলল : যাক্‌গে—আজ সুস্থ আছো তো!

: নইলে আর এলুম কি করে?—হ্যাঁ, ভালো কথা, আজ পরীক্ষা নেবে তো! পরীক্ষা দিয়ে ডিসটিংশানে পাশ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না।

তার উত্তর দিল না শীলা। না দিয়ে বলল : সত্যি সুস্থ আছো তো? মানে মাথাটা বেশ ছেড়ে গেছে!—অবশ্য ঘুমুলেই এই সব সেরে যায়—মাথাধরাটরা। ঘুমুতে পেরেছিলে?

: আর সব দিনের মতো কেন, তারো চেয়ে বেশী সুস্থ আছি, শীলা। সত্যি ভালো আছি—

আমার স্বাস্থ্যের জন্য এই উদ্বেগ বেশ উপভোগ করছিলাম আমি।

শীলা বলল : আচ্ছা ফুলডহরের কাজটা—

: করতে চাও আজ?

: তোমার শরীরের ওপর ধকল না পড়লে—হ্যাঁ—সেরে ফেলতে চাই আজ।

লাফ মেরে উঠলাম একটা : বাহবা, ভেরী গুড! উত্তম প্রস্তাব। নাইস প্রোপোজাল। আজ লেকের হাওয়ায় মাথাটা আর একটু রিফ্রেশড্ হবে—

: লেকের হাওয়ায় মানে?—বড়ো বড়ো করে তাকালো শীলা।

: লেকের হাওয়ায় মানে—লেকের ওপর দিয়ে যেতে হবে বোটে করে।

মোটোরেবল রোড ফ্রী হয় নি এখনও। থানাখন্দ জলে বোঝাই। তা ছাড়া এতো ঘুরে যেতে হবে যে তার চেয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে কোণাকুণি পাড়ি দেওয়া অনেক সোজা। হয়তো সময় সংক্ষেপও—

চোখ দুটো আরো বড়ো হয়ে জ্বলে শীলার। আমি জানি এর অর্থ। মনোরমা বারে বারে বলেছে, অনুরোধ করেছে। বেশ একটু আব্দারও ধরেছিল, ঐ লেকে নৌকো করে বেড়ানোর জন্যে। আমি যাই নি আর সেই লেকে আজই নিয়ে যাচ্ছি শীলাকে। নাই বা হোল বেড়াতে। মনোরমার ওপর এই অবিচারের ব্যাপারে চোখ বড়ো হয়ে যাচ্ছে শীলার।

মনোরমার মিথ্যার মাথার ওপর দিয়ে আজই আমার যাওয়া চাই। শীলাকে নিয়েই! এ সুযোগ ছাড়া চলবে না। শীলার দিক দিয়ে আগ্রহের তীব্রতা কমে গেলে! যদি যায়—আমায় টেনে রাখতে হবে।

আর কথা না বাড়িয়ে জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মোটর-লঞ্চ-এর ব্যবস্থা করতে।

ঘাটে এসে ইতি উতি তাকাতে লাগল শীলা!

বললুম : কি দেখছ?

: মাঝি কই? আর, অর্ডিনারী নৌকো যে! লঞ্চ কি হল?

আমার এমনই জেদ—লঞ্চ ভাড়া হয়ে গেছে, সামান্য নৌকো আছে। এক মাল্লাই আছে, পানসি টাইপের আছে। পানসি টাইপের যেটা, হালের কাছে খানিকটা ছইওয়ালা। একটু ভারী হয়। মাঝি মাল্লা নেই এখন তার। কাজে বেরিয়ে গেছে। কখন আসবে, ঠিক নেই তার। জুৎ লাগলো না। আছে ঐ এক মাল্লাই। জিজ্ঞেস করে জানলুম, তিনজন চাপতে পারা যায় না। দু জন। ওটাই ভাড়া করে বসলুম।

: লঞ্চ ভাড়া হয়ে গেছে। আর মাঝি! একটু চোখ বুজে সাধনা করতে হবে তার। তবে হবে তার আবির্ভাব। চোখ দুটো বুজে ফেলে ধ্যান করো কাণ্ডারীর। ভবতরী পার করবে যে—একটুও সাধবে না তাকে!

: ফাজলামো ছাড়ো। কই, মাঝি কই তোমার?

নৌকো ভাড়ার ইতিবৃত্তটা জানা ছিল, জানা ছিল মাঝি পাওয়া যাবে না। ব্যবস্থাও করে এসেছিলাম তার। ট্রাউজারের তলায় আঁটো করে মালকোচা মেরে পরেছি ধুতি! শার্টের তলায় গেঞ্জি তো আছেই। শীত নেমেছে

পূর্বাভাসে। তারও কিছু ব্যবস্থা নিয়ে এসেছি। একখানি মৌচাক খোপ বুননের বড়ো টাওঅল। জলের ব্যাপার। ভিজে হাত পা মোছার কাজে চলবে, চাই কি মাথায় বাঁধাও চলবে।

আর একবার সতর্ক করে দেওয়া দরকার মনে করলাম : চোখ বুজলে কর্ণধারের আবির্ভাবের সুবিধা হত। চোখ বুজলে পারতে, মজুমদার।

ইঙ্গিতটা বুঝতে না পারারই কথা। বুঝলও না শীলা। অগত্যা।

ঘাট হয় নি কিছু। কটা লোকই বা নৌকো চড়ে! কচিৎ ভবিষ্যতে অফিসিয়ালরা এপার থেকে ওপার যান। রেগুলার আমোদ হিসেবে নৌকা-বিহারের চল হয় নি এখনও। ব্যবসাও গড়ে ওঠে নি তাই। তাই নৌকো এক আধখানা যদিই বা থাকে ঘাট নেই। মাঝি মাল্লারা করে অন্য কাজ। হট বলতেই পাওয়া যায় না তাদের।

বাঁধের একপাশটায় চাঙড় চাঙড় ছোট বড়ো পাথরের স্তূপ। কঠিন কবা মাটির হেলানে স্তরে স্তরে পাথর সাজানো। তারি ওপর পা ফেলে ফেলে পেতে হয় জলের নাগাল। শরৎকাল। বর্ষার পুরো জল—জমে আছে প্রায় সবটাই। কাণায় ভরা লেক। শীলার শ্রীচরণের নাগাল পেতে জলই লোভী হয়ে উঠে এসেছে ওপরে।

ঘাটে এসে বেশীক্ষণ দেরী করা সাজে না আর। আশ্বিনেব পাখা পালকহীন সাদা মেঘবলাকা। ইতস্তত: উড়ছে আকাশে। লেকের নিস্তরঙ্গ জল আরশি রেখেছে—আকাশের মুখ দেখাব কাজে।

আর দেরী কবা যায় না। অনেক সতর্কই করা গেছে মজুমদারকে। আর কি করতে পাবি!

ট্রাউজারের বোতাম খুলতে আরম্ভ করলাম। আমার মস্তিস্কের সুস্থতা সম্পর্কে কি ধারণা হল মজুমদারের জানি না। চোখ ফেরালো না কিন্তু। হয়তো সম্পূর্ণ উপলব্ধি হবার আগেই আমার ওপব দুঃশাসনের কার্য শেষ। এইবার শার্ট। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক হাঁটুর ওপর রেখে ক্রিজে মিলিযে ভাঁজ করে ফেললাম—দুটোই। খুলে ফেললাম চপ্পল।

শীলাকে বললুম : খোলো তোমার জুতো। ও দোআঁশলা। না হাই হিল, না অক্সফোর্ড। ওই নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লে—দেখতে হবে না আর!

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের ঢেউ শীলার চোখের বিস্ফার বাড়িয়ে দিচ্ছে ক্রমেই। আমি ভাবছি—কোন মুকুরে মুখ দেখব আমার! শাল তালের পক্ষচ্ছায়ার

ঐ লেকে! না কালো ঘন পক্ষচ্ছায়ার এই জোড়া লেকে। উভয়েরই নীল জল—শান্ত, স্থির। উভয়েই ভীমা ভয়ংকরী হতে জানে। এখন সে রূপ নয়, জীবনদাতৃর রূপ।

যন্ত্রচালিতের মতো জুতো জোড়াটা পা থেকে খুলতে লাগল শীলা। কেমন বিস্মিতের মতো বলল: তুমি! তুমি চালাবে নৌকো? তুমি পারো? পারলেও কষ্ট হবে না তোমার?

বললুম: পরীক্ষা দেবার কথা আজ! এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সেই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী! চোখের সেই ঘোর ঘোর ভাব কাটল না শীলাব। প্রথমে ভেবেছিলাম আমার ট্রাউজার খুলে ফেলার দুঃসাহসে এতোই চমকে গেছে যে কথা ফুটছে না আর! কই চোখের সে ভাব তো কাটল না। একটু আগেও 'লেকের হাওয়া' কথাটা শুনে এই চেহারাই দেখেছিলাম চোখের! তা হলে সেটাও কি মনোরমার ওপর মমতা প্রসূত নয়।

জুতো জোড়াটা হাতে ধরে দাঁড়িয়ে রইল শীলা। কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

বললুম: নামো—

শীলা বলল: তুমি হাত ধরে নামালে, তবে নামবো। অমনি নামবো কেন?

হাত ধরলুম। তার আগে জুতো দুজোড়া পাশাপাশি সাজিয়ে তার ওপর রেখে নিলুম আমার এপার ওপারের ইঞ্জিনিআরটাকে।—শাদা ধপধপে ধোপদোরস্ত প্রোজেক্ট অফিসারটাকে।

শীলাকে নামিয়ে এনে নৌকোয় তুললুম। এপাশের গলুইটা টেনে মাটির ওপর তুলে রাখা ছিল আদ্ধেকটা মতন। নৌকোটার প্রায় গঙ্গাজলি অবস্থা।

নড়তে পেলো নৌকোটা। মাঝখানটায় যেখানে খানিকটা পাতা আছে পাটাতন—সেইখানে পৌঁছে বললুম: কাগজও এনেছি একটুকরো। সেইটে পেতে বোসো। আর একটু দেখো, আমার জামা-কাপড়টা না ভেজে! ঐটে পরে ওপারে নামতে হবে তো! মাঝি থেকে ইঞ্জিনিআরে আবার স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মেশান—

শীলার হল কি! কথা কোথায় গেল তার?

আর এক দফা ওপরে উঠে জামা প্যাণ্ট জুতো দুজোড়া নিয়ে এলাম। এ পাশের গলুইতে রেখে খোঁটা থেকে শিকলটাও খুলে নিলাম। মনে মনে 'বদর' 'বদর' স্মরণ করে ডান পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা মেরে চলতি নৌকোয় উঠে বসলাম! গলুইতে বসে জলে পা ডুবিয়ে পা-টা ধুয়ে ফেললাম।

হাত বোটেটা তুলে নিয়ে জলে ফেলে শীলার দিকে তাকাবার সময় সুযোগ পেলাম এবার।

হয়েছে কি শীলার! কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে পাটাতনের তক্তায় হাত রেখে বসে আছে।

বললুম : নাও, হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নাও। ট্রাউজারের ডান পকেটে ব্রাউন কাগজ আছে একখানা! পেতে বোসো—

শীলা বলল : না থাক। আমার জামাকাপড় ময়লাই।

: তোমার কি হয়েছে বলো তো! কথা বলছ না। আড়ষ্ট হয়ে বসে আছো!

পিছন ফিরে বসে আছে শীলা। বোটে জলে পড়ছে, উঠছে—ছপ ছপ। এক মাল্লাই নৌকো বললেও ঠিক হয় না। ঐ খোলা বোটেই হাল, ঐ বোটেই দাঁড়। স্টিয়ারিং, প্রোপেলিং দুটোই।

পিছন ফিরেই বলল শীলা : তোমার পরীক্ষা দেবার দুর্জয় সাধনার কথা ভাবছি।

কি মনে করে এতোক্ষণে টুপি খুলে ফেলল শীলা। রেডিয়াল গেট খুলে দিল যেন কেউ। ঝাঁপিয়ে পড়ল একরাশ কালো-উদ্দাম ঢেউ। থেমে রইল পিঠের মাঝ বরাবর এসে। অথবা বলা যেতে পারে সেই স্রোত আমার মনের মধ্যে চলাফেরা করে বেড়াতে লাগল!

ভাদ্র মাসের বেলা এগারোটা বারোটা। রোদের হাসি আছে, দাঁত নেই। আমি বাঙালী। শীলা কি, জানি না। আমার মনে তো আশ্বিন মাস পড়লেই সানাই বাজতে থাকে। রুরকীতেই থাকি, বিহারেই থাকি—বাংলা দেশের এই সানাই বাজে আমার মনে। এই সানাই তো রহমতুল্লা বাজায় না! নহবতের রোশন চৌকির সানাইও তো নয় এ। এ যে আল্লার কেরামতি। আকাশের নহবতখানা থেকে দেশ বিদেশে ডাক পাঠিয়ে বেজে চলেছে। এ সানাইয়ে কখনো বাজছে সোহিনী, কখনও বাহার।

নীচে স্বচ্ছ নীল কাচ। প্রায় স্ফটিকের মতো। জলে স্রোত নেই। আগামী ভাদ্রে পুব উত্তর কোণে থাকবে সামান্য প্রবাহ। হাইডেল পাওআর স্টেশানের চাকা চালাবার জন্যে। এ ভাদ্রে স্রোতহীন স্বচ্ছতোয়া, থমকে দাঁড়িয়ে আত্মচিন্তায় মগ্ন। ভেবে দেখছে অতীত-আগামীর খতিয়ান। দাঁড়াবার কথা নয় তার। গিরি-পিতামহকে ছেড়ে আসার সময় কথা দিয়ে এসেছে—

প্রিয় মিলনে যাচ্ছি দাদু। দাদু বলেছেন—কান্নার বাষ্পে শুদ্ধ হয়ে ফিরে এসো আবার।

যেখানে অগভীর—তল দেখা যাচ্ছে সেখানে। নকল লেক। মানুষের প্রয়োজনের একসক্যাভেটার খামচি কেটেছে সর্বংসহার গায়ে। এখান ওখান থেকে রাস্টন বুসীরাসের শভেল ইচ্ছে মতো মায়ের গায়ের ছাল উঠিয়ে নিয়েছে।

দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সোজাসুজি পাড়ি জমিয়েছি। উঠেছি বাঁধের দক্ষিণের ঘাট থেকে।

বললুম : মৌনব্রত নিয়েছ নাকি! শুককুরবার শুককুরবার কথা কইবে না স্থির করেছ? বেশ। অন্ততঃ ঘুরে বসতেও পারো তো। অবশ্যই তোমার মন যদি চায়—

অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘুরে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজে থেকেই নিবৃত্ত হয়ে গেল শীলা। বললে : থাক। পিঠ দিয়েই একটু না হয় সেবা করি তোমার। তুমি এতো করছ! কতো কষ্ট হচ্ছে তোমার!

আমার মনে হতে লাগল, সমস্ত রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

নৌকো তখন মাঝ রাস্তায়। দক্ষিণের তীরের অসম বেষ্টন মাঝে মাঝে তিন চারশো গজের মধ্যে এসে পড়ছে। ফেলে আসা তীর স্মৃতির মতো ধূসর। যার উদ্দেশ্যে পাড়ি, সে তট ভবিষ্যতের মতো অস্পষ্ট নীল।

বললুম : তোমার বাবা হাতী ঘোড়া শিখিয়েছেন, মোটর চালানো শিখিয়েছেন। সাত সমুদ্র পার হয়ে এলে—তেরো নদীও ঐ সঙ্গে। এক গণ্ডুষ হাঁটু জলকে এতো ভয়! নাও, ঘুরে বোসো এদিকে।

বিহ্বলের মত উত্তর দিল শীলা : অ্যাঁ—

ধমকের সুর লাগালুম কথায় : নৌকো আমাদের মতো দু জন ফড়িংয়ের পক্ষে ঢের বড়ো। জল থেকে জেগে আছে পনেরো ইঞ্চি। নির্ভয়ে ঘুরে বোসো। ঘুরতে গিয়ে পনেরো ইঞ্চি পর্যন্ত কাৎ হবার টলারেন্স তোমায় দেওয়া গেল।

শীলা বলল : জল এখানে কতো গভীর, রয়!

: দেখতেই তো পাচ্ছ—সত্তর আশী ফুট। আর কতো! ঐ রকমই।—কেন? নৌকো ডুবে গেলে বাঁচবে কিনা এই চিন্তা!—পাঁচ মাইল গভীর জলের ওপর দিয়ে এসে এখন সত্তর আশী ফুটের গোষ্পদে ভয়!

: সেখানে সাঁতারের কোন মূল্য নেই। সেখানে বানচাল হলে নির্ভয়ে মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়া যায় নিজেকে। সেখানে শুধু প্রহর গোণা কাজ। এখানে তো তা নয়। এখানে আশার লাইট হাউস জ্বলছে চোখের আওতার মধ্যে। শাল তাল মহুয়ার বনস্পতিতে বনস্পতিতে। এখানে যে চতুর্দিকে জীবন! চতুর্দিকে শান্ত নিস্তরঙ্গ। এখানে মৃত্যুই বেমানান। সেখানে যেমন জীবন বেমানান। বা রে, তফাৎ নেই বুঝি! আর, সেখানকার নাবিক কতো দক্ষ, কুশলী!

আড় করে বোটের ফলক ফেলে জল কেটে এগিয়ে দিচ্ছি নৌকো। প্রপেলারের কাজ। তোলবার সময় বোটের ফলা কাৎ করে সামনের গলুই দিক নির্দেশ করে তুলছি। স্টিয়ারিং।

বললুম: পরীক্ষা দিচ্ছি আজ। পরীক্ষাই দিই। ডুবিয়ে দিই নৌকো। দিয়ে তোমাকে নিয়ে কূলে উঠতে পারি কিনা। শুধু দয়া করে জোঁকের মতো এঁটে থেকো না—অক্টোপাসের আট বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধোরো না আষ্ঠে-পিষ্ঠে। সেই সময়টুকুর জন্য। তা হলেই পারবো। আর নৌকো-টাকেও বাঁচাতে পারি কি না ঐ সঙ্গে—তার পরীক্ষাও সম্ভবতঃ দিতে পারবো।

শীলা ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলছিল। বলল: ডুবিয়ে দিয়ে—জোঁকের মতো ধরাতে চাও আমাকে দিয়ে! মতলব তো তোমার ভালো নয় নাবিক! তার চেয়ে নাই ডোবালে! তুমি তো জানো, অক্টোপাসের মতো রক্তও শুষব, পরনির্ভর হয়েও থাকব—এই দুমুখো অপবাদের হাত থেকে বাঁচব বলেই বিয়ে করব না স্থির করেছি। আজকের দিনটা দয়া করে নৌকাডুবি করে দিও না তুমি! তা হলেই ধরতে হবে না আঁকড়ে। বেঁচে যাবো এই যাত্রা—

হাতের হাল ছেড়ে দিলুম, তর্কের হাল ধরবো বলে। ওর ডুবন্ত মনের হাল ধরবো বলে।

: বিশ্বাস হয় না আমাকে? আমার বাহুবলে বিশ্বাস নেই তোমার? বলো, বলো, ঠিক করে বলো!

ভয় পেয়ে গেল শীলা: ও কি, তুমি হাল ছেড়ে দিলে কেন রয়? কি হবে তা হলে? ডুবে যাবে না নৌকা?

বললুম: ঝড় নেই বৃষ্টি নেই স্রোত নেই জলে। শেতলপাটি জল। ডুবে কেন? এক জন হাল ছেড়ে দিলে আর একজন এসে হাল ধরে। এই

নিয়ম। স্রোত থাকলে স্রোতের টানে ঘুরে যেতো নৌকো—তাও নেই। তবু তোমার ভয়!

শীলা বলল : হাল ধরো তুমি পিয়ারলেস! করছ কি?

: তুমি বলছ তা হলে! তুমি বললে—ধরি! ধরব, অন কণ্ডিশান তুমি আমার দিকে ফেরো তা হলে!

সভয়ে শীলা বলল : কিছু হবে না তো! ডুবে যাবে না নৌকা?

অত্যন্ত আস্তে আস্তে শীলা ফিরে বসল এবার। বোটে ফেলার আন্দোলন ছিল না। স্থির অচঞ্চল নৌকা। অসুবিধা হল না বিশেষ।

ঘুরে বসে এবার যেন সহজ হল একটু শীলা : বাঃ, গুণ্ডাদের ধরণে পরেছ কাপড়, গেঞ্জিটাই যা পরিষ্কার। মাথায় বেঁধেছো ফ্যাটা! চেহারাখানা বেশ মাঝি মাঝি হয়েছে কিন্তু!

উত্তর দিলাম সুরে, গান জুড়ে দিলাম : মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে—আমি আর বাইতে পারলাম না—

শীলার কণ্ঠে পরিহাস : বাওয়া সুরু করে দিয়ে বাইতে পারলাম না। অর্থ—?

বললুম : ও যে মন মাঝিকে বলছি। ছেড়ে দিয়েছি হাল মন মাঝিকে। তার যা ইচ্ছে হয় করুক—আমি আর পারি না। আমি ক্লান্ত—

: ও। আমার মুখ আর মন তোমার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে তারপর মন মাঝির খেয়াল খুশীর হাতে সঁপে দেওয়া এ তো ভালো কথা নয়। সে ব্যাটা বহুরূপী! ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। তার হাতে তুলে দেবে কেন, পিয়ারলেস!

: কারো হাতে সঁপে দেবার অপেক্ষাতেই আছো কি না তুমি! আমি তোমায় চিনি না কিনা!

শীলা বলল—মুখে হাসি। সুরু করেছিল হাসি দিয়ে। পরে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল যতো এগিয়েছিল।

: কি চেনো তুমি আমাকে! কতোটুকু চেনো, বন্ধু!

বন্ধু কথাটা উচ্চারণ বোধ হয় এই প্রথম। একটু দম নিয়ে কিছু ভেবে নিল বোধ হয় আবার।

বলে চলল : চেনো বাইরের এই স্ল্যাকস আর কোট। টুপি আর টাই। আমার মুখ আর হাতের লেখা। আর কি চেনো পিয়ারলেস?

বললাম : কাছাকাছি থাকলাম, চিনতে দিলে কই? তুমি না ধরা দিলে, মানে, চেনা না দিলে চিনব কেমন করে?

: ধরা?—বলে হাসল শীলা। যেন অবজ্ঞার চেয়ে বেদনার ভাগই তাতে বেশী!

: এখানে কেউ নেই, আসার সম্ভাবনাও নেই কারো। তুমি কথা দাও, আমার মনের কথা বলে দেবে না কারো'কে!

: কথা দিলাম, শীলা। নিচে জল—সদা অস্থির সদা চঞ্চল। নিজেই একটি মুহূর্ত দাঁড়াতে পায় না একঠাঁই, তার মনে রাখবে কি! ওপরে আকাশ। সর্বদা রং বদল, কোন প্রিন্ট টেকে না সেখানে। এক মুহূর্ত টিঁকতেও যদি চায়, মেঘের ন্যাতা মুছে দিয়ে যায় তৎক্ষণাৎ। আমিও বেঁধে নিলাম আমার মনকে আকাশ জলের ঐ সুরে। বলো। মনে না-রাখার হৃদয়হীন তন্ত্রীহীনতায়। বলো—

: ধরা দেওয়াব কথা বলেছিলে তুমি! তোমার বাহুবলে বিশ্বাস আছে কি না—জিজ্ঞাসা করছিলে! অবিশ্বাস থাকবে কেন ভাই! তোমার কেন, কাবো বাহুবলেই নেই। তবে, নিজের বাহুবলেই বিশ্বাস এতো বেশী যে সেই জন্যেই কারোকে দুর্বল ভাবতে শিখি নি। আর এ শিক্ষা আমার বাবার কাছে পাওয়া।—তিনি ছিলেন কর্মবীর।—আমি পাকিস্তানের এক জমিদারের মেয়ে। বাবার রাজা পদবী ছিল। সেই কারণেই, ছেলেবেলা থেকে ঘোড়ায চড়া মোটর চালানো বন্দুক চালানো আমার দৈনন্দিন রুটিনের মধ্যেই ছিল!

বললাম : পাকিস্তানের মেযে তুমি। জলে এতো ভয় কেন তোমার? সেখানে তো বর্ষার দিনে ঘর থেকে বেরোলেই জল!

: জমিদারীর আবহাওয়ায মনটা আমার যদি বিগড়ে যায়! ঐ রকম হযে যায, তাই আমি বড়ো হযে পাকিস্তানে থাকি নি আর। আমি বড়ো হয়েছি ডেরাডুন মুসৌরীতে। তারপর কলেজে পড়েছি কলকাতায। জমিদারীর আওতা মানেই তো উৎপীড়ন শোষণ আর মনের দাস্য। বাবা নিজেও পছন্দ করতেন না ওখানে থাকতে। বাবাকেও থাকতে দেখি নি। নাযেব গোমস্তা যা করত। তা ছাড়া বাবার এক জ্যেঠতুতো ভাই নিজের শরীকানা-টুকখানি দেখতেন। আমাদের অংশটাও দেখে দিতেন। এরা দুজন ছিলেন এক বয়সী। ছেলেবেলায় খেলাধুলা করতেন একসঙ্গে। তিনিই দেখাশোনা

করে দিতেন !—যা বলছিলাম, আমার যা কিছু শিক্ষা বাবার কাছে। হাতে কারিগরী শিক্ষা দেবার সঙ্গে মনের কারিগরীও শেখাতেন।—মেয়ে হয়ে জন্মেছ বলেই তুমি পরনির্ভর। কেন? যে যে বিদ্যা শিখে যে যে বৃত্তি অবলম্বন করে পুরুষ—পুরুষ, সেইগুলো শিখে নিলে মেয়েও পুরুষ হতে পারে। কোন বাধা নেই। পুরুষ আর মেয়ের শরীরে কিছু কিছু পৃথক প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন ভগবান। সেটা সৃষ্টির গড্ডালিকাটি বজায় রাখার চাল। প্রজনন কার্যের ব্যাপার। তোমার চিত্রাঙ্গদা হতে বাধা নেই। চিত্রাঙ্গদা হও না কেন?

হেসে বললাম: বলেছিলেন এ কথা—চিত্রাঙ্গদা হতে বাধা নেই।

শীলা বলল: ঠিক কথাটা আজ আর মনে নেই, চিত্রাঙ্গদার উপমা দিয়েছিলেন মনে আছে।

খানিক থেমে বলেছিল: কেন বলো তো! চিত্রাঙ্গদার কথাটা বলে বিপাকে পড়লাম মনে হচ্ছে!—আরে, পৌঁছে গেছি যে—

মুখের ভাবটা এতো আনন্দোচ্ছল, মনে হয় যেন অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে এলো শীলা। নিরাপত্তার তটে নবজীবনের কূলে এইমাত্র এসে পৌঁছাল।

বললাম: বেঁচে গেলে এই যাত্রার মতো, কি বলো! ডোবাতে পারলুম না তোমাকে, চেষ্টা করেও!

শীলা বলেছিল: আমায় যে না-ডুবে ভেসে থাকতে হবেই ভাই! আমার বাবার শিক্ষা—আমি অসাধারণ হবো, অসাধারণ হবার জন্যে আমার জন্ম! আমি যে সাধারণের মতো হতে পারি না—হওয়া উচিত নয়, হওয়া চলে না আমার। যে পিতা আমাকে অসাধারণ হবার এতোখানি মালমশলা পুরে দিয়েছেন আমার চরিত্রে, তিনি যে কষ্ট পাবেন! তাতে যদি কষ্ট পাই ক্ষতি নেই। আমি বেঁচে আছি পুষিয়ে নেবো অন্য রকমে! তিনি যে বেঁচে নেই ভাই! অসাধারণ হবার মশলা অসাধারণ থাকবার বারুদ ঠেসে দিয়েছিলেন চরিত্রে। বলেই আজ আমি প্রথম মেয়ে ইঞ্জিনিআর। এ কৃতিত্ব তাঁরই। আমি অসাধারণ, এই বীজমন্ত্রে বেঁচে থাকতে পারব না বাকি বছর ক'টা কি বলো! আমার মনে হয় তোমরা যারা কাছাকাছি আছো তারা অনুগ্রহ করলেই পারব। বাবার কাছে না-দেওয়া হলেও সেই প্রতিশ্রুতি, শুধু উচ্চারণ-না-করা সেই আশ্বাস, পরিপূরণ করতে পারব আমি—

হেসে বললাম: ক্রমশঃ—উত্তরটা ক্রমশঃ দেয়।

মাটি পেয়েছি বোটের নাগালে। বোটের এক ঠেলায় নৌকোটা নরম

মাটির ঘাটে ঠেলে তুললুম। ওদিককার উঁচু গলুইটাকে শুকনো ডাঙ্গা পাইয়ে দিলাম।

বললাম: নামতে পারবে তো! নৌকো থেকে নেমে গডানে পাড়ে উঠতে পারবে তো!

উচ্ছল হাসল শীলা! ভয়ের রাহু মুক্ত হওয়া হাসি। বলল: মুখে মুখে কতোবার ওঠানামা করালে আমাকে দিয়ে—ওঃ! আসবার সময় হাত ধরে টেনে নামাতে পারলে খুব, ওঠাতে পারবে না এবার!—দাঁড়াও—এই ছাখো, নিজে নিজেই উঠছি।

টুপিটা মাথার ওপর বাঁকিয়ে বসাতে বসাতে উঠে দাঁড়াল শীলা। এবং অকম্প্র পায়ে জুতো পবে ওধারের গলুই বয়ে মাটিতে নেমে দাঁড়াল।

বললাম: বীর নারী বটে!—কি অকুতো সাহস, কি সন্তরণ বীর। ইচ্ছে হচ্ছে কি জানো?

ঢালু জমি। ঘাস আর আগাছা দু হাতে ফাঁক করে ওরই মধ্যে এক পৈতে সরু পথ। জলে আচমন করতে নেমেছে যেন। কয়েক পা ওপরে সেই পথের ওপর দাঁড়িয়েছিল শীলা।

শীলা বললে: খারাপ ইচ্ছে নিশ্চয়ই! শুনে কাজ নেই আমার। আচ্ছা, আমরা দুজনেই তো নৌকোটা ছেড়ে যাবো। ডাঙ্গায় থাকব কতোক্ষণ কে জানে! নৌকোখানা নিয়ে যায় যদি কেউ। ভাসিয়ে দিয়ে চেপে পড়লেই হল—

বললাম: কোম্পানীর নাম লেখা, কোম্পানীর সম্পত্তি। কে নেবে?

লক্ষ্য করি নি এতোক্ষণ। ইংরিজিতে যাকে বলে—স্ন্যাপিআরড ফ্রম নো- হয়ার—ঠিক তাই।

ডাঙ্গা থেকে কে একজন বলে উঠলেন: তা ছাড়াও ফুলডোরেতে কেউ কোন জিনিষ নিয়ে পালায় না। থাক না ওখানে পড়ে খোলা জায়গায়। দিনের পর দিন। এ তো নৌকা! সোনার তালই রেখে দিয়ে যান না! ফুলডোরেতে কেউ ছোঁবেও না। দামী জিনিষ হলে বড়ো জোর ভবানী মন্দিরে জমা দিয়ে দেবে! আসুন, আসুন ফুলডোরে সুস্বাগতম মিস মজুমদার—

সম্পূর্ণ বিরলকেশ এক ব্রাহ্মণ। বর্ণ গৌর বটে, তবে উজ্জ্বল গৌর নয়। তাম্রাভ। মনে হয় তপঃ ক্লিষ্ট, সান-ট্যানড। আয়ত চোখের কোল বসা। সারা মুখে বলিরেখা ছড়ানো। নামাবলি গায়ে। পায়ে খড়ম। পরণে তসর। এককালে বেশ ঢ্যাঙা ছিলেন। ঈষৎ কোলকুঁজো এখন।

কাপড় বদলানোর দরকার। লোকের চোখের আড়াল খুঁজছিলাম। কাছে ধারে বড়ো গাছ পাচ্ছিলাম না, যার কাণ্ডের ইঞ্চি কয়েক আড়াল পাই। ইতি উতি তাকাচ্ছিলাম। ব্রাহ্মণ মিস মজুমদারকে বললেন : দেখুন তো—আপনার মাঝি কিছু চাইছে মনে হচ্ছে!

হাতে পাট করা ট্রাউজার শার্ট। শীলার বুঝতে বিলম্ব হল না। মুচকি হেসে বলল : ও কিছু নয়। আমরা এগোই চলুন।

ব্রাহ্মণ বললেন : তা তো হয় না মিস মজুমদার! আমাদের গ্রামে এসে কোন প্রার্থীর কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ থাকতে পারে না তো!

শীলা বলল এগিয়ে যেতে যেতে : চলুন এগোই। ওর প্রয়োজন একটু নিভৃতি।

পিছনে বার কয়েক তাকিয়ে এগিয়ে চলল ওরা।

আমিও আমার বেশ পরিবর্তন করে দু তিন মিনিটের মধ্যেই ওদের ধরে ফেললাম।

ব্রাহ্মণ আমাকে নজর করে শীলাকে শুধোলেন : কে ইনি?

শীলা পরিচয় দিল : প্রোজেক্ট অফিসার মিষ্টার রয়। জাত মাঝি নন বটে, তবে পাকা মাঝি। নৌকো সমেত একজন আরোহী কাঁধে করে পাড়ে পৌঁছে দিতে পারেন—নৌকোডুবি হলে। আমার সহকর্মী—

ব্রাহ্মণ আমাকে স্বাগত জানাতেই আমি সুযোগ পেলাম। বললাম : আপনার পরিচয় জানি না। ভটচাজ মশাই বলেই ডাকি। আচ্ছা ভটচাজ মশাই, আপনার একটি কথার প্রতিবাদ জানাবো। আপনি বলেছিলেন ফুলডহরে চোর নেই। কোন জিনিষ নিয়ে পালায় না। জলজ্যান্ত ইলেকট্রিকের পোস্টগুলো রাতারাতি কি হচ্ছে তা হলে!

বেশ উত্তেজিত হলেন ব্রাহ্মণ, মনে হল। হবারই কথা!

বললেন : আমার নাম গোলোক বিহারী চট্টোপাধ্যায। আদি নিবাস বঙ্গদেশের শান্তিপুর। এখানকার ভবানী মন্দিরের সেবক। আপনাব কথায় বিশেষ মর্মাহত হলাম রায় মহাশয়। চোর বলবেন না এদের। এতোবড়ো অপবাদ কেউ এদের আজো পর্যন্ত দেয় নি। ওটাকে চুরি বলে না—বলে প্রতিবাদ। আপনারা এই গ্রামবাসীদের জিজ্ঞাসা করলেন না। গ্রামবাসী মানেই গ্রামের মালিক—মালিকদের মত পর্যন্ত নিলেন না। আপনাদের ইচ্ছার রথ চালিয়ে দিলেন। কেন বলুন তো, এরা অশিক্ষিত বলে কি

মানুষ নয়! চুরি করলে ইলেকট্রিকের পোস্টের সন্ধানও পেতে পারতেন না আপনারা। এ তো আপনাদের চোখের সামনে পুষ্করতীর্থে প্রতিমা বিসর্জন। যে দেবীকে আমরা আবাহন করি নি—তার পূজা আমরা করব না। এতো অন্যায় কথা নয়!

বললাম: আপনি বেশ একটি বিতর্ক তুলেছেন। এর অনেক কথারই জবাব দেয়া দরকার। গ্রামবাসী মানেই গ্রামের মালিক হোন, আপত্তি নেই। অবশ্যই, মাটি কার, এ নিয়ে সূক্ষ্ম তর্ক আমি তুলব না আপনার সঙ্গে। মাটি হয়তো পৃথিবীর! যে চাষ করে—প্রাণধারণের জন্য সে তার ফসল তুলে নিয়ে যায়, এই পর্যন্ত। পাকাপাকি কায়েমী বন্দোবস্ত ধরিত্রী কারো সঙ্গেই করে না। ইংল্যাণ্ড রাশিয়া কারো সাথেই নয়। ইংল্যাণ্ড কোথাও বাহুবলে মৌরুসী পাট্টা সংগ্রহ করে থাকতে পারে। রাশিয়া মনে করতে পারে, মাটিটাই বুঝি তার। ফসল ফলাচ্ছে দুনো। মাটির পেট ফুটো করে তুলে আনছে তেল—তুলছে সোনা। সোনার তুল্য রকম রকমের ধাতু। মাটির সারফেস থেকে থোরিআম ইউরেনিআম আদায় করছে। আসলে এও স্থায়ী চুক্তি নয়, দীর্ঘমেয়াদী মাত্র। মাটির বা গ্রামের মালিক গ্রামবাসীরা, মেনেও যদি নিই—অন্যগ্রামের, পাশাপাশি গ্রামের, দূর দুরান্তরের মালিক নয় তারা নিশ্চয়ই!

গোলোক চাটুজ্যে বললেন: আমরা তো অন্য কোন গ্রামের ওপর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে যাই নি। চাইও না। আমরা আমাদের নিয়ে থাকতে চাই। কারো খেতে পরতেও চাই নে কারো ধারও ধারি নে!

হেসে ফেললাম, বললাম: আজকালকার দিনে ওই প্রতিবেশিত্ব সবচেয়ে বড়ো কথা। দরজা জানলা বন্ধ করে থাকবেন। আপনার ঘরের আলো বাইরে না বেরিয়ে যায় এই তো? কিন্তু সেই সঙ্গে বাইরের আলো হাওয়াও রুখে দিলেন যে, সে-হিসেবটা রাখলেন না। বাইরের দুনিয়ায় জ্ঞানে বিজ্ঞানে যে বিরাট পরিবর্তন চলেছে, আন্দোলন চলেছে ঝড়ের বেগে, অগ্রগতি চলেছে নক্ষত্রবেগে, তারও সব কিছু থেকে বঞ্চিত থাকলেন কিন্তু!

গোলোক চাটুজ্যে বললেন: আমাদের আপত্তিই তো সেখেনে। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে আসবে সভ্যতা। আর সংস্কৃতির নাম নিয়ে নকল জীবন, শারীরিক আরাম। এবং তার পিছু পিছু জীবনের আর জীবনধারণের নানান অসন্তোষ, হাজারো অতৃপ্তি—

একটানা খানিক খাড়াই উঠে রাস্তাটা এবার গ্রামে ঢুকল মনে হচ্ছে। ছোট খাটো দু একটা বাঁক পড়েছে রাস্তায়। দেখা যাচ্ছে জন ও জনপদ। এইবার রাস্তার এমন একটা মোড়ে এসে পৌঁছেছি যেখান থেকে একটা রাস্তা বাঁয়ে গেছে! একটা চলে গেছে মোটা আর মোটামুটি সোজা-ই। এই সোজা রাস্তাই গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে অনুমান করা কঠিন নয়।

এই মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম: চাটুজ্যে মশাই, আমরা এবার এই রাস্তা ধরব। আপনার সঙ্গে কথা বলে প্রীত হলাম। একমত হতে পারি নি অনেক জায়গায়ই। তা হোক। আপনার মত বা যুক্তিজাল অসার বলে উড়িয়ে দিতেও পারি নি।

দেখি, চাটুজ্যে মশাইও আমাদের সঙ্গই নিচ্ছেন। বললাম: আপনি চললেন কোথায়? আচ্ছা, এ রাস্তাটাই তো ফুলডহর ঘুরে এসেছে!

গোলোক বললেন হেসে: আপনারা কি মনে করেন, লেকের ঘাটে আমার উপস্থিতি একান্তই আকস্মিক? মোটেই নয়। আমাদেরও নিজস্ব সংবাদ-দাতা আছে, বিশেষ প্রতিনিধি আছে। এবং—

আমিও হাসলাম: এবং গুপ্ত সংবাদদাতাও আছে। আমাদের গাঁ থেকে বের না করে আপনি ফিরবেন না মনে হচ্ছে। কি বলেন! আমরা থাকা-কালীন নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

গোলোক বললেন: আপনি বিবেচক, বিবেচনা শক্তি আছে আপনার। তা ছাড়া আপনারা এ গ্রামের অতিথি, আমারও অতিথি সেই হিসেবে। আপনাদের একা ফেলে যাই কি করে?

পরে একসময়ে গোলোকের কথায় মনে হয়েছিল, এই বেড়-দেওয়া পথটায় ওরা সারারাত বহিঃশত্রুর আসা-যাওয়া পাহারা দেয়। পথটি তাই সরু হলেও পরিষ্কার। নিয়মিত পায়ের চলার চাপে ও ছাপে দৃঢ়।

আমি বললাম: একটু আগের কথার পূর্বানুবৃত্তিতে ফিরে যাই চাটুজ্যে মশাই। ওই আলো হাওয়া বন্ধ ঘরে জীবনের আরাম থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে বাস করার যুগ আর নেই। যুগ নেই আর ওই সন্ন্যিসীপনার। আপনারা যদি জোর করে বাস করতে চান এই যুগছাড়া সৃষ্টিছাড়া অচলায়তনে —সারা দুনিয়ার যুগধর্ম আপনাদের বয়কট করে একঘরে করে কোণঠাসা করে রাখবে। দুনিয়ার ক্ষতি নেই তাতে। ক্ষতি যদি হয় তো আপনাদেরই হবে। নকল জীবন কাকে বলেন? কাকে বলেন শারীরিক আরাম?

শরীরটা কি শুধু ব্যারাম দেবার জন্যেই! আর জীবন ধারণে নানান রকম অসন্তোষই যদি না আসে, না আসে যদি অতৃপ্তি—মানুষ নতুন আলো খুঁজবে কেন? আবিষ্কার কি করে হবে নতুন নতুন? সন্তোষ আর তৃপ্তির চোখ বুজে বসে থাকবে যে মানুষ!

শীলা চুপ করে মুখ বুজেই পথ চলছিল এতোক্ষণ। মুখ খুলল এবার: চাটুজ্যে মশাই, কাছাকাছি গ্রামে ঢোকার পথ আছে কোনো! না ফিরে ঐ রাস্তায় যেতে হবে!

আমি বললাম: আর হাঁটতে পারছ না বুঝি মজুমদার! আচ্ছা, চল ফিরেই যাই। তোমার কথাটা খেয়ালই হয় নি আমার।

শীলা বলল: হ্যাঁ সত্যি, আমার হাঁটা অভ্যেস নেই একেবারে।

চাটুজ্যে বললেন: আপনি রাগ না করেন তো, রায় মহাশয়কে নকল জীবন, আর শারীরিক আরামের একটা উদাহরণ দিয়ে নিই।

বলে শীলার হাঁ-না'র অপেক্ষা করলেন না গোলোক চাটুয্যে। বলে চললেন: মা জননী হাঁটতে পারছেন না আর। কারণ অভ্যাস নেই নিজের পায়ে হাঁটার। হয় দু চাকার নয় চার চাকার পা চাই। সেই চাকা-পায়ে হেঁটে অভ্যাস। প্রতিনিয়ত সেই কথা মনে পড়ে গিয়ে পা দুটো অচল করে আনছে। আমার মা ভগিনীরা এখনও দিনে আট ক্রোশ পথ হেঁটে ক্লান্ত হন না। —তারপর শীলার দিকে ফিরে বললেন: এই দুপা এগিয়েই একটা রাস্তা পাওয়া যাবে। গাঁয়ের ভিতর গেছে সেটা। ঘাটে ফিরে যেতে গেলে এই রাস্তাটিই সোজা।

এই সোজা রাস্তাটায়ই ফিরে এসেছিলাম। শীলা একা নয়, আমিও। সানুদেশের ধারে ধারে রাস্তা ধরে সিকিখানা গ্রাম বেড় দিয়েছি। সেই অবসরে যা দেখার দেখে নেওয়া হয়ে গেছে আমার। আশা করি শীলারও। ফুলডহরের টিলাটি বেড় দিয়ে নিয়ে যেতে পারা যাবে। অহেতুক খাটুনী আর পয়সা খরচ। পয়সা খরচের কথা বাদই যদি দিই, ঝঞ্ঝাট কম নয়। যথেষ্ট।

ফিরে তো এলাম। ব্রাহ্মণ ছাড়েন না। তাঁর ভবানী মন্দিরে যেতে হবে। নিতে হবে প্রসাদ। তাঁদের গ্রামে এলে, না খাইয়ে ছাড়েন না। কি করি!

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারা গেল, বেশ খানিক দূর ভবানী মন্দির। ঐ যে দেওদার পাইনের সারি—ঐ সারিটা সরিয়ে ফেললে দেখা যেত। পশ্চিম কোল ঘেঁষে, সানুদেশের উচ্চতম চূড়োয়। ত্রিশূলশীর্ষ মন্দির।

একটা তাল পাওয়া গেল। বললুম : ইনি হাঁটতে পারছেন না আর! দেখতেই তো পাচ্ছেন চাটুজ্যে মশাই!

শীলার পৌরুষে ঘা লাগল। পৌরুষ কথাটা সজ্ঞানে ব্যবহার করছি।

শীলা বলল : আমাদের কাজ তো মিটল না। আরো তো আসতে হবে। এর পরদিন এসে আগে আপনাদের মন্দিরে যাবো—

গোলোক বললেন : কি দেখতে এসেছিলেন? কি দেখে গেলেন বলুন তো। কি রিপোর্ট দেবেন, একটু বলবেন?

আমি কিছু বলবার আগেই শীলা বলে উঠল : কই, রিপোর্ট দেবো না তো কিছু। আপনি বুঝি তাই ভেবেছেন। জায়গাটা বেড়িয়ে দেখে গেলাম। এই মাত্র। রিপোর্টের কি আছে!

কেমন এক অদ্ভুত চোখে তাকালেন চাটুজ্যে মশায়। তাতে নির্ভয় আর ভয় মেশানো। তাতে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের আলো ছায়া। একটি মাত্র কথা তার মুখ থেকে বেরোল—সত্যি!

এতো কারসাজিতে ভবানী মন্দিরে যাওয়ার পরিশ্রমটা রদ হল। কিন্তু প্রসাদ? এক তরুতলে বসিয়ে রেখে কি অদ্ভুত উপায়ে মন্দির থেকে প্রসাদ সংগ্রহ করিয়ে আনলেন—মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যে। সে এক অসাধ্য সাধন।

প্রসাদের সঙ্গে একটি পুরো কাঠ-টগর আর একটির ছিন্নদল ছিল। চন্দনলিপ্ত।

আলাদা করে শূন্য থেকে আলতো ভাবে দুজনের মেলে রাখা হাতে ফুল দুটি ফেললেন ব্রাহ্মণ। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়লেন। বললেন : ভয় নেই আর। কোন বিপদ স্পর্শ করতে পাবে না। যান। পুনরাগমনায় চ—

ব্রাহ্মণ কিছু করেন নি! এমন কিছু অবুঝ, বেশী সংস্কৃত পড়ার দরুণ বাহ্যজ্ঞানহীন এমন কিছু নীরেট হয়েও যান নি! তবু ব্রাহ্মণের হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়ে আনন্দই পেলাম।

আমরা ঘাটের পথে পা বাড়ালাম। উল্টোপথে ব্রাহ্মণও অদৃশ্য হলেন।

হতেই বললাম : কোথাও তো রাখো নি কূলের লেশ। না আছে চুল না আঁচল। এলোকেশী, আশ্রয় দেবে কোথায় এই ফুল? প্রসাদী ফুল, যেখানে সেখানে রাখা চলবে না তো!

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে শীলা বলল : কূলের লেশ নেই বললে কেন?

বললাম : কোথায় তোমার কুল ? লেশ পাই নি আজো। তাই বলেছি। শুধু কুল ? তীর তল কিছুই নেই তোমার।—যাক। মন খোলসা করে বলো দেখি, পাকা মাঝি ডেকে দেবো ? মানে খোঁজ করব ? তাকে নিয়ে তুমি চলে যাও। আমি অন্য কিছু ব্যবস্থা করি—

: রামোঃ—ঠোঁট উল্টে বলল শীলা : এই ছাখো, এলোচুলে পরেছি বিপদভঞ্জন ফুল। নৌকো যদি ডুবেও যায়—শোলার মত ভেসে থাকবো ঠিক। আর তা ছাড়া তোমার বাহু দুটো কি কম জোরালো ? ডুববো কেন ?

: আস্থা আছে এ দুটোয় ?

: এসেছে। নতুন করে এসেছে।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে বললুম : সাবাস অনুপম রায়। লেগে যাও নতুন করে। ভদ্রে, আজ ভাদ্রমাসের সাতাশ তারিখ, বেলা সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর। আপনার আস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব—ভোট অব কনফিডেন্স—তুলে রাখলুম মাথায়। কাজে লাগাব প্রয়োজন মতো।

আবার ভাসল নৌকা।

প্রথম থেকেই মুখোমুখি এবার।

আগের বারের প্রগলভতা নেই আর আমার। আপনা থেকেই গাম্ভীর্য এসেছে।—বাক্যমুখের গুহায় পাথরের মতো। সত্যি, এটা কি বলল শীলা! আমার বাহুতে আস্থা আসছে নতুন করে। কথাটা ভেবে বলল—না, না-ভেবেই। সাধারণ অর্থে বাহু দুটোর ওপর ভরসা রাখার মানে শীলা বোঝে তো! এটা কি ওর কথার কথা ?—মানুষের মনের গহন কি জটিল! মনোরমা জবরদস্তি করেও নৌকো বিহারে নিয়ে যেতে পারল না। আর, শীলা না বললেও নিজে যেচে মাঝিগিরি করছি তার। 'আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকরের' মনোবৃত্তি। কায়িক পরিশ্রম কম হচ্ছে না। তবু এতেও কি আনন্দ!

শীলা বলল : আসবার সময় এসেছিলাম ক' মিনিটে ?

: ঘণ্টাখানেক লেগেছিল বোধ হয়।

: এবারেও যদি তাই লাগে, তা হলে তো বেলাবেলিই পৌঁছে যাবো। না, কি বলো!

বললাম : বেড়ানোর হাওয়া লেগেছে মনের পালে। বলো তো—হুকুম দাও তো, নৌকোর পালেও লাগাই একটু—

: ভেবে দেখি। আগে বলো—কোথায় যাবো আমরা! তার পর—উত্তর।

: আমরা যাবো 'যেথায় কোনো যায়নি নেয়ে সাহস করি।'

শীলা বলল : দুঃসাহস তো কম নয় তোমার! তারপর?

বললাম : তারপর! সোজা। 'ডোবে যদি তো ডুবুক নাকো ডুবুক সবি ডুবুক তরী।'

অকৃত্রিম ভয়ে শীলা বলে উঠল : না না। ওসব বোলো না তুমি। ও অলক্ষণে কথা। ওসব বলা ভালো নয় তা জানো!

আশ্চর্য হলাম কম নয়। বললাম : এই কিছুক্ষণ আগে বলছিলে না—বিপদভঞ্জন ফুল পরেছি চুলে। নৌকো ডুবলেও শোলার মতো ভেসে থাকবো ঠিক—

শীলা মনে হল অসন্তুষ্টই হল। বলল : বলছি না চুপ করতে। আবার সেই কথা!

আমার মনে হল, ড্রইং রুমে বসে ব্যাঘ্র-শিকার সোজা। কার্যক্ষেত্রে হাজারী-বাগে ঢুকতেও হয় না। তার আগেই সমস্ত সাহস—কর্পূর! এও তাই।

না জানতে দিয়েই দক্ষিণ পুবে পাড়ি না জমিয়ে মুখ ফেরালাম লেকের উত্তর পুব কোণে। টের পেল না শীলা। বোধ হয় পিছন ফিরে ছিল বলেই।

টের আমিও পেলাম না তখন, কী দারুণ সংঘর্ষের দিকে মুখ ফেরালাম নৌকোর। ঐ একই সঙ্গে।

খানিক চুপচাপ।

শীলা বলল : চুপচাপ যে! ও মাঝি, বলো কিছু।

: বলব? ভাবছিলাম—হালে যদি তুমি বসতে, বলবার ছিল তা হলে।

শীলা বলল : ও চিন্তার হাল ছেড়ে দাও বন্ধু—এ যাত্রা আর হল না। আচ্ছা, কি বলতে তা হলে শুনি!

: বলতুম? বলতুম—নিরুদ্দেশ যাত্রার মতো, 'আর কতো দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী'!

সুন্দর হাসল শীলা : বেশ তো—আধুনিক যুগে, মেয়েরা বুঝি ইলোপ করে নিয়ে যায় ছেলেদের? জানতুম না তো!

: আধুনিক যুগে পুরোন যুগে পৌরাণিক যুগে একই কাহিনী। তফাৎ নেই কোনো। মেয়েরা প্রত্যক্ষে ইলোপ করার দায়িত্ব আর বদনামটা নেয়

না। বোকা পুরুষকে অক্ষিবাণে সম্মোহিত করে কাজটি করিয়ে নেয়! তার মনের ইচ্ছাটা হাসিল করে নেয় মূর্খ পুরুষকে দিয়ে। এমন সিচুয়েশানের সৃষ্টি করে যাতে পুরুষ বলে ফেলে, চলো পালাই। তার পর, ধরা পড়লে? আমি অবলা! সমাজের হাতে ধরা পড়লে—আমি ন্যাকা! ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানি নে। পুলিশের হাতে ধরা পড়লে? আমার অনিচ্ছেয় মশাই, জোর করে মনোরথে টেনে তুলেছে—

: থাক থাক মাঝি মশায়, ঢের হয়েছে!—আচ্ছা, তোমার এতো রাগ কেন বলো তো মেয়েদের ওপর।

বললাম: দরদের কোন কারণ পেলাম না বলে!

সাড়ে তিনটের শরতের সূর্য। বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না। জানান দিচ্ছে আভাষে। ক্ষয়রোগে ধরেছে। রক্তবমি সুরু করেছে জলে-স্থলে। রোদের চেহারা লাল হবো-হবো।

শীলা বলল: তোমার আর কিছুতে কুলোয না বাপু!—তারপর সুরে বিস্ময় এনে বলল: কোথাও দরদ পাও নি? ঠিক করে বলো তো। বুকে হাত রেখে বলো তো! কাল রাতেও কোথাও দরদের ছোঁয়া পাও নি? মিথ্যেবাদী!

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো শীলা। বলতে লাগল: স্পীডের গতিপথে পিছন ফিরে বসলে কি রকম যেন লাগে! তোমার লাগে না! আমার তো বাপু লাগে।

: বেশ তো! হাল যার হাতে তাকে মুখ ফিরিয়ে বোসো, সাহস থাকে।

: সে সাহস অবশ্যই আছে। থোড়াই কেয়ার করি অমন না-মাঝি না-ইঞ্জিনিআরকে।

: সাহস নেই নৌকো দোলাবার—এই তো! ঘুরে বসতে গিয়ে কেঁপে যায় যদি নৌকো!

: ছাখো, যার যেখানে দুর্বলতা, তাকে সেখানে খোঁচালে—ডিফেণ্ড করার ক্ষমতার অভাবের দরুণই হোক আর যে জন্যই হোক—খুব লাগে তার! আরে, ছাখো ছ্যাখো ঠিক যেন রাজহাঁস। ঐ বুঝি সেই পানসিখানা? আমরা যেখানা ভাড়া করতে পেলাম না!

বললুম: ঐ তো রাগিনী। নদীর নাম 'রঙ্গিনী' থেকে একটি 'এন' বাদ

দিয়ে কাব্য করে পানসির নাম রেখেছে। কে রেখেছে, কে জানে! বেশ রসিক লোক সন্দেহ কি ?

ঘাড় ফিরিয়ে থেকেই বলল শীলা : আমাদের দিকেই আসছে মনে হচ্ছে। বেশ তাড়াতাড়িই আসছে কিন্তু !

: পানসিখানা ভাড়া না পাওয়ায় আফসোস হচ্ছে নাকি তোমার ? আমার কিন্তু হচ্ছে না। স্বাদের জিনিস খেতে চাই জিভের ওপর যতোক্ষণ পারি রেখে। তারিয়ে তারিয়ে। আর বিস্বাদের কুইনিন যতো তাড়াতাড়ি পারি। জিভে না ঠেকে ! পানসি মানে ও তো প্লেন পানসি নয়। মোটর লঞ্চ। তাতে করে হুস করে যাও হুস হুস করে এসো। ভূমিকা অবতরণিকা হতে হতেই নাটক শেষ। তা ছাড়া মোটর লঞ্চে যেন বোরকার ঢাকাঢুকি। আকাশের তলে থেকেও আকাশ না দেখা।

: আহা হা কি নাটক হচ্ছে ! ও কি মোটর লঞ্চখানা কি ঘাড়ের ওপরই এসে পড়বে না কি শেষে ! ও কি কতোবড়ো ঢেউ ! ঐ ঢেউ যদি একখানা লাগে—

শীলা ওদিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলছিল। আমিও ঢেউটার আয়তনে ভয় না পেলেও, সাবধান হবার প্রয়োজন মনে করলাম। নৌকোর সমকোণে বোটেখানা ডানদিকে ফেললাম চওড়া করে। যতদূর বোটেখানা পৌঁছতে পারে ফেলে সমস্তটা জল বাঁধিয়ে টান মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা খোঁচ মেরে নৌকোর মুখ বা নৌকোর অক্ষ ঢেউয়ের লম্বার সঙ্গে লম্ব রচনা করল।

ঢেউ এলো। নৌকোর তলা দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলে গেল। পাশ থেকে এসে ধাক্কা মারতে পারল না। বড়ো ঢেউ পাশ থেকে ধাক্কা মারতে দিলেই হয়েছিল কম্মো। কাৎ করে উল্টে দিত।

ঢেউটা পার হয়ে গেল। আমার দিককার গলুইটা যখন আকাশ মুখো। ও গলুইটা নিচে, তখন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে হয়েছিল—তাই রক্ষে। পোজিশান যখন এর ঠিক বিপরীত ছিল সেই সময় হলেই কোন বিপদভঞ্জন ফুলই বাঁচাতে পারত না। এ যাত্রা ভরাডুবি অনিবার্য ছিল।

কোন কিছু ধারণা হবার আগেই দেখি শীলা আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁপছে ভীরু পাখীর মতো। অল্প হলেই ওর বাহুর চাপে আমার হাত থেকে বোটেখানা খুলে পড়ে যেতো। কি হত তা হলে

জানি না। বোটেখানা কি কাঠের জানি না। সাধারণতঃ অবশ্যই হাল্কা কাঠের হয়, যা জলে ভাসে।

কি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলাম, উপলব্ধি করতে পারছিলাম না। ঢেউটা যখন ঐ গলুইর তলায়, আমার গলুই যখন জল থেকে ইঞ্চি দু তিন মাত্র জেগে, ঠিক সেই সময় হত যদি! মৃত্যুভয়কাতর কবুতরটি জীবনেব আশায় যদি আমার বুকে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজত—তা হলে! হে ভগবান, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি কি আমার ধন্যবাদের অপেক্ষায বসে আছো। ধন্যবাদ পেলে প্রসন্ন হও তুমি!

হে ঈশ্বব! শীলা এতো মূর্খ! শীলা মৃত্যুকে এতো ভয পায়—এতো ভালোবাসে জীবনকে। যাব জন্যে অন্ধ আবেগে একজন পুরুষকে জড়িযে ধবে। আশ্রয খুঁজতে পাবে তাব বুকে! তাই নয, তাব ফলাফল না ভেবে নৌকাডুবিও কবে দিতে পাবে। বাঁচতে গিয়ে বাঁচার আশায মৃত্যুব গুহায ঝাঁপ দিতে পারে। এ-ই শীলা শিক্ষিতা! এই শীলা ইঞ্জিনিআব। সাত সমুদ্র পাব হয়ে ডিঙিয়ে এসেছে তেবো নদী! এই শীলাব সাধাবণ জ্ঞান। এই শীলার বিপদেব মুখোমুখি হবাব ক্ষমতা!

বিবশ হযে সেই অবস্থায বসে আছি। ডান হাতে বোটে ধবা। শীলাব ঝাঁপ খেযে পডাব বেগে বোটে থেকে আমাব বাঁ হাত ছিটকে গিয়েছিল। সেই অবস্থাযই আছি। মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে তখনও নৌকো। বড়ো ঢেউ-যেব পিছনে পাবিষদ ঢেউযেব তাডনায।

এতোক্ষণে হুঁস ফিবে আসছে আমাব। এই যে কালো কালো বেশম চিকন বেশম নবম কালাগুরুব মতো সুগন্ধিগুলো, এগুলো সব কোনো মেযেব চুল। কোটপবা এই যে দুটি-হাত নয়—বাহু লতা। হুঁস আসছে। একটি মেযে আমাকে জডিয়ে ধবে আছে। কাঁপছে ভীরু কপোতী। হৃদপিণ্ড অসহ্য ভযে দুলছে দ্রুতবেগে ধুক পুক ধুক পুক।

শান্ত হলো জল। ঢেউ গেছে পাব হযে। আগেব চেয়ে শান্ত হযেছে শীলাব বুক—ভযেব ঢেউ সবে গেছে। যাবাব আগে সম্মুখ উর্মিব মাথাব ফেনা ফুল পশ্চাৎ উর্মিব মাথাব ফেনা ফুল এক হযে গেছে খানিকক্ষণেব জন্যে। ঢেউ চলে গেলে আবাব ফারাক হযে গেছে। দুটি ফেনা। তারা ক্ষণিক—বুদবুদের সমষ্টি তারা।

ফারাক হয়ে গেছে দুটি পরস্পব লগ্ন বুক। বিপদ এক করে দিয়েছিল।

বিপদ চলে গেল, একতাও চলে গেল। বিপদ আমাদের একত্র করে। হায়রে, যদি কেউ বলে দিত বিপদ আসছে, কিন্তু মৃত্যুভয় নেই তাতে। তা হলে এ বিপদই যে আমার সম্পদ। জন্ম জন্মান্তর থাকি আমি এই বিপদের বাহুলীন।

ঢেউয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ শেষ। জলের ঢেউয়ের সঙ্গে। সেই একই সময়ে আর একটি জায়গায় সংঘর্ষ হলো জোর, তাকে দেখতে পেলাম না। তাই তার শেষও নেই।

এক সময় কখন সে সুখাবেশ শেষ হল, খেয়াল করি নি। আচ্ছন্নের মতো ছিলাম। শীলা সরে গেল। ওর বাহুবন্ধন থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে। কথা বলি নি। যন্ত্রচালিতের মতো মন্ত্রমুগ্ধের মতো সম্মোহিতের মতো বোটে চালিয়ে ছিলাম মাত্র।

তারপর এক সময় কূলের কাছাকাছি এসে পড়তে খেয়াল হল।

বললাম : শেষ হয়ে গেল আমাদের নৌকোয় বেড়ানো। কিন্তু এর রেশের তো শেষ হবে না কোনদিন। অনন্তকাল ধরে এই সুর তরঙ্গ তুলে ফিরবে আমার মনে। কাল রাত্রে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। আরো অসুস্থতার হাত থেকে বাঁচবার জন্য, রাত্রি গভীর হলেও বাড়ী ফিরে গিয়েছিলাম। বেঁচেছিলাম। আজ আর বাঁচতে পারলাম না। তা এরকম মৃত্যু যেন জন্ম জন্মান্তর স্থায়ী থাকে শীলা!

ঢেউয়ের দোল যে রোল তুলেছিল শীলার মনে, কখন মিলিয়ে গেছে তা। শীলা মেয়ে। কাব্য আর বাক্য সযত্নে পরিহার করে ওরা।

যেন কিছুই হয় নি, এমনি সহজ সরল শীলার কণ্ঠ : এঃ—তোমার জামাকাপড় ভিজে সপসপে হয়ে গেছে যে। চলো চলো পা চালিয়ে চলো। বদলানো আশু দরকার।

বলেছিলাম : আমার মাঝি ভিজেছে জলে। ইঞ্জিনিআর তো তোমার কোলে। ভয় কি! সে শুকনো, কারণ সে বাস্তবে বিশ্বকর্মা। মোস্ট প্রাকটিক্যাল ম্যান। কাব্য ঘেঁষতে পায় না তার কাছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

আমি আবার বললাম পিছন দিকে শীলার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। আমার পিছন হলেও শীলার সেটাই সুমুখ। বললাম : দেখছো?

: কী? পানসিখানা নাকি আবার!

: না। জলটা—

: কি বলো তো! জলে কি দেখবো আবার?

: কোন দাগ নেই। কোন তরঙ্গের চিহ্নমাত্র নেই। কিছু আগে ওখানে যা কিছু ঘটেছিল—সম্ভাবনা ছিল নৌকোডুবির—তার নখের আঁচড় রইল চিরকালের মনে। আর আমার মনে। কিছু নেই আর এখন। জলের লিখন—জলেই মিলে গেছে আবার। তক্ষুণি। ঠিক যেন তোমার মন।

হয়তো জবাব দেবার তেমন ইচ্ছে ছিল না শীলার। তবু কথাটা লাগসই, বোধ হয় এই জন্যই শীলা বলল: একদিন বলেছিলে আমার মন আয়না। ছায়া পড়ে তার যে এসে সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু ততোক্ষণই যতোক্ষণ চোখের সামনে, মুখের সুমুখে থাকে সে। তারপরই ভুলে যাই সব।—আর আজ বলছ, জল। তাহলে ঠিক করে বলো কোনটা আমি।

: তুমি? তুমি দুটোই। তুমি খাপ খোলা তলোয়ার। কেটে কেটে বসে যাও। যার মনে দাগ পড়ে, সেই বোঝে। রক্তক্ষরণ হয় তারই। তোমার ঠোঁটেও লাগে রক্ত। তোমার মানে তলোয়ারের। তলোয়ার সে-রক্ত শিকারী পশুর মতো চেটে চেটে খায় অথচ কি নির্বোধ আনন্দে আমরা তোমার চকচকে ধারালো ধারে মুখ দেখতে যাই—খুঁজতে যাই প্রতিবিম্ব।

: মাথায় জল চাপড়াও অনুপম। তুমি ক্লান্ত, তুমি উত্তেজিত। ঘাট এল বুঝি!

বললাম: হ্যাঁ—ঘাট এলো।

আবার পোষাক বদল। মাঝি থেকে আবার ইঞ্জিনিআর।

শীলা আগে আগে। আমি পিছু পিছু। কখনো পাশাপাশি।

সত্যি বোধ হয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল মাথা। নৌকোয় বসে কিছু পূর্বের কথায় নিজেই লজ্জা পাচ্ছি মনে মনে।

সহজ হবার আশায় বললাম: তোমার চুল কি ঘন! আর ওর বাঁকে বাঁকে কি গহন আর কি কালি। বিপদভঞ্জন ফুলটিকে ধরে রেখেছে এখনো। নইলে আজ কি বিপদ যে তুমি বাধিয়েছিলে। দুজনে একসঙ্গে সলিল সমাধি। ইহলীলা সাঙ্গ। তবু লেকের পাড়ে পাওয়া যেত না একজোড়া কেডস আর একজোড়া স্যাণ্ডাল।

চলতে চলতেই শীলা বলল: ভারী বাহাদুরী। তুচ্ছ প্রেমের জন্য সামান্য দেহ মিলনের জন্য দেহের অবসান। ননসেন্‌স। দেহ আছে, একটা

ইন্দ্রিয় একটা সেন্স নয় অনেকগুলো প্রত্যঙ্গ নিয়ে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কাজ। প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কর্মলোক। সকলকে ডুবিয়ে মারা কেন একসঙ্গে। নরজন্মটি ব্যর্থ করে দিয়ে লাভ!

তারপর চলতে চলতে শীলা যা বলল, সেটা ওর বাবার নাম দিয়ে বললেও সে কথায় ওর সায় আছে। ওর মতও ঐ।

বলেছিল: বাবা ঐ ন'হাজারী চূড়ো থেকে এক কথায় শূন্যে পড়লেন। পাকিস্তান দুবছর ঐ টাকা পাঠালো। আর পাঠালো না। তাদের খেয়াল। ইণ্ডিআর সঙ্গে কি খিটমিট বাধল—উলুখাগড়ার প্রাণ গেল। মাস ছয়েক দিল্লী দৌড়াদৌড়ির ব্যর্থতার পর স্থির করে ফেললেন। সবই আমার শোনা কথা। কিছুটা কল্পনা কিছুটা আন্দাজও আছে। আমি তখন বিলেতে। একখানা চিঠি পেলাম। পেয়েই কি রকম স্ট্রাইক করলো—এই বোধ হয় শেষ চিঠি। সাতচল্লিশের আগের ত্রিশ হাজারী, সাতচল্লিশের পর ন হাজারী। অন্ন বস্ত্র না জুটলেও দুবেলা একমুঠো কায়ক্লেশে জুটছিল। তিনটে বুলেটে সত্যম শিবম সুন্দরম এই তিনটিকে শেষ করা যায় না। গড়সে পারে নি। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। রাজা হবার সখ, দুষ্ট তোষণ আর জনকল্যাণের নামে সাধারণের সর্বনাশ সাধন করে আত্মতৃপ্তি—এই কুৎসিত তিনটেকে পারি কি না! আসলে, সত্যি তো আর তিনটে লাগে নি। দুপায়ের বুড়ো আঙুলে দুটো রাইফেলের ট্রিগার, ব্যারেল দুটো থুঁতনির নিচে। ডান হাতে পিস্তল, ডান কানের পাশে। তা লোকের হাতই তো চলে আগে! পা দিয়ে ট্রিগার টানা হয় নি আর একটাও। তার আগেই বাঁ কানের পাশ দিয়ে আড়াআড়ি বেরিয়ে গেছে।

বললাম: অ্যাঁ—বলো কি! অতো রাইফেল বন্দুক জোগাড় করলেন কোত্থেকে?

: সবই বাবার। বাবা নেবেন অন্যের জিনিষ ধার? বিগ গেমের জন্য একটা রাইফেল। পাখীর জন্য একটা। আর পিস্তলটা পার্সনাল সেফটির জন্য। সে কথা যাক্। তার আগের চিঠিতে লিখেছিলেন, অসামান্যা তুমি! অসামান্যা হয়ে সৃষ্ট হয়েছো—এখনো পর্যন্ত অসাধারণ আছো। কোনো কিছুর লোভে পড়ে অদ্বিতীয়তার সিংহাসন চ্যুতি না হয়। নেমে এসো না যেন সাধারণ্যে। অনন্যসাধারণই থেকে যেও বরাবর, এই কামনা করি। এই ভাবেই সৃষ্টি থেকে আজও অবধি চ্যুতি না ঘটিয়ে চলে এসেছো। পা

পেয়েছো নিজের। সামান্য মেয়ের মতো পরপদ নির্ভরতা না আসে তোমার। আমি না থাকলে অসুবিধে হবে না নিশ্চয়। আমি কেন, কেউ না থাকলেও—

আমি বললাম: একে ডেড ডিপারটেড স্বর্গত। তার ওপর তোমার পিতা। তর্কের খাতিরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে না করো তো! একাকী বাঁচা যায় কি? সংসার আর সমাজ জিনিস দুটো তা হলে কি জন্যে? আমি তোমাকে নইলে বাঁচি না, তুমি বাঁচতে পারো না রামা শ্যামা যদুকে না হলে—পারো কি?

শীলা বলল: এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রেম বিবাহ সমাজবন্ধন ইত্যাদি কথা ওঠে। এই বিষয়ে বাবার মতবাদ এতো প্রখর আর প্রবল ছিল, শুনলে চমকে যাবে। এই রকম কথা আর কখনো শোনো নি আমি জোর করে বলতে পারি।

জিজ্ঞাসু তাকালাম শীলার মুখে। এমন একটা সীরিয়স আলোচনা হচ্ছে কিনা পথ চলতে চলতে।

শীলা বলল: বর্তমানে সমাজে বিবাহের যে পদ্ধতি চলছে, তাইতে ঘোর আপত্তি ছিল বাবার। ছিল মানে আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছিল। শেষের দিকে দস্তুর মতো বিদ্রোহের সুর বাজত বাবার কণ্ঠে। সমাজের বিরুদ্ধে দস্তুর মতো কালাপাহাড়ী। বাবা বলতেন, স্ত্রীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করার মনোভাব কেন থাকবে? একটি সংসারের জয়েণ্ট পার্টনার দুজনে। একজন উপার্জন করে আনে আর একজন আনে কল্যাণস্পর্শ। সমান দুজনেই। আপাত দৃষ্টিতে বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হয়। কিন্তু না। তা নয় আসলে। ব্যাক্তিগত আরো সব সম্পত্তির মতো স্ত্রীও সম্পত্তিই। সম্পত্তি যেমন স্থাবর অস্থাবর হয়, হয় আরো দুরকমেরও। যা আমরা কাজে করি, অথচ স্বীকার করি না মুখে। সজীব নির্জীব। কাজেই চলতি বিবাহ পদ্ধতি পালটাতে হবে।

বললুম: যথা—

: তাই তো বলছি, শুনে কানে আঙুল দিতে না হয় তোমার। বিবাহ বলতে কিছু থাকবে না। যে যার সঙ্গে যতোদিন ইচ্ছে বাস করবে। দুজনেরই দুদিককার দরজা খোলা রেখে। যখন অপছন্দ হবে অভাব হবে ভালো লাগার, দুজনেই আবার পথিক। এতে স্বামীর স্ত্রীকে বেঁধে মারার রাস্তা বন্ধ হবে। কাছাকাছি থাকার একমাত্র বন্ধন হবে ভালো লাগা।

: এতে সমাজ-বন্ধন ঢিলে আলগা হয়ে যাবে না ?

: এক্ষেত্রে সমাজ বন্ধন মানে স্বামী স্ত্রীর বিবাহ বন্ধনের কথাই মিন করছো নিশ্চয়ই।—বলে হেসে ফেলল শীলা : অতো টাইট না হওয়াই ভালো। সন্তান জন্ম সংখ্যা বড্ডো বেড়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বেড়ে যাচ্ছে। চাঁদের দেশে পাড়ি জমাতে হচ্ছে, বসবাসের জায়গার আবেদন নিয়ে। তুমি কি মনে করো বহু সন্তান জন্মদান প্রীতি প্রেম ভালোবাসার নিদর্শন! যে দম্পতীর সন্তান যতো বেশী তাদের মধ্যে সম্প্রীতির ঘনতাও ততো বেশী! মোটেই তা নয়। ঠিক তার উল্টো। অবিমৃশ্যকারী অত্যাচারের ফল। স্ত্রীকে ভালো না বাসার ফল। আরো আরো আরো দুঃখের আবাহন। সারাদিন খিটিমিটিতে কাটিয়ে গভীর রাত্রে মিলনকে ভালোবাসা বলে না। বলে পাশবিক উন্মত্ততা। দড়িতে বাঁধা জানোয়ার শিকার।

বললাম : মধ্যবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্তদের আনন্দ লাভের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাদের ক্লাব নেই, পানানন্দ নেই। পয়সা খরচের কোন ব্যাপারেই তার অগ্রসর হবার উপায় নেই। তার আনন্দ আহার নিদ্রা শয়নের তিনটে ফালি দেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। সেটুকুও কেড়ে নিতে চাও তার?

শীলা বলল : আমি নই, বাবা। না তো! সেটুকু আরো বেশী করতে চাই। আহারে নিদ্রায় খরচ করতে যাতে সে আরো বেশী পয়সা পায়, সেই ব্যবস্থা করতে চাই। তাতে করে বেহিসেবী চলা বন্ধ করতে হবে তার। কোনো মেয়েরই দুটির বেশী সন্তান ধারণের অধিকার থাকবে না। এর বেশী হলে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হবে সে। কারণ সে দারিদ্র্য ডেকে আনছে। নিজের স্বাস্থ্যহানি করছে। অসন্তোষের জন্ম দিচ্ছে। এর মানে এ নয় যে, ধরে বেঁধে তাকে আনন্দ বঞ্চিত করে দেয়া। এর মানে এই যে, আরো বেশী আনন্দ পাবার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে তাকে। নিতে হবে অস্ত্রের সাহায্য। এই যুগে বাস করে ষোড়শ শতাব্দীর অজ্ঞান আর কুসংস্কারের অন্ধকারে মুখ লুকোতে দেয়া যেতে পারে না তাকে। এইটে খানিক ধাতস্থ হলে তারপর এরও চেয়ে আরো উন্নততর ব্যবস্থার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। যথা, স্বাস্থ্যবান আর মেধাবী সন্তানের জন্ম হবে ল্যাবরেটরীতে।

মাথা ঝিম ঝিম করছিল। এ রাস্তায় আগে শীলার ইনস্পেকশান বাংলো। পরে আমার ব্যাচিলার্স ডেন। শীলার বাংলোর কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম, বাকি পথটা নিঃশব্দে অতিক্রম করে শীলাকে হাত নেড়ে চিয়ারিও বাঈ বাঈ

করে দিলাম। খাপ খোলা তলোয়ার কম্পাউণ্ডের গেট খুলে ভিতরে ঢুকে গেল।

শীলার কথার গুরুভোজনের ফলে মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। শারীরিক পরিশ্রমও সারাদিন কিছু কম হয় নি।

কিন্তু সেদিন আরো বিস্ময় পাওনা ছিল। আরো মাথা ঝিমঝিম করার কারণ। যার ফলে বিয়ে বিষক্ষয়ের মতন মাথা-ধরাটা ছেড়েই গেল।

ঐ কয়েকটা মিনিট সারাদিনের ঘটনার তিক্তবিধুর অম্লমধুর রসাস্বাদনের রোমন্থন করছিলাম। সেই একই কথা—ভগবানের কাছে প্রার্থনার সময় গুণবাচক বিশেষণ জুড়ে দিতে ভুলে যাই। গোপন মনের স্বপনলোকে অহরহ কামনা করে ফিরেছি এই ক্ষণটি। তাই বলে কি খোলা আকাশের হাজার চোখের তলায়! তাই বলে কি একদিকে নৌকাডুবির বিপদ মুখ-ব্যাদান করে আছে—প্রাণান্ত চিন্তার সেই মৃত্যু-গোমুখীতে বসে বাজাতে চেয়েছি মিলনের ষ্যাকর্ডিআন। ভগবানের কাছে ঘোড়া চেয়েছিলাম, ভগবান দিয়েছেন সেই ঘোড়া। ব্যস। পূর্ণ করেছেন প্রার্থনা।

বারে বারে চোখে অন্ধকার দেখছি। বাঁকা বাঁকা রেশমী অন্ধকার। নাক টেনে নিঃশ্বাস নিচ্ছি গভীর—চেনা দিনের গন্ধ পাচ্ছি হয়তো। চেনা ক্ষণের। হারিয়ে গেছে ইয়ার্ডলির ব্রিলিয়ান্টিনের ল্যাভেণ্ডার গন্ধ। নরম পাখীর বুকের মতো নরম স্পর্শ স্বাদ—কই, নেই তো! হাত দুটো মুঠো বেঁধে দৃঢ় করলাম। বাহুতে অগ্রবাহুতে স্মৃতি বিদ্যুতের চাবুক মেরে গেল!

মোহাবিষ্টের মতো, সম্মোহিতের মতো কয়েক পা এসে মেসে ঢুকলাম।

দোরগোড়ায় দেখি আমাদের শ্রীহরির সাথে বসে গল্প করছে বনোয়ারী। আসে, মাঝে মাঝে গল্পও করে। এক জাত ভাই না হলেও এক জীবিকার তো বটেই!

কিছুক্ষণ পর দেখি—বনোয়ারী এসে আমার-ই ঘরে দাঁড়িয়েছে।

ঃ কি খবর বনোয়ারী?

ঃ দিদিমণি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন আছেন?

ঃ আমি! আমি!—তা ভালোই আছি।

বনোয়ারী বলল ঃ তা হলে একবার ডেকেছেন—বিশেষ জরুরী দরকার।

বিপদের কথা! কাল রাত্রের সমস্ত মিথ্যাচরণে অসম্ভব বিরূপ হয়েছিল

মনোরমার ওপর মনটা। ওঃ—কি সাংঘাতিক মেয়ে! আজ সারাদিন নৌকাবিহারের ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়েছে সেই কথা। আরো তিক্ত, আরো বিস্বাদ লেগেছে মনোরমাকে।

কিন্তু কি আশ্চর্য মানুষের মন!

নৌকাডুবির বিপদ পর্যন্তই মনোরমা তেতো আর শীলা ছিল মিষ্টি। তাবপর শীলার ঠাণ্ডা নিষ্করুণ হৃদয়হীন ব্যবহারের পব কেন কি করে জানি না—চাকাটা প্রায় পুরো আধপাক ঘুরে গেল। হয়তো শীলা তারা-সুদূর। সেই অনুভব নয়, সেই গভীর উপলব্ধিই এই জন্য দায়ী। মনোরমার চিন্তার সঙ্গে যে কুইনিনের তিক্ততা জড়ানো ছিল—শীলার নিষ্করুণ ব্যবহারেব পর থেকে আস্তে আস্তে তাতে পড়েছে যুক্তির চিনি-প্রলেপ। সে যুক্তিটা আব কিছু নয়। সেটা এই যে, মনোবমা যা কিছুই নীচ ব্যবহার করেছে সেটা শীলাব কাছ থেকে আমাকে বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই। শীলাব কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যেই। যুদ্ধ আব প্রেমেব বিষয়ে কিছুই নাকি অন্যায নেই, অসাধু নেই, সেই ইংরিজি প্রবচনের অনুসারী ব্যবহার।

তা হলে ফলকথা দাঁড়াচ্ছে এই—মনোবমা আমাকে চায়।

বনোয়ারীকে বললাম: ভালো আছি মানে, অসুখ বিসুখ কিছু নেই ঠিকই। কিন্তু কাল রাত্রে একবার, আবাব আজ বিকেল থেকে আব একবার—এমন মাথা ধরেছে! তুমি দিদিমণিকে গিয়ে বুঝিযে বলো—কাল সন্ধ্যাবেলা আমি অতি অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করব।

বনোয়ারী বলল: তা আমি গিয়ে বলছি। কথা হচ্ছে, কাল বাত্রে আপনার অসুখের কথা জানেন দিদিমণি। তাই তো আগেই জিজ্ঞেস করতে বলেছেন—আপনি কেমন আছেন!

: তুমি যাও—গিয়ে বলো, আমি কাল তার সঙ্গে দেখা করব। আজ আর পারছি না। তিনি যেন রাগ না করেন।

বেশীক্ষণ নয়—মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এলো বনোয়ারী।

এসে যা বলল তাতে চমকে গেলুম বড়ো কম না।

বলল: দিদিমণি নিজেই আসছেন।

বনোয়ারীকে না বললেও মুক্তকচ্ছ হয়ে দৌড়লুম কয়েক মিনিটের মধ্যেই। সে আগুনের শিখা আসবে কি আমার কুটিরে! সম্মানে আভিজাত্যে ছিটে-বেড়ার ঘর, আমার অফিশিয়াল স্ট্যাটাসের গোলপাতায় ছাওয়া কুঁড়ে।

সেখানে আসবে কি আগুনের শিখা! খোলা প্রদীপের শিখা এসে আগুন লাগিয়ে চলে যাক আর কি!

প্রসাধন প্রয়োজন হয় না মনোরমার। নিজের মনটাকে প্রফুল্ল খুশী রাখতে হয়তো একটু পাউডার দেয় আলতো করে। হয়তো জামাকাপড়ে অত্যন্ত মৃদুগন্ধ পুষ্পসারের সামান্য ছিটে।

আমি গিয়ে যখন পৌঁছলুম, চুলে চিরুনী চালাতে চালাতেই এসে হাজির হল মনোরমা। বেরনোব প্রস্তুতি। ঢুকতে ঢুকতেই বলল: এই যে শুনলুম অসুস্থ! এলে যে! আমি তো বলে পাঠালুম আমিই যাচ্ছি। কষ্ট করে কেন এলে বলো তো।

বললুম: মহম্মদের কাছে আসতে চাইল পর্বত। মহম্মদ ভাবলেন—কি সর্বনাশ! পথে পথে চাপা পড়বে কতো লোক—পর্বত যদি গড়িয়ে গড়িয়ে আসে। কী দরকার। মহম্মদই দৌড়লেন।

মনোরমা হাসলে কেমন যেন সব ভুল হয়ে যায় আমার।

মনোরমা মৃদু হেসে বলল: আমি বুঝি পর্বত, আর তুমি বুঝি মহম্মদ! দেখা যাবে—কেমন তুমি ধর্মপুত্তুর!—ওখানে বসলে কেন? ঈজি চেয়ারটা পাতা আছে কি জন্যে? আরাম করে বোসো—

হুকুম বরদার আমি।

একবার মিনিট দুয়েকের জন্য বেরিয়ে গেল মনোরমা। ইজি চেয়ারে শুয়ে ছিলাম—চেয়ারের পিঠে মাথাটা হেলান দিয়ে।

মনোরমা চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়াল। আমি কিছু বলার আগে দুটি অঙ্গুষ্ঠ কপালের মাঝ-বরাবর থেকে দুপাশে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। টিপে রাখল কপালের দুপাশের শিরা। আবার দুই তর্জনী দুপাশে চেপে রেখে মাঝখান থেকে দুই অঙ্গুষ্ঠ সরিয়ে নিয়ে যেতে লাগল দুপাশে ঈষৎ চাপের সঙ্গে।

মনোরমা বলল: রোজই বিকেলে তোমার এই রকম মাথা ধরতে আরম্ভ করল কেন, বলো তো!

চোখ বুজে আরাম অনুভব করছিলাম। এমন আরাম আছে যা অসুস্থ করে। উপভোগ নয়। অঙ্গুষ্ঠের টানে টানে মনের সেতারে মীড়ের সূক্ষ্ম কাজের মতন। ভগবান জানেন কেন জানি মনে হল—এক পাশের অঙ্গুষ্ঠ মনোরমার, আর একপাশের মনোরমার নয়, শীলার। দুপাশের দুটো টান নয়—দোটানা।

বললুম : ক্ষয়রোগ ধরেছে যে! তটের তলায় তলায় খেয়ে চলেছে। ভেঙে পড়বে কোনদিন!

উদ্বেগের সুরে হা হা করে উঠল মনোরমা : ছি ছি, অমন কথা বোলো না। বালাই ষাট—মুখে আর কিছু আটকায় না।

: ক্ষয় রোগ কি শুধু শরীরেই হয়? পচন লাগে শুধু ফুসফুসে! মনে হয় না বুঝি!

দুপাশের দুটো বিপরীত স্রোত—ধলেশ্বরী শীতলক্ষা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে দুরঙা জল! দুটো বিপরীত স্রোত এক জায়গায় মিশে ঘূর্ণীপাক রচনা করে চলেছে। আমি তলিয়ে যাচ্ছি—একূল ওকূল—দুকূলই ভেসে যাচ্ছে হৃদয়ের! আশ্রয় পাচ্ছি না কোন কূলের। আঁকড়ে ধরতে পাচ্ছি না কোনটাকেই;

: কেন, তোমার কিসের অভাব? ধন, জন, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা—কিসের অভাব?

চব্বিশ ঘণ্টাও হয় নি। প্রায় একই সিচুয়েশান। সেটা নরম সোফা, এটা ঈজি চেয়ার। একটা কালো জহর—ঠাণ্ডা। সেবনে জ্বালা। নিশ্চিত মৃত্যু। আর একটা দূর থেকেই জ্বালা। সেবন পর্যন্ত এগোতে হয় না। দূর থেকেই তাত লাগে, হাতে মুখে মনে।

: না অভাব নেই। এতো বেশী পাচ্ছি—হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পাচ্ছি না। উপচে পড়ে যাচ্ছে। আমার মতন ভাগ্যবান কজন রমা?

কালও এমনি মাঝে মাঝে মুখে এসে পড়েছিল আবাধ্য চুল। শাসন না মানা ল্যাভেণ্ডারের বন থেকে আসা! আজও এসে পড়ছে। সতর্ক চুল। হয়তো শাসন না করা। জবাকুসুমের গন্ধ নিয়ে।

কাল ভুল করেছি। আজ ভুল করব না। এ আমি প্রথম থেকেই ভেবে নিয়েছি।

ধীরে ধীরে বলে চলল মনোরমা : তোমার কাছে অপরাধ করেছি একটা মাপ চেয়ে নিচ্ছি সে জন্যে।

আমার মনও তখন ভালো লাগার তারার সপ্তমে বাঁধা।

বললাম : তুমি করেছ বলছ— আর, আমি করতে পারি। সম্ভাবনা আছে। যদি করি, তুমিও মাপ করো—

মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগল মনোরমা : সে কি রকম? জানোই যদি অপরাধ—করবে কেন তাহলে? জেনে শুনে—

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম ঃ একধরণের কাজ আছে চুরির মতন। জানছি কাজটা অন্যায়, লোভের বশবর্তী হয়ে না করে পারছি না। যেমন—

মাথার ওপর দিয়ে হাত দুটো উঠিয়ে মনোরমার মুখখানা টেনে আনলাম। তৃষার্তের মতো চার পাঁচবার তৃষ্ণা মেটালাম। ওর গালে চোখে কপালে আমার ওষ্ঠাধরের তপ্ততা লেগে না থাকলেও সমস্ত মুখটাই তপ্ত হয়ে রইল। হৃদপিণ্ডের সবটা রক্ত মুখে এনে দিল। মুখখানা টকটকে লাল হয়ে রইল। ঠিক সিঁদুরের মতো।

তৃষ্ণা মিটল, না বাড়ল—বোঝার আগেই মনোরমা আলগা করে নিল নিজেকে। একটু জোরের সঙ্গেই।

চোখ বুজে ছিলাম। পায়ের আওয়াজে চোখ খুলে দেখি মনোরমা ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

চোখ বুজেই রইলাম। মিনিট কয়েক পর আবার পায়ের আওয়াজে বুঝলাম মনোরমা এলো। বুকটা গুরগুর করছিল আশঙ্কায়। আয়ীমা এসে হাজির না হন। চোখ খুলে মিলিয়ে নেবার ইচ্ছা থাকলেও সাহস ছিল না। যা হবার হোক—চোখ খুললাম না। গত আঠারো কুড়ি ঘণ্টায় আমার শরীর মনের ওপর তিন তিনটে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল। সমস্ত কিছু ওলোট পালট করে দিয়ে গেল। আমার ন্যায়-অন্যায় বোধ, সুনীতি-দুর্নীতি, আমার বিচার ক্ষমতা—সব কিছুর ওলোট পালট হয়ে গেল। সংস্কারের শ্যাওলা ধরা মাটির 'সারফেস' শ্যাওলা সুদ্ধু তলায় তলিয়ে গেল কতো জায়গায়। ভিতরে নবজীবনের আশ্বাসে প্রোজ্জ্বল কাঁচা মাটি উঠে এলো ওপরে। এ মাটির সোঁদা গন্ধই আলাদা। এ মাটি দেখলেই বোঝা যায় এর নিজের প্রাণ আছে। প্রাণ দেবার ক্ষমতাও আছে। সরস, প্রাণের রঙের স্বাক্ষর বহা।

বুঝলাম, মনোরমা এসে বসল একটু দূরে। একটা চেয়ারে।

চোখ খুললাম। মুখখানা দেখা চাই। কতোখানি রুষ্ট, দেখা দরকার। এক গুছি চুল আঙুলে জড়াচ্ছে খুলে ফেলছে। সাপের লেজের মতন ডগাটা তাকিয়ে দেখছে নিরীক্ষণ করে। আবার জড়াচ্ছে আঙুলে!

আমার অনভিজ্ঞ চোখে ভাবান্তর লক্ষ্য করতে পারলাম না। শুধু অসম্ভব গম্ভীর—

আমার অপরাধটা বলার দরকার হল না—ক্রিয়ায় ঘটেই গেল। কিন্তু মনোরমার অপরাধটা কি, জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল ভারী। কিন্তু সে আবহাওয়া আজ আর ফিরবে কিনা জানি না।

মনোরমা থেকে এতোদূর ভৌগোলিক দূরত্বে বসে আমিও আদৌ তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। হয় ঘনিয়ে বসি, নয় চোখের আড়ালে চলে যাই। চোখের আড়ালই শুধু নয়—সম্ভাবনার আড়ালেও। সেই দূরত্বে না গেলে স্বস্তি পাবো না।

বললাম: আমি আজ উঠি।

মনোরমা নিচের দিকে চেয়ে রইল। উত্তর দিল না।

সেদিন বুঝি নি ছেলে মানুষ ছিলাম। উত্তর না দেওয়ার অর্থটা আজ বোধহয় বুঝি। ওর একটাই অর্থ নয়। যেটা সেদিন আমার মনে হয়েছিল। আমার কাজের অনুমোদন ছাড়া আর কিছুই নয়। আরো অনেক অর্থ হতে পারে চুপ করে থাকার। নিজে থেকে চলে গেলে আমি কি বলব! আমি কি বলবো আরো থেকে যাও।

আমিও চলে এলাম।

পথে নেমে দেখি—সন্ধ্যা তখন আলো জ্বালছে তারায় তারায়।

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। গেলেও হেথা-হোথা খানা-খন্দে জল জমে ছিল। তাও শুকিয়ে গেল একদা। আজকাল প্রায় সর্বত্রই জীপ চালানো চলে।

আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় রাস্তায়। পথে পথে। পথে বিপথে—

শীলাই পরদিন মনে করিয়ে দিল। ফুলডহরের উপর আমাদের জয়েন্ট রিপোর্ট! উত্তরে হেড কোআর্টার্স যা নির্দেশ দিয়েছে, সেইভাবে তৈরী করতে করণীয় বাকি আছে কিছু।

মুখের কথা নয়। লাইন ঘুরিয়ে নিয়ে যাবার পাকা এস্টিমেট চাই। প্রাইসড এস্টিমেট।

জীপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। জায়গাটার মানচিত্র পরিবর্ধন করলাম। এইবার সেই নীল ছাপে পেন্সিলের দাগের খুঁটি বসাতে হবে। অনুমোদিত হলে পেন্সিলের দাগের জায়গায় আসল খুঁটি বসবে একদিন।

দুদিন জীপে বেরিয়ে বেড়ালুম ফুলডহরের টিলার পায়ের কাছ দিয়ে দিয়ে।

তৃতীয় দিনে ড্রইং ট্রেসল, টি-স্কয়ার, বোর্ড নিয়ে বসলাম। সেণ্ট্রাল ওআর্কশপে আমাদের অপিস থেকে শপে যাবার মধ্যে দুখানা ঘর। তার প্রথম খানা ড্রইংয়ে, তত্ত্বে-তথ্যে, ফাইলে-রেকর্ডে বোঝাই। কেবিনেটে আল-মারিতে ঠাসা। দ্বিতীয়খানা যন্ত্রপাতির গুদাম।

প্রয়োজন বোধে প্রথমখানায় নক্সা আঁকার টেবিল পড়ে। ছবি আঁকাব পূর্বে হিসাব পর্ব। তাই করছিলাম. এই পর্বটি বিরাট।

ওআর্কশপে যাবার পথে আমার ড্রইং টেবিলে ঝুঁকে পড়ে হিসাবের ব্যাপারটা দু-একবার দেখে গেছে শীলা। মন্তব্য করে নি।

ওআর্কশপের কাজ নিয়ে খুব মেতে গেছে আজকাল।

একখানা টেয়্‌লরের জিব ক্রেন জিরাফ গলা খাটো করতে পারছিল না আর; অথচ বিগড়ে গেছে। ওআর্কশপে ঢুকতে তাকে হবেই। সেইটিকে ঢোকাবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছে সবাই। উপস্থিত সবাই নানারকম উপদেশ নির্দেশ দিচ্ছে। এই উপদেশ নির্দেশ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় নয় কেউই। অন্ধকারে আন্দাজে ঢিল ফেলছে টুপ টাপ।

শীলা যেটুকু বলছে নিশ্চত হয়েই বলছে। আর সে নির্দেশ মানতে বাধ্য হচ্ছে ড্রাইভার।

ছবি আঁকতে আঁকতে হাঁক ডাক শুনছিলাম। এই সব মেরামতের বিষয়ে আমাদের করণীয় কমই। সাধারণত রাস্টন-বুসীরাস আর টেয়্‌লর। এই দুটো কম্পানীরই যাবতীয় ক্রেন জাতীয় গাড়ী আর হলেজের যন্ত্রপাতি। তারা মেকানিক রেখে দিয়েছে নিজেদের। সারাই করিয়ে নেয় তারাই। সারাই যন্ত্রপাতিও তাদেরই। মেশিন প্রয়োজন হয় অনেক সময়। লেদ, ড্রিল, গ্রাইণ্ড। এ সব মেশিনের প্রয়োজন ঐ সব মেরামতী কাজের সঙ্গে ওত-প্রোত ভাবে জড়ানো।

পাওআর স্টেশনের ইমারৎ তৈরী তো করেই সম্পূর্ণ! টারবাইন, অলটারনেটার, ট্রানসফরমার, সুইচ গিয়ারের প্রায় সব উপাংশই পৌঁছে গেছে। সব কোম্পানীরই নিজ নিজ প্রতিনিধি আছে। বসাচ্ছে তারাই। আমাদের কাজ—কনট্রাক্টের চুক্তি মাফিক তারা জিনিষপত্র দিচ্ছে কিনা তার খবরদারী করা।

এক ধরণের জিনিষ আছে যা তৈরীর সময় উপস্থিত না থাকলে ধরা পড়ে না। ধরুন, কংক্রিটে বালি সিমেণ্ট চুণের অনুপাত। সিমেণ্ট ঢালা হয়ে

গেলে, কংক্রিট জমে গেলে বোঝা অসম্ভব তিনে এক হিসেবে দিল, না পাঁচে ছুই-ই দিল। এখন তো চলে যাবেই। ফাটও ধরবে না, ধরাও পড়বে না। সিমেণ্টের অংশ কম থাকলে চার পাঁচ বছরের মাথায় প্রথম চুল-সরু ফাটল। তারপরে জল-গলা ফাঁক। তখন তো কনট্রাকটারকে পাওয়া যাবে না আর—

বর্ষা শেষ। খোলা জায়গায় সমস্ত ঢালাইয়ের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে পুরোদস্তুর।

আর শালারও নীরব ব্যস্ততার শেষ নেই। কর্তব্যপরায়ণতার অন্ত নেই। কর্মজগতে কর্মলীন হয়ে আছে। নাইবার খাবার অবকাশও পাচ্ছে না।

ওদিকে চন্দ্রশেখর চৌধুরী! চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন দিন-রাত। হ্যাঁ, রাত্রেও। এখানে ওখানে কংক্রিট মিক্সারের ঘর্ঘর। নিউম্যাটিক ড্রিলের খটখট। কোথাও ডিজেল চালিয়ে ইলেকট্রিক উৎপাদন করে হাজার ওআটের একাধিক বাতি জ্বলছে। কোথাও—সেণ্ট্রাল ওআর্কশপের কাছাকাছি হলে—মোটা মোটা তার নিয়ে যাওয়া হয়েছে। টেম্পোরারি বাতি জ্বালাতে! দিনে সূর্যের আলো, রাত্রেও সূর্যপ্রতিম বিজলী বাতি। চলাচলের পথ যেখানে বন্ধুর—পাথর ছড়ানো, উঁচু নিচু অসমতল—ইলেকট্রিক না থাকলেও নিদেন হ্যাসাগও আছে।

চন্দ্রশেখর চৌধুরীর সিসিকোর কাজের ফাঁক ও ফাঁকি ধরবার খবরদারী আমাদের। অবশ্যই যদি ফাঁকি থাকে কিছু। সিসিকোর কাজে ফাঁকি থাকে না। থাকলেও না হয় একটু চক্ষুলজ্জার ব্যাপার থাকতে পারত। তার ছোট খাটো বিল পাশের মালিক মজুমদার। বড়ো বড়ো বিল পাশের অনুমোদনকারী শীলা।

দিবারাত্রি কাজ আর কর্মব্যস্ততা। এটা চাই ওটা কই-র হৈ হৈ!

ড্যাম তৈরীর কাজ শেষ। এ বর্ষায়ও জল পাশের খাদ দিয়ে বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগামী বর্ষায় চালু হবে ড্যাম। এ বর্ষায় তৈরী ড্যামের দোষ ত্রুটি দেখে নেওয়া হবে।

আমাদের পাওআর হাউসে কলকব্জা বসানো হয়ে গেলে আগামী বর্ষায় ঐ একই সঙ্গে গ্রিড সিস্টেমে পাওআর দেওয়া হবে। তোড় জোড় চলছে তার। প্রস্তুতি চলছে। খুব আশা করা যাচ্ছে, হয়ে যাবে।

অর্ধেকের ওপর কল তো বসেই গেছে। বাকি শতকরা পাঁচ-সাত ভাগ মেশিন রওনা করে দিয়ে মরলি সাহেবও রওনা হবেন আগামী মাসে। সাহেব

এলে কম্পানীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে একযোগে যতোটা কাজ হয়েছে পরখ করে বাকি যন্ত্রপাতি বসানো হবে। সেইগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেগুলিই রেখে দেওয়া হয়েছে মরলির জন্য।

কাকটা উড়ল বলেই যে তালটা পড়ল, এমন সঠিক নিদর্শন আমার হাতে নেই। নৌকাবিহারের পর শীলা কাজে মেতে গেল। এমন কি গভীর রাত্রি পর্যন্ত আপিসে বসে কাজ করত। ওআর্কশপে নাইট শিফটে লোকের সংখ্যা বেড়েছে অনেক। দিনরাত সেখানেও চলছে কাজ। কাজ আগে যদি চলত পুরোদমে—এখন চলছে পুরোতর দমে।

প্রয়োজনবোধে উঠে উঠে যায় শীলা। যেখানে কাজ চলছে পাওআর হাউস নির্মাণের, ঢালাইয়ের। দিনে আগেও যেতো, রাত্রেও যেতে সুরু করেছে আজকাল। অবশ্যই কাজ হচ্ছেও বটে!

এই রাত্রে কাজের জায়গায় যাওয়া নিয়ে অনেক আপত্তি অনেক নিষেধ করেছি। বলেছি—পথ অনেকটা। অনেকাংশে দুর্গম, অনেক জায়গায় বিপদেরও। অধিক ক্ষেত্রে অন্ধকার। যুক্তি দেখিয়েছি, সন্ধ্যাবেলায় সারা দিনের ক্লান্তি শেষে মজুরেরা হাঁড়িয়া খায়, তাড়ি খায়, নেশাভাঙ্ করে। তখন তাদের কাছে যুক্তি আশা করা যায় না। আশা করা যায় না বিচারবোধ। বুঝিয়েছি, রাত্রি অন্ধকার রাস্তা দুর্গম। পথে পথে পাথর, গুপ্তসর্পও আছে, গূঢ়ফণাও আছে। বন্ধুর পথ। শরীরের সম্ভ্রমের চড়াই আছে, মজুরদের অসতর্ক আচরণের উৎরাইও আছে। রাতবিরেতে, তুমি মেয়ে—এই রকমের বিপদের জায়গায় যাওয়ার দরকার? হেসে বলেছে উত্তরে—মনটা যে পাথরের মতো, টের পাওনি এতোদিনেও! মন চালায় দেহকে। ওটাও প্রায় পাথরের মতো হয়ে এসেছে। দু-এক ঘা লাঠি ছোরা সামলাতে পারব। মা ভৈঃ—

আগে শালার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিকে পাঠাতুম লাঠিয়াল করে। দুশ্চিন্তাকে পাঠাতুম পাহারাদার। ফিরে না আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তার কাঁটা আমাকেও বিঁধত। আজকাল নিজেকেই পাঠাই পাহারাদার। ও দুশ্চিন্তা দুর্ভোগের চেয়ে ঢের ভালো কয়েক ফারলং হাঁটার কষ্ট!

সারাদিন জীপ নিয়ে ঘোরাঘুরি করি। দিনশেষে আপিসে এসে মিলি। কাজে কাজের কথায়, সাইটের সুপারভিশানে টেরও পাই না, ঘড়ি কখন ছোট হাতে নটা বাজিয়ে রেখেছে। বিকেল থেকে চায়ের অন্ত নেই। অফিসে

বসেই ঘড়ি ঘড়ি চা হচ্ছে। হাতের কাছে এনে রাখছে। খেয়ে নিচ্ছি। শীলাও আমার চেয়ে চা কিছু কম ভালোবাসে না।

এমনি করে নৌকোবিহারের পাঁচ দিন পর পর্যন্ত রাত দশটা সাড়ে-দশটার আগে আমার আমিকে খুঁজে পেলুম না। খুঁজে পেতুম যখন, তখন মনোরমাদের বাড়ী যাওয়াটা দারুণ অসময়। শরীর ক্লান্ত—খাবার অবকাশ দিতে চাইছে না ঘুম। ভারী দু পা রাখছে চোখের পাতায়।

তারপর শনিবার এলো। অন্য দিনের সঙ্গে তফাৎ পেলুম না খুঁজে। সেই রাত নটা।

পরদিনটা রবিবার। শনিবার জীপ থেকে নামতে নামতে শুধোল শীলা ঃ কাল কটায় বেরোচ্ছ? একটা মাস রবিবার নিয়ে কি হবে আর! কি বলো? রাজি?

বললুম ঃ সো শিওর। দাই উইল বি ডান—

রবিবার বিকেলের দিকে, দয়া করে হেড অপিসের করসপণ্ডেন্স থেকে মুখ তুলে তাকাল শীলা। বলল ঃ এল টাউনে নেমন্তন্ন আছে বলছিলে না?

রবিবার দিনটা শীলা আজকাল হেড অপিসের চিঠি পত্তরের জবাবের জন্য তুলে রেখেছে। স্টেনোও আসে শীলার। সে ভদ্দর লোক সুবিধে মতো হপ্তার একটা দিন রবিবার করে নেন। শীলা নোট দেয় ভালো। ইংরিজির দিক দিয়ে অসুবিধে নেই। বেশ ভালো চলতি ইংরিজি, সাহিত্যের ইংরিজি। কিন্তু মিষ্টি হওয়ার চেয়েও অপিসের চিঠি হওয়া দরকার—ঋজু, যুক্তিপূর্ণ, বক্তব্যে জোরদার। আসল কথাই এখানে—যুক্তি।

সেদিক দিয়ে শীলার মুসাবিদা পছন্দ নয় আমার। নানা কথার ভিড়ে মূল যুক্তিতে অনুরূপ জোর পড়ে না। বক্তব্য ঢাকা পড়ে যায় কতকাংশে। কাব্য হয়, বাক্য হয় না।

একদিন একখানা চিঠির খসড়া পড়ে চুপ করে ছিলাম। মুখের ভাব দেখে বুঝেছিল শীলা, মনঃপুত হয় নি আমার। বলেছিল, তুমি হলে কি লিখতে রয়? বলেছিলুম—লিখে দেখিয়ে ছিলাম। ভালো লেগেছিল—খুব ভালো লেগেছিল শীলার। এতো ভালো লেগেছিল, সেই থেকে প্রত্যেক চিঠি ড্রাফট করি আমি। আলোচনা করে নিই দুজনে। তারপর স্টেনোকে ডিকটেশান দিই আমিই।

শীলার সইয়ের জন্যে পাকাপাকি ছেপেই নিয়ে যায় স্টেনো।

শীলার প্রশ্ন শুনে নিরুপায় চোখে দয়া-ভিক্ষার আরজি ছলছলিয়ে দিলাম।

বললুম: তোমারও তো আছে। আমার কাজ শোনার, তোমার কাজ যে শোনানোর।

: মনে করে দিলে না যে! ভুলে যেতুম যদি!

কাতর কণ্ঠে বললাম: তুমি সেদিন বললে—ছলে ছুঁতোয় পালাতে চাই কেবল আমি।

হেসে, কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল শীলা: চাও-ই তো। পালিয়ে গেলে মস্তিষ্ক অলস হয়ে যায়। আর সেই অলস মস্তিষ্কে শয়তানের কারখানা খুলে বসে থাকো! দেখছ না, কায়দা করে কেমন আটকে রাখছি তোমায় আজকাল। কাজের কাজ করাচ্ছি।

খানিক থেমে আবার বলে চলল শীলা: কি হবে ওসব ভেবে বলতে পারো? শরীর নষ্ট, মন নষ্ট, অবসর নষ্ট, কাজের কাজ নষ্ট। হৃদয়ের ও বৃত্তিটিকে প্রশ্রয় দিয়েছো কি মরেছ! মাঝখানে তোমার পাল্লায় পড়ে আমার মাথাটিও খারাপ হতে বসেছিল আর কি।

বললুম: তা তো হল। আজকের সভায় তোমার ডাক পড়ল কেন? তুমি কি বোঝ যে তুমি বলবে?

: যথাসময়ে শুনতে পাবে। আগে থেকে বলে বাজেট লিকের দায়ে পড়ি আর কি! চলো—উঠি। কটা হলো?

শহরের মধ্যে শ্রমিক বসতির কাছে ফ্যামিলি প্ল্যানিংএর কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। অনেকের সঙ্গে আমারও নিমন্ত্রণ হয়েছে উদ্বোধন উৎসবে। আর আশ্চর্য। অনেকের মধ্যে বিশেষ একের নিমন্ত্রণ হয়েছে উদ্বোধন করত। সে হচ্ছে মিস শীলা অর্থাৎ কুমারী শীলা মজুমদারের।

আর এ ব্যাপারে মত দিয়েছে শীলা। উদ্বোধন করতে রাজী হয়েছে এক কুমারী মেয়ে। বিলেত ফেরৎ এক ইঞ্জিনিআর মেয়ে।

লোকলজ্জার বালাই নেই, লোকনিন্দার পরোয়া নেই।

মিটিংএ যেতে যেতে যাবার পথে ঘুরিয়ে উল্লেখ করেছিলাম কথাটা।

: খেয়াল তো করো না! একি তোমার ক্লাব, সাহিত্য-সভা, নতুন নাটক অভিনয়, টেনিস-কম্পিটিশান উদ্বোধন করা? বিষয়বস্তু যাই হোক, ডাকলেই যেতে হবে?

: সার্টেনলি নট। কক্‌খোনো নয়। তুমি কি মনে করো, কারো বিশ

নম্বর ছেলের ভাতে নেমন্তন্ন করলে যাবো আমি! আজ যে কাজে যাচ্ছি নিশ্চয় তা নোবল কজ। অন্ততঃ আমি তাই মনে করি। মনে করি বলেই রাজী হয়েছি। অমনি রাজী হই নি।

: তুমি মেয়ে, দু একটা জায়গায় মনে রাখলে ভালো হয়। অন্ততঃ দুটো একটা জায়গায়—

: রাজকুমারী অমৃত কাউরও মেয়ে। যতোদূর জানি পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ উৎসাহী। আমি মেয়ে এটা ভুলে থাকলে স্বস্তি পাই ভাই। ভুলেই ছিলাম। সেই উড়িষ্যার এক জায়গায় কলেজ থেকে যখন ক্যাম্পে যেতে হল, সেই থেকেই। একটা বাজার চলতি উপমা দিয়ে বলি। গির অরণ্যে এক অবণ্য কন্যা পাওয়া গেছে। সিংহ সিংহীব সঙ্গে এক গুহায় থাকে। অদ্ভুত ভাষা বলে। কোনো অভিধানে তাব শব্দাদি পাওয়া যায না। পাওয়া যায সিংহদেব উৎকট শব্দকোসে। জটা পড়ে গেছে চুলে। বসন ভূষণ, বলা বাহুল্য, নেই। বস্ত্রেব সঙ্গে পবিচয নেই, মানুষের খাদ্যাদি রোচে নি তাব। আমি যেন সেই জাঙ্গল গার্ল। গভীব বাত্রে ক্যাম্পে অদ্ভুত কিছু পরিস্থিতিতে জেগে উঠে দেখেছি—সিংহেব চোখ একজোড়া। সিংহের, বাঘের, শিযালেব হযতো বা গাধাবও। এক একদিন এক এক-রকম। প্রায প্রতি বাত্রেই। সে যে কতোদিন। একদিন বাত্রে তো মেইন ফিউজ কেটে দেয়া হল। সেই বোধ হয় জালাতনেব শেষ। অন্ধকাবে দেখি একাধিক জোড়া কপিশ চোখ জ্বল জ্বল কবে জ্বলছে।

: সিংহ অত্যন্ত হিংস্র জানোযাব, বাঁচলে কি কবে?

: আঁচড় কামড় লেগেছিল দু-এক জাযগায়। গাযে লেগেছিল। ওগুলো মনে লেগে থাকে না আমাব। লেগে থাকতে দিই না। বললুম—ক্রিওজোট নিযে শুই আমি। অন্ধকাবেও মুখ আন্দাজ কবে মাখিযে দিতে পাববো। যেসব বেহায়া মুখপোড়াদের মুখ কিছুতেই পোড়ে না, তারাও কিন্তু কাল সকালে পোড়ামুখ নিয়ে বেরোতে পারবে না—বলে বাখছি। রোজ রোজ কি একই রাস্তা চলত! সিচুয়েশান বুঝে দাওয়াই—। বিলেতে দু একজন মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে, আমি মেয়ে। তাদেরও বুঝিযে দিয়েছি তাদের চোখই ভুল—আমার শরীর নয়।

আর আশ্চর্য! মিটিংএ গিয়ে বললোও তাই। সঙ্কোচের বিহ্বলতা নেই কোথাও।

কৃষ্ণমূর্তি সভাপতি। সেই হা হা হাসি। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এই :

আমাকে সভাপতি করেছেন কেন জানি না। আমার চৌদ্দটি সন্তান। পরিবার পরিকল্পনা আইডিয়াটা অত্যন্ত ভালো। কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে কতোখানি খাপ খাবে বলতে পারি না। কতোদিনে মা-বোনেরা এর উপকারিতা বুঝতে পারবেন জানি না। পরিবারের সেই অন্তঃপুর পর্যন্ত পৌঁছতে কতোদিন লাগবে কে জানে ?

সভাপতি জানালেন না কিছুই। সবই তার কাছে ধোঁয়া আর আভাষ। একটি নিঃসন্দেহ সত্য আছে—যেটি তাকে কেন সভাপতি করা হয়েছে।

উদ্বোধন করতে আহ্বান করতে, উঠে এলো একটি কুমারী মেয়ে। তার বক্তব্যে অস্পষ্টতা নেই কোথাও।

'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার কেন নাহি দিবে অধিকার।' সবলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা। কবির বয়স তখন ছেষট্টি সাতষট্টি। কবির নয় দ্রষ্টার। উনিই ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সের চোখ নিয়ে মেয়েদের হয়ে ওকালতি করেছিলেন। পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া। ওসব পুজো-টুজো নয়। চল্লিশ বছর বাদে সবলাতে বললেন—কভু তারে দিব না ভুলিতে মোর দৃপ্ত কঠিনতা। বললেন—ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার। ডাক দিয়ে গেলেন—শুধু কি চাহিব শূন্যে কেন নিজে নাহি লব চিনে সার্থকের পথ। আপনারা নিজের সার্থকের পথ চিনে নিন। যদি মনে করেন পুরুষ দুবেলা দুমুঠোর হাঁড়িকাঠে ফেলে আপনাদের বারো-চৌদ্দবার বলি দেবে আর এইটেই নারী জন্মের সার্থকতা—তা হলে আমার কেন, কারোরই বলবার নেই কিছুই। আধুনিক যুগে বাস করে ভগবানের করুণা আশা করে শুধু শূন্যে চেয়ে থাকবেন ? আর প্রত্যেক-বার সন্তান-সম্ভাবনাকে দৈব বলে সান্ত্বনা দেবেন নিজেকে ? পৃথিবীতে খাদ্যাভাব—নিত্য খবরের কাগজে পড়ছেন। আমাদের এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবাধ্য ঘোড়াকে লাগাম পরিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিরই সাহায্য করবে। আপনারা সেই মহৎকাজে সাহায্য করুন—খাবার ভাগীদারের সংখ্যা না বাড়তে দিয়ে। স্থানাভাব—তাও শুনেছেন আশা করি। এ পৃথিবীতে বাস-যোগ্য জমি নেই আর। চন্দ্রলোকে মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দিচ্ছি, উপনিবেশের জায়গা খুঁজতে। আমি বলি, এ দুঃখ-বৃদ্ধির মূল আপনারা। পুরুষদের অন্যায় প্রশ্রয় দেওয়া এর মূল। জীবনের সর্বপ্রকার আনন্দ থেকে বঞ্চিত

থাকার নাম আত্মবঞ্চনা। প্রতিবাব সন্তান ধাবণেব আগে ছ-মাস, পবে ছত্রিশ মাস পর্যন্ত, একটি শিশু নবম শিকল দিয়ে বেঁধে বেখে দেয় ঘবের চৌহদ্দিব মধ্যে। তাবপব আসে তাব শিক্ষাব ব্যাপাব, লালনেব প্রশ্ন। আপনাদেব আব কোন সামাজিক জীবন থাকে না তাবপব। এমনি কবে জীবনেব সমস্ত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন আপনাবা।

এমনি কবে একেব পব এক যুক্তিজাল বিছিয়ে যেতে লাগল উদ্বোধন-কাবিণী।

শ্রোতাবা অবাক আব শ্রোত্রীবা গর্বিত হতে লাগল। একটি মেযে বক্তৃতা কবছে, লজ্জাব জডতা নেই। শ্রোতাব সংখ্যাই বেশী। অর্থাৎ এতোগুলি পুরুষেব সামনে দাঁড়িযে কেমন অকপটে একটি মেযে গালাগালি দিয়ে যাচ্ছে তাদেব। ঠিক হযেছে এমনি গাল দেওযাই উচিত। গাল দিযে ভূত ভাগিযে দেওযা উচিত তাদেব।

বহু সন্তানেব জনক সভায যাঁবা ছিলেন, প্রায সবাই বোধহয লজ্জিত হলেন। সাময়িক হলেও ধিক্কাব কবলেন নিজেকে। অপ্রতিভ হবাব বালাই নেই শুধু কৃষ্ণমূর্তিব। তাঁব কাছে বক্তৃতা মানে কথা। ডিকশানেব খেলা। স্পীচেব ক্ষমতা। সেই হা হা হাসি।

ভাবপ্রাপ্ত মহিলা ডাক্তাবটিও কিছু বললেন। পবিবাব পবিকল্পনাব সামাজিক দিকটাব কথা সকলেই বলে গেছেন। তিনি আব সেদিকেব কথা বললেন না কিছু। এব সঙ্গে য্যাটি নেটাল ক্লিনিক খোলা হল। সেকথা বললেন। তাব ক্রিয়া কি—কি উপকাবে লাগে। এ সম্বন্ধে লেকচাব দেওযা হবে, হপ্তায তিন দিন। ভাবী মাযেবা যেন আসেন। সূতিকাগাব খোলা হল। সন্তান জন্ম নিবাবে সমস্ত বকম শিক্ষাব ব্যবস্থা বইল। নিবোধ সম্পর্ক তো বটেই।

শ্রোতাদেব অবাক বিস্মযেব মধ্যে সভা যখন শেষ হল, তখন বাত হযেছে।

কৃষ্ণমূর্তি তাঁব গাড়ীতে যাবাব জন্য বললেন শীলাকে। ঐ সঙ্গে আমাকেও।

শীলা গেল না। শীলা যায না। হেঁটে বওনা হল। ঐ সঙ্গে আমিও। হেঁটেই ফিবলাম দুজনে।

কৃষ্ণমূর্তি বললেন : জীপটা নিয়ে এলেই পাবতে।

শীলা বলল : এ তো অপিসেব কাজ নয় অপিসেব গাড়ী চড়ব কেন ?

কৃষ্ণমূর্তি বললেন : অতো সাধু সাজলে চলে না। আমি কি করছি দেখতে পাচ্ছো না ?

সিমেণ্টের একটা চুল সরু ফাটল যে এতোদূর যেতে পারতে পারে, এতো সুদূরপ্রসারী, আমি কেন—কেউই আন্দাজ করতে পারবে না।

অলটারনেটার তিনটে ভার্টিকাল শাফট। অর্থাৎ খাড়া বসাবার জন্যে তৈরী। এগারো হাজার ভোল্টের জন্ম দেবে, আটহাজার কিলোওয়াট পরিমাণ। ঘুরবে মিনিটে ছশো পাক। অলটারনেটারের গায়েই থাকবে পাইলট একসাইটার। এই দুটো ঘিরে মানুষ-প্রমাণ রেলিং—চারপাশে বেড দিয়ে চলাচলের জায়গা রেখে। রেলিং থেকে নেমে গেছে সিঁড়ি এই প্লাটফরম থেকে এর ডবল ব্যাসের আর এক প্লাটফরমে নামবার। শেষের এই প্লাটফরম স্টিলের পাতের তৈরী। এই প্লাটফরমেরও চারপাশে অমনি মানুষ প্রমাণ রেলিং। সিঁড়ি নেমে এসেছে দশ ফুট। মেঝে পর্যন্ত। একটি গোল ট্যাঙ্কের ছাত মাত্র। সেই ছাতের মাঝখানে অলটারনেটার খাড়া করে বসানো। ছাতের ভেতর দিয়ে ট্যাঙ্কে নেমে এসেছে ওআটার টারবাইনের শাফট। যে শাফট অলটারনেটারেরও বটে। কুড়ি ফুট ব্যাস, দশ ফুট খাড়াই। এই ট্যাঙ্কের মধ্যেই জল একদিক দিয়ে ঢোকে। টারবাইন ঘুরিয়ে আর এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

এই বিশাল ট্যাঙ্কের গায়ে মেঝেতে দাঁড় করানো মেইন একসাইটার।

অনুরূপ তিনটে ইউনিট। মেঝের ওপর পাশাপাশি বসবে।

দুশো বত্রিশ ফুট ওপরের জল একটা স্বাভাবিক চাপ নিয়েই নামবে। নেমে ঘুরিয়ে যাবে এই টারবাইন তিনটে। টারবাইন ঘুরলে, ওরই শাফটে চড়ানো খাড়া করা অলটারনেটারও ঘুরবে। বিদ্যুৎ জন্মাবে আটহাজার কিলোওআট এক একটিতে! প্রয়োজন বুঝে একটি দুটি তিনটি চালান।

যে মেঝেয় টারবাইন সমেত তিনটে অলটারনেটার বসবে সেই মেঝেতে দেখা দিল চুল সরু ফাটল। এ ফাটল যে কার কপালে দেখা দিল, কত দূর পেঁছিল এর প্রতিক্রিয়া—জানতে বা বুঝতে অনে-ক্ দিন সময় লাগল। তাও বোধহয় সম্পূর্ণ বুঝতে পারলুম না।

সে কথাই বলি।

স্টেনো এনে দিল একখানা চিঠির খসড়া। কাঁচা টাইপ করা সাদা কাগজে। খসড়া যেমন হয়।

মুখের দিকে তাকালুম: ড্রাফট করল কে?—অর্থাৎ, ও কার্যটি তো আমার।

স্টেনো ছেলেটি বলল: এস. এম. নিজে।

অবাক হলুম। স্টেনো বলল: আমি কি একটু পরে আসবো? না এখুনি দেখে দেবেন?

ওপর আর নিচেটা দেখে আমি তখন গোটা চিঠিখানায় মগ্ন হয়ে গেছি। হাত নেড়ে বোধহয় চলে যেতে বলেছিলাম ছেলেটিকে।

ওপরে সম্বোধন করা হেড অপিসকে। কৃষ্ণমূর্তির মাধ্যমে আছে যথারীতি দ্বিতীয় লাইনে। তলায় আশ্চর্য, অগ্রিম নকল 'কপি' হেড অপিসকে।

এটা শিষ্টাচার বিরুদ্ধই নয়, আপিসিক আইনে দণ্ডনীয়। এটার অর্থ অপিসের গুরুজনকে অমান্য করা। অপমান করা, তার ক্ষমতার উচ্চতা অস্বীকার করা।

অগ্রিম নকল পাঠানোর একমাত্র অর্থ কৃষ্ণমূর্তির সততায় সন্দেহ প্রকাশ। যদি তিনি ওপরতলায় না পাঠান।

অগ্রিম নকল পাঠানো অপরাধ। বিভাগীয় শাস্তিযোগ্য।

কি দরকার ছিল এই হঠকারিতার। শীলাকে নিবৃত্ত করতে হবে বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে, এই দুঃসাহসিক কাণ্ডের কুফল। কখনই এ চিঠি হেড অপিসকে সম্বোধন করতে দেওয়া হবে না। ভাগ্যিস মুসাবিদা অবস্থায় দেখিয়েছে। সম্বোধন করতে হবে সি. একস. ঈ. কৃষ্ণমূর্তিকে। শীলাটা একটা বগচটা মাথাখারাপ মেয়ে।

এ কি। বিষয়, মেঝের সিমেন্টে ফাটল। তার জন্যে আমাদের বিজলী-ওয়ালা ডিপার্টমেন্ট দায়ী নয়। আমাদের সংস্রব নয় ওটা। ওটা পূর্ত বিভাগের দায়িত্ব। ওখানে আমাদের নাক গলাতে যাবার দরকার। এ কি করেছে শীলা!

শীলা ছিল না তখন অপিসে, ওআর্কশপেও ছিল না।

আসামাত্র হাজির হলাম: এ সব কি পাগলামো হয়েছে। য়্যাডভান্স কপি কেন! য্যাড্রেস কেন হেডকোয়ার্টার্স কে! আমাদের কি কনসার্ণ আছে ফ্লোরের ক্র্যাক-এর সঙ্গে। উই হ্যাভ নাথিং টু ডু উইথ সিভিল ইঞ্জিনিআরিং। ইট ইজ দেআর বিজিনেস।

দৃপ্তস্বরে বলল শীলা : ইট ইজ য়্যাজ মাচ আওআর বিজনেস য়্যাজ ইট ইজ দেআরস। রাদার আমাদেরই বেশী কনসার্ণ। এই মেঝের ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। আর এই মেঝেতেই যদি ক্র্যাক রইল। যাক—আই থিঙ্ক য়ু উইল বি এবল টু য়্যাড ফোর্স টু দি ড্রাফট ইউজিং স্ট্রংগার ওয়ার্ডস।

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। শীলার চোখ মুখের দৃঢ়তা আমায় তর্ক-রণে আর এগোতে নিষেধ ক'রছে। শীলা আমার ওপরওলা।

ড্রাফটটা শীলাই করেছে। আমার মনে হল অনেক কারণের অন্যতম এই হতে পারে যে নালিশটা সিসিকোর নামে। আর মনোরমা যখন বলেছে আমাকে নিয়ে যাবে মুসৌরী—তখন ড্রাফটটা আমায় করতে দেওয়া ঠিক হবে না। কি জানি কেন মুসাবিদা করেছে নিজেই।

সিসিকো পেমেণ্ট চায় নি। নালিশ কাজ পাশ করার বিপক্ষে নয়। এখন আটকাচ্ছে টাইম ফ্যাক্টরে। এই ফাটল যদি অচল হয়, যদি সাব্যস্ত হয় এই ফাটল বাড়বে, তবে ভেঙে ফেলা ছাড়া উপায় নেই ফ্লোর। চার ফুট আর-সিব সোলিং। বিল্ডিংয়ের দেয়াল খাড়া হয়ে গেছে। ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। আর—সাধারণ পাহাড় নয়। কেটে কেটে বের করতে হবে। অন্য সব যোগাযোগের পথ তৈরী হয়ে গেছে। যেমন জলধারা গ্রহণের রাস্তা। না হলে হয়তো নতুন জায়গায় বসানো সম্ভব হতো অলটার-নেটার এখন আর সে উপায় নেই।

কাজেই ফ্লোর উড়িয়ে নতুন ফ্লোর তৈরী করতে হবে ঐ জায়গাতেই।

নতুন ফ্লোর জমানো হয়তো বেশী সময়সাপেক্ষ নয়। কিন্তু পুরোন ফ্লোর ওড়ানো! অনেক অনে-ক সময়ের দরকার।

এই সময়টুকু কে দেবে? কোত্থেকে আসবে? সমস্ত প্রোগ্রাম বিপর্যস্ত ওলোট পালট হয়ে যাবে। সময়মতো পাওআর স্টেশন চালু হবে না। অনেক দেরী হয়ে যাবে।

নালিশটা আসলে এই। নালিশ নয় বিবরণী। যুক্তি নেই একথা বলি না। যথেষ্ট যুক্তি আছে জোরদার যুক্তি আছে। আমার কথা এই—এটা আমাদের মাথা ঘামানোর বিষয়বস্তু নয়। কৃষ্ণমূর্তি বুঝুক গে!

মনের কথা মনেই রইল। অগ্নিক্ষরা ভাষায় বিবরণী লিখলুম। মনে যতো যুক্তি ছিল মুক্তি দিলুম কলমের ডগায়।

পছন্দ হল শীলার। মুখের রেখায় লেগে রইল সে পছন্দ।

শেষ চেষ্টা করলুম : য়্যাডভান্স কপিটা না পাঠালে হয় না।

শীলা হাসল একটু : যে লোক অপিসের গাড়ী যথেচ্ছ ব্যবহার করে—য়্যাডভান্স কপি না দিলে তার পক্ষে ফরওআর্ড না-করা কি বিচিত্র!

আমার আর বলার নেই কিছু। য়্যাডভান্স কপিই গেল।

আর সহ্য হচ্ছিল না। মনোরমাদের বাড়ী থেকে সেই যে এসেছি আর যেতে পারি নি। আর, এসেছি কি অবস্থায়! তারপর কি হল কিচ্ছু জানি না। বাইরের দরজা মনের দরজা কোনটা খুলল, কোনটা বন্ধ হল—না দুটোই বন্ধ হল, কিচ্ছু জানি না।

সারাদিন কাজ করি, কাজ করি অনেক রাত্রি পর্যন্ত, ছুটি পাই না। শীলা কাজের শেকল পরিয়েছে পায়, বসিয়ে রাখে কর্তব্য বুদ্ধির দাঁড়ে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে—ফাঁক নেই ফাঁক রচনা করে—একটি দৃশ্য উঁকি মেরে যায়। অসহ্য জ্বালায় জ্বলতে থাকে তনু মন। জ্বালা করে ওঠে ঠোঁট, হাহাকার জমে ওঠে কোথায় যেন! মিষ্টি বিষের তীব্র যন্ত্রণা মোচড় মেরে ওঠে। মনের চোখের দু তীর টইটম্বুর ভাসাভাসি। জানি জ্বলব—তবু ভালোবাসতে এগিয়ে যাই সেই জ্বালাকেই! এ কি আনন্দ! এ কি যন্ত্রণা! এ কি আনন্দময় যন্ত্রণা!

একখানি ইজিচেয়ার পাতা হয়ে আছে মনের কোণে। নাম দিয়েছি ব্যারাম কেদারা। জাজ্বল্যমান অতৃপ্তি শুয়ে আছে চেয়ারে। মাথার ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে একটুকরো আগুনলতা। বুকে মুখে মেখেছে সে আগুন। জ্বলে মরছে এখন। লিকুয়িড ফায়ারের মতো লেপে আছে সর্বাঙ্গে।

শীলা যখন ছেড়ে দিত, নিদ্রাবিহীন গগন তলে তারায় তারায় দীপ্ত শিখার আগুন জ্বলছে মাথায়, আগুন জ্বলছে শিরায় শিরায়—দপ দপ দপ। তখন কোটিগুণ বেড়ে যেতো এই জ্বালা। প্রতিজ্ঞা করতুম—কাল ছলে ছুতোয়, প্রয়োজন হলে জোর করে বেরিয়ে পড়ব নিগড় ভেঙে। দেখা করব মনোরমার সঙ্গে।

দেখা করব মুখোমুখি মনোরমার মনের সঙ্গে।

দুদিন পর ছুটী না নিয়ে ছুতো নিয়েই বেরিয়ে পড়লুম।

বললুম : একটু বেরোচ্ছি। ফিরতে দেরী হবে না বিশেষ।

কোথায়? শুধোল শীলা। বললুম: ফুলডহর! ডিটেলস বাকি আছে কিছু, নিয়ে আসি—

কি রকম সন্দেহের চোখে তাকালো শীলা। অন্তত আমার অপরাধী বিবেক সন্দেহ আবিষ্কার করল শীলার চোখের দৃষ্টিতে।

জীপখানা মেসের গ্যারাজে পুরে চোরের মতো মনোরমাদের বাড়ীর দিকে এগোলুম। চারিদিকে চোখ ফেলে ফেলে—আপত্তিজনক কেউ দেখে না ফেলে!

অবাক হল আয়ীমা। কি আন্দাজ করে মনের ভাবটাকে ভাষা দিল না মুখে। ডেকে দিল মনোরমাকে। মনোরমার কি হল? অবাক! বিরক্ত! যাই হোক—খুশী নিশ্চয় নয়, এ আমি হলপ করে বলতে পারি!

বলল: অসময়ে! কি মনে করে? এতোদিন পর! ইচ্ছের বিরুদ্ধে সিসিকোব নামে নালিশ, না, সেদিনের ব্যবহার।

দ্ব্যর্থক কথা বললুম—ইচ্ছে মতো চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবো অর্থটা। বললুম: মাপ চাইতে এসেছি। অপরাধ করেছি—তার।

ভ্রূ কোঁচকালো নাকি মনোরমা! বলল: অপরাধ? কি অপরাধ? আমি তো জানি না—

তবে কি আমার আচরণ অপরাধের হয় নি সেদিন! সেই টিয়া রঙের শাড়ীটা পরা—তেমনি খোলা চুল। ঘুম ভাঙা ফোলা ফোলা মুখে অবিন্যাসের স্বাভাবিক লাবণ্য। সবটা না হলেও অনেক মিলে যাচ্ছে। তবে কি সেদিনের বাকিটুকু মিলে যাবে। হে ঈশ্বর, এতো ভাগ্য আমার।

: তুমি না জানলেও আমি করেছি। জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক করেছি। ক্ষমা করো রমা—

মনোরমার মুখের গাম্ভীর্য কমতি না করে বলল: জ্ঞানে করে থাকলে আমার বক্তব্য—করলেন কেন? অজ্ঞানে করে থাকলে বলবো—জ্ঞানহীন হয়ে যান কেন? যাকগে, অনুতাপ যখন এসেছে—ওই যথেষ্ট! আমার মুখের ক্ষমার কি দাম আছে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলুম বসবার ঘরে। বললুম: বসতেও বলবে না নাকি?

মুখের রেখায় ভুল হয়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন আমদানী না করে বলল: ভুল হয়ে গেছে বলতে। বসুন। ভুল মানে—অপিসের সময়ে

এসেছেন, জরুরী কথা হযতো আছে। বসবার সময় হবে না হযতো, এই ভেবেছিলাম।

অর্থাৎ, জরুরী কথা থাকলে, বলে গাত্রোত্থান করো—

ওটা আর যাই হোক—বসার নিমন্ত্রণ নয়। বসলাম না। অতো বেহাযা হই নি। হলে যদি লাভ থাকত, না হয় হতাম।

মনে মনে ভেবে নিলাম—যে কবেই হোক, বিকেলে আসতে হবে। তা হলে অপিসের সময়ে আসার অজুহাতে তাড়িযে দিতে পারবে না।

বললাম : না, বসব না আর। চলি—

মনোরমা একটু বিদ্রুপের হাসি মেখে বলল : কি কথা ছিল বললেন না ?

ঠাস করে গালে একটা অলখ চড মারলে কে যেন। বললাম : এক ছিল ক্ষমা চাওযা। আর এক, সেদিন কি বলতে চেয়েছিলে—সেইটে শোনা। তা যাক, আর এক সময় শুনবো এসে।

আর একবার আসা ও মনোরমাকে দেখতে পাওযার আনন্দ, সম্ভবনার হাঁড়িতে জীইয়ে রাখলাম।

মনোরমা পরিষ্কার গলায জবাব দিল : সেদিনের সঙ্গে সেদিনের কথাও হারিযে গেছে যে ! উঃ সেদিন যা বলতে যাচ্ছিলাম, বলে ফেললে কি ভুলই করতাম। ভাগ্যিস—বলি নি। সে ভুল আমার ভেঙে গেছে অনুপম বাবু।

: আচ্ছা আচ্ছা সে হবেখন। কি ভুল, আর কি ভুল নয—সে সব পরে হবে।

: মিস্টার রয়, সেদিন যে সূর্য উঠেছিল সেই দিন সন্ধ্যাযই সে অস্ত গেছে। আর তো ফিরবে না, ফেরে না। তাকে ফিরিয়ে আনা যায না—

লঘুপাখায ভর করে উপকার যদি হয়। বললাম : কি তোমার বুদ্ধি মিস চৌধুরী, রোজ রোজ নতুন নতুন সূর্য ওঠে বুঝি আকাশে। না একই সূর্য রোজ নতুন করে ওঠে।

মনোরমা বলল : আমার আকাশে রোজ নতুন সূর্য ওঠে। কোনদিন তপন, কোনোদিন দিবাকর, ভাস্কর, মিহির, কোনোদিন বিবস্বান—

: বা রে—ও তো একই জিনিষের বিভিন্ন নাম।

: তার উত্তরে আমি বলব—প্রত্যেক মানুষ মূলতঃ এক। আলাদা নাম কেন তা হলে। সূর্যের ওঠাটাই নতুন, তার মানে সেই নতুন।

ইঁদুরের মতন রাস্তায় নেমে পড়লাম।

মনোরমাও পিঠের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল দড়াম করে—।

অপিসে ফিরে এলাম—বেলা সাড়ে তিনটে চারটেয়। তা এতোক্ষণ ফুলডহর থেকে ঘুরে আসা যায়। শীলা নেই। একটু বাদেই এলো। কৃষ্ণমূর্তির অপিসে গিয়েছিল। ডেকে পাঠিয়েছিল কৃষ্ণমূর্তি।

শীলার মুখে যা শুনলুম—তাতে আপসোসের অন্ত রইল না। চুরি করে মিথ্যে বলে না গেলেই হোতো। গিয়েও লাভ হল না, চুরির অপরাধটাই মনের অঙ্গে লেপ্টে রইল।

শীলা বলল : কাজ সেরে এসেছো তো। না বাকি রেখে এলে ?

বললুম : না। বোধহয় সারা হয়েই গেল। আর যেতে হবে না মনে হয়!

শীলা বলল : তা, নিঃশ্বাস পড়ল কেন একটা সঙ্গে সঙ্গে।

: এমনি! নিঃশ্বাস না পড়লে তো ব্যস—ফিনিশ। হয়েই গেল।

: থাক। শোনো। কৃষ্ণমূর্তি ডেকে পাঠিয়েছিল।

যা ভেবেছি তাই। বললুম : একসপ্লানেশন চাইল তো। ইন রাইটিং নাকি ?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শীলা উত্তর দিল : আরে বাপু, না। সে কথাই নয়। তোমার মনে খালি 'কু' গায় কেন বলো তো!

: তবে ?—অবাক হয়ে তাকাই শীলার মুখে।—তবে কি ? আর কি হতে পারে, অন দি ফেস অব দি আর্থ ?

: লিভারপুল থেকে খিদিরপুর আসতে, জাহাজের হোল্ডেই হোক, যেখানেই হোক, দুটি ক্রেটিং ভাঙা অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ইণ্ডিআন কোম্পানীর লাইনার। এস্ এস্ ফ্রীডম অব ইণ্ডিআ। 'শিপ'এর কনসাইনমেণ্ট মিলিয়ে পাওয়া যাচ্ছে একসাইটারের ক্রেটিং। খিদিরপুর বলছে—তাদের সামনে ইনসপেক্ট করে বলতে হবে ড্যামেজের এক্সটেণ্ট কতোখানি। ড্যামেজটা য়্যাপেরেণ্ট না রিএল। হেড অফিস সেভিংগ্রামে কৃষ্ণমূর্তিকে জানিয়েছে দুজন সিনিঅর অফিসিয়াল যাবে! ইমিডিএটলি। বেশ দেরী হয়ে গেছে করসপণ্ডেন্সেই। ডেলিভারী নেওয়া হয় নি। ডেমারেজ দিতে হচ্ছে মোটা চার্জ, ডেইলি—।

বললুম : তারপর ?

শীলা বলল : কৃষ্ণমূর্তি আর আমি চললুম। আজ রাত্রে!

: রাত্রে ? আজ ? রাত্রে ট্রেন কই ?

: ট্রেন নেই। জীপ আছে। কাল সকাল আটটায় খিদিরপুর পৌঁছতে চেষ্টা করতে হবে। এই নির্দেশ—

অবাক হলুম। অবাক হলুমও না, শীলা সব পারে। ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরতেও পারে। অভয় হলে ছুঁড়ে ফেলতেও মুহূর্তেকের বেশী দেরী হয় না। শীলা এ. সি.।

অলটারনেটিং কারেণ্ট—পরিবর্তী প্রবাহ। ডাইরেক্ট কারেণ্ট নয়—ইউনিডাইরেকশনাল নয়। সর্বদা একই দিকে বয় না। সেকেণ্ডে পঞ্চাশ বার বার দিক পরিবর্তন করে।

শুধু শীলাই বা কেন ? মনোরমার আকাশেও তো রোজ নতুন সূর্য ওঠে। সব মেয়েই এ. সি.।

বললুম : সাহস পাও ? কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে পর পর দু রাত জীপে কাটাতে ? তুমি জানো না—কৃষ্ণমূর্তি রাঘব বোয়াল একটি।

হো হো করে পুরুষালি হাসল শীলা। বলল : অটো গ্রুবার্টের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটিয়েছি! ক্যাম্পে এক দঙ্গল ছেলের সঙ্গে রাতের পর রাত কাটিয়েছি। কেউ খেয়ে ফেলে নি। বঁড়শি ফেলেছে, জাল ফেলেছে, টোপ ধরেছে মুখের কাছে। সুবিধে করতে পারে নি। আর পারবে আজ কৃষ্ণমূর্তি ? হাসালে পিয়ারলেস, হাসালে তুমি।

: আশ্চর্য! আশ্চর্য তোমার বিচার বুদ্ধি শীলা! মানুষের বিপদ কি রোজ রোজ আসে।

: সাবধানী যারা, তাদের কোনদিন আসে না। ভুল বললাম। সাবধানী নয়, সাহসী যারা। সাবধান নয় শুধু, সাহসও থাকা চাই। ঐটেই আসল।

: বেশ, আমার কিছু বলবার নেই। আমার শুভেচ্ছা রইল। বলো তো গোলোক চাটুয্যের কাছে যাই। আশীর্বাদী ফুল চেয়ে আনি একটা—বিপদভঞ্জন ফুল।

: ধন্যবাদ—দরকার হবে না। তুমিই ছিলে বিপদ, তুমি তো আর সঙ্গে থাকছ না—। ছেলেমানুষ পেয়ে গভীর জলে নিয়ে ডুবিয়ে মারবার তালে ছিলে। তুমি নিজে গভীর জলের মাছ—তোমার তো যায় আসে না। চুবুনী খাইয়ে বাঁচিয়ে এনে কৃতিত্ব দেখাতে—

বলা বাহুল্য, শেষের দিকে হাসি বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে কথা চলছিল।

বললাম : ত্যাখো—যাবার আগে আমায় যাচ্ছেতাই বলো না বলছি। ভালো হবে না।

বব করা চুলের একটা গুছি আঙুলে জড়াতে জড়াতে শীলা বলল : খারাপটা কি হবে শুনি ?

: অভিশাপ দেবো আমি। কঠিন অভিশাপ। সারাজীবন কেঁদে কাটাবে—

: যথা—

: তোমার বিয়ে হয়ে যাক।—এই অভিশাপ।

: ওটা আমার কোনদিনই হবে না : তোমার অভিশাপ কাজে লাগবে না, নিশ্চিন্ত থাকো। যদি ওটা অদ্দেষ্টে থাকে—ওটা হবে না, আমি করব। আমি হবো কর্তা, কর্ম নয়।

: তোমার কম্মো নয় বিয়ে করা। তোমার মতন ম্যাসকুলীন মেয়ের বিয়ে হবে, পাত্র কই ? তোমার জন্মে চাই ফেমিনিন ম্যান—এফিমিনেট ম্যান !

শীলা বলল : তুমি নিজে কি, ভেবে দেখেছো ?

: ভেবে দেখব কেন, আয়নায় দেখেছি। মাস্‌ল দেখেছো—ইয়া বড়া—বলে হাতের বাইসেপস থেকে শার্টের হাতা অনাবৃত করে তুলে ধরলুম।

: ছাই ! ও তো মাঝিদের থাকে। মনের মধ্যে বাস করে যে, সে একটি মিনমিনে মেয়েমানুষেরও বাড়া। ভিক্ষে চায় প্রেম, ভিখিরী মাত্র। আদায় করতে জানে না, লুট করতে জানে না দস্যুর মতো। সতীত্বের নরসংস্করণ কি হবে হে ? সত্ত্ব হওয়া উচিত নয় ? সত্ত্ব বাঁচাতে গভীর রাত্রে পালিয়ে যায়। ছেলে পালিয়ে যায় মেয়ের ভয়ে, আমি আর দেখি নি। ছুও ছুও তোমার পৌরুষে ছুও—

ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল নিজের অন্তরপুরে। খোলা দরজা পেয়ে ঝড়ের ঝাপটায় ওর মনের কোণে ঠাঁই পেল কি আমার ঝরা পাতা। কি জানি ! ফ্রেলটি, দাই নেম ইজ ওম্যান।

জানি, দাঁড়াবার সময় দেবে না। ভেবে দেখব কি বলল, সময় দেবে না তার।

বলল : চলো চলো।—বলে আমার বাঁ গালে ছোট্ট করে ছুটি আদরের চড় মারল।

ওরা বেরিয়ে গেল। রাত তখন সাতটা আটটা। জীপখানা একটু বড়ো পিছনের দু চাকা ঠেলে উঁচু হয়ে আছে। গাড়ীর মধ্যে দুটো গরুর পিঠের

কুঁজ যেন। কমিয়ে দিয়েছে বসবার জায়গা। তারি মাঝখানে একখানা সিট। একজনের পক্ষে প্রশস্ত, দুজনের পক্ষে অপরিসর।

ড্রাইভারের পাশে একখানা পিঠওলা সিট। লেফট হ্যাণ্ড ড্রাইভ।

মনোরমাদের বাড়ী যাবার উৎসাহ পেলুম না। দুই কারণে। বলছি।

দুই মেরুর দূরত্বে বসে আছে দুই নারী। মেরুর ইংরেজি পোল। বিদ্যুতের পরিভাষায় পোল আছে, তাদেরও নর্থ পোল আর সাউথ পোল বলে। নর্থ পোল নর্থ পোলকে বিকর্ষণ করে, সাউথ পোলকে করে আকর্ষণ। বৈদ্যুতিক মোটর ঘোরে এই একটি মাত্র মূল তথ্যের ওপর। আর্মেচারের গঠনই এমন এই আকর্ষণ বিকর্ষণের ঠেলাঠেলিতে বেচারা ঘুরতে থাকে। দুপাশে দুরকমের পোল।

আমি কি আর্মেচার? একজন সাময়িক টানবে আর একজন চিরকালের মতো ঠেলে দেবে। আমি ঘুরে মরব সারাজীবন।

মনোরমা ঠেলে দিয়েছে আজ—বেশীক্ষণ আগে নয়, দুপুরেই।

সন্ধ্যাবেলা শীলা কি সব বলে চলে গেল।

মেসে ফিরে দোটানায় পড়ে গেলাম। মনোরমাদের বাড়ী যাবার ঘড়ির কাঁটা শালীনতা ভদ্রতার ঘর ছাড়িয়ে যায় নি। রাত এখনও কিশোরী। বেণী দুলিয়ে ছুটফট করে বেড়াচ্ছে সান্ধ্যভ্রমণের আনন্দে। চালচলনে ভারিক্কে গম্ভীর হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু—। আজ বসতে পর্যন্ত বলল না। এ তো অপমান। এতো অপমান।

না, যাবো না। শীলাও আজ বাঁ গালে জ্বালা দিয়ে গেছে। শীলার কথাই রোমন্থন করি বসে বসে।

যাবো না বলেই বসে ছিলাম। হঠাৎ যুক্তির জোয়ার এলো মনের 'না' 'না' কানায় কানায় ছাপিয়ে।—যাবো। কি ভুল ভাঙল মনোরমার, জানা দরকার। ভুল ভাঙল, না নতুন করে ভুল করল, জানা দরকার। সেই মনোরমা, যার ভালোবাসা সত্যের বেড়া টপকে মিথ্যার মাঠে গোচারণ করে গেছে। সেটা তো বাজে নয়। যে মেয়ে অতোখানি করতে পারে, সে মেয়ের মনের আয়নায় ছায়া পড়ে নি কিছুরই?

আবার মনে হতে লাগল, আমি ভীরু আমি কাপুরুষ। মেয়েরা সংযুক্তা

—লুঠ হয়ে যেতে চায়! এইমাত্র শীলা অপবাদ দিয়ে গেল। আমায় সাহসী হতে হবে! সেদিনের সেই আগুনে হাত দেবার পর আর যেতে পারি নি ছ ছটা দিন। আর ঠিক এর জন্যই রেগে আগুন হয়ে আছে মনোরমা। আমার সাহসের অভাবের জন্য। চোরের মতো চুরি করে গা ঢাকা দেওয়া! পালিয়ে বেড়ানো ছ দিন। কোনো মানে হয় নি এই ছিঁচকে চোরের মতো ব্যবহার করে।

উঠে পড়লাম। আজ আর কালকের সন্ধ্যে দুটোই আমি অবাধ স্বাধীন। বৃথা যেতে দেওয়া চলতে পাবে না।

আমীনার কাছে শুনলাম—দুপুরে আমি দেখা করে যাবার পর থেকে শুয়েই আছে। সন্ধ্যেবেলা একটু উঠে চা খেয়ে আবার শুয়ে আছে অন্ধকারে।

বললাম: ডেকে কাজ নেই।

চলে আসছিলাম। ভিতরের দরজা দিয়ে মনোরমা এসে হাজির হল।

স্বর হুকুমের—কণ্ঠ গম্ভীর। : বসুন!

বসলাম।

: বলুন—কি বলছিলেন!

: না এমনি। এমনি এসেছিলাম। কথা তেমন কিছু নেই।

: তার মানে? দুপুরবেলা বললেন কথা আছে।

: আমি কি কথা না থাকলেও আসি না! কথা তৈরী করতে আসি না?

: আসতেন। আগে। এখন আর আসেন না। মিস মজুমদার আসার পর থেকে আর আসেন না। কাজ করেন!—আজ এসেছেন কেন জানেন, মজুমদার নেই বলে। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন—এ বাড়ীটা আপনার বাগান বাড়ী! খুশী মতো আসবেন যাবেন! আর আমি তৈরী হয়ে বসে থাকবো আপনার প্রতীক্ষায়—কখন আপনার আসার সময় হবে!

: আমি আজ যাই। তোমার মাথা ধরেছে, মনোরমা, প্রকৃতিস্থ নেই তুমি। অনুমতি করো তো মাথাটা টিপে দিয়ে যাই—

ফণা তোলা নাগিনীর ফণার নিচে পড়ে ছোবলের পর ছোবল খাচ্ছি।

ব্যথায় বিবর্ণ, বেদনায় নীল হয়ে যাচ্ছি। অল্প অল্প দুলছে ফণাটা। মারছে নতুন ছোবল—মৃতদেহে ছড়িয়ে দিচ্ছে নতুন করে মৃত্যু।

: আপনার কি লজ্জা বলতে কিচ্ছু নেই। বিবেক—বিচার-বুদ্ধি, একটু সামান্য ভদ্রতা সব খুইয়ে বসে আছেন! এতো নীচে কি করে নামলেন কবে নামলেন বলতে পারেন?—একদিন বলেছিলেন আপনার 'বস' খুব ভালো লোক—মনে পড়ে? ভালো লোকেরাই খোলা নৌকায় বসে চরম বেহায়াপনা করতে পারে। আমাদের মতো সামান্য লোকেরা পারে না। নৌকোয় বেড়ানোর দিন প্রসঙ্গটা তুলেছিলুম। বলেছিলুম—অপরাধ করেছি আপনার কাছে। বলতুম—আপনি গেলেন না, বিব্রতকে নিয়ে বেড়িয়ে এসেছি লঞ্চে। আর ঐ সঙ্গে বিলেত ফেরতের বেহায়াপনার কথাও বলতুম। তখনও জানতুম না—মাঝিটি স্বয়ং আপনিই। বিকেলে আপনি এক নাটকের নটবর। এক নায়িকার সঙ্গে লীলাখেলা করলেন। একটু পরেই ভদ্রলোকের মেয়ের অঙ্গ স্পর্শ করেন?—সাহস তো কম নয় আপনার! তার আগের রাত্রের নির্জন ঘরের সেই নায়িকাই তো ভালো! লীলাসঙ্গিনী। তার কাছে ছাতের তলার আড়ালও যা, খোলা আকাশের নিচে আড়াল না-থাকাও তাই। উদারচরিতানাম। এতো উঁচু পর্যায়ের বিলিতি শিক্ষা আমি পাই নি। আমার মাও য়ুরোপীয়ানের মেয়ে। তবু এতো উদার হবার শিক্ষা পাই নি।

আমি একবার বলার চেষ্টা করলাম: সব ভুল। মনোরমা, সব ভুল দেখেছ তুমি। খাঁটি কথা খুলে বলতে দাও। শোনো আগে আমার কথা—

কা কস্য পরিবেদনা! আমার কথা কোথায় ডুবে গেল। ভেসে গেল কোথায় মনোরমার বচনের বন্যায়। বোঝাপড়া করতে নেমেছে মনোরমা। আমার কথা শুনতে নয়।

: আমায় যদি সামান্য মেয়ে ভেবে থাকেন, খুব ভুল ভেবেছেন। সেইভুল ভেঙে দিই আজ। আমি সামান্য পথের মেয়ে নই যে মন না দিয়ে মান কেড়ে নেবেন। আমার গায়ের রংটা দেখেছেন! বাঙালী অতিমাত্রায় ফরসা হলেও ঠিক এই রঙ হয় না। দেখেছেন চুলের রং! চোখ দেখেছেন? আমার মা য়ুরোপীয়ানের মেয়ে, মায়ের নাম ডরোথী। আমার নাম নরমা—মায়ের রাখা নাম। বাবা বাঙালীপনা এনে দিলেন 'ম' অক্ষরটি সামনে বসিয়ে। আমার নামটা দুজনের স্নেহ কুড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল, একটু বাঁকা বানান নিয়ে। এম এ এন ও আর এম এ। আমি নরমা। বাবার মনোরমা

মনোরমা। বিলেতে পাঠ্যাবস্থায় বাবার সঙ্গে মার ভাব হয়। বাবা দেশে এসে সেট্‌লড্ হলে মা চলে আসেন। রাঁচির চার্চে বিয়ে হয় ওঁদের। বছর আট দশ যখন আমার বয়েস, মা বাবার সেই বারো বছরের ভাব বাসি হয়ে, হয়তো টকে গিয়েই, অ-ভাবে দাঁড়ায়। ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। কেউ সম্মান খোয়ান নি, নিচু হন নি কেউ। লাঠালাঠি করেন নি একদিনের তরে। পারটেড য্যাজ ফ্রেণ্ডস। বাবাকে চেনেন, মাকে চিনিয়ে দিলুম। এইজন্যে যে, আমার উদ্ভবটার সম্যক পরিচয় দিতে।

: আমি-আমি-আমি তোমাকে আপনাকে সামান্য ভাবি নি কোনদিনই।

: ভালোবাসতে পারলেন না, গায়ে হাত দিতে আসেন কোন দুঃসাহসে? যদি সামান্যই না ভাববেন, পণ্যাই না ভাববেন?

আর সহ্য করতে পারল না মনোরমার নার্ভস। টেবিলে ডান অগ্রবাহুটার ওপর মাথা রেখে সে কি কান্না। সিঁথির দুপাশ ভেঙে লাল লাল রেড়-শীর ঢেউ। মুখ ঢাকা। দেখা যাচ্ছে না।

আমি মা টের পেলে রক্ষে থাকবে না। একটা অসহায় মেয়েকে আমারি নিষ্ঠাহীনতার নির্ভয়ে কাঁদিয়ে তস্করের মতো রাস্তায় নেমে এলাম। আমার নিজের ছালটাই আমার কাছে বেশী দামী হল। একটা মেয়ের চরমতম আশা-ভঙ্গের দুঃখের মুহূর্তেও আমার আমি-কে বাঁচাতে লজ্জা হল না আমার। আমার আমিটা আমার প্রেমের চেয়েও আমার কাছে অনেক বেশী মূল্যবান।

পরদিন দিনটা আর রাতটা এক আচ্ছন্নতায় কেটে গেল। জীবনের আড়াই বছরের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে কাল। কিছু যেন ভার লাঘবের স্বস্তিও মিশে ছিল সেই সঙ্গে। বেশী করে মনে পড়ছিল—মনোরমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণের রাত্রির কথা। মনোরমা কতোখানি নীচ হতে পারে প্রয়োজন হলে—সেই কথাই বড়ো হয়ে মনের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে আজ। শেষ, সব শেষ হয়ে গেল।

কতো কথাই মনে হচ্ছে। বড়ো বেশী সুন্দরী মনোরমা। দৈনন্দিন জীবনের গন্ধরাজ নয়, নরম সাদা ডাঁটির ওপর নয় রজনীগন্ধা, তামার টাটে রাখার উপযুক্ত নয় রক্তজবা, এ যেন কড়া তীব্র সুগন্ধি চাঁপা। না লাগে পুজোয় না রাখা যায় বাটন হোলে। দূর থেকে দেখতে হয় চোখ জ্বালা করা রূপ। অতিদূর থেকে ভেসে এলে গন্ধ সহ্য করা যায় তবু।

এতো বেশী সুন্দরী—আমার পাশে ভাবাও যায় না ওকে। এ অধ্যায় শেষ হতই, আমি চেষ্টা করলেও ধরে রাখতে পারতুম না।

ওরই মধ্যে কোথায় পাচ্ছিলাম অল্প অল্প আশ্বাসের সান্ত্বনা।

কে যেন গাল টিপে আদর করে গেছে। বলে গেছে প্রতীক্ষায় থাকতে।

মনে আছে সেদিন রাত্রে খুব তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। আর সারারাত ধরে অনেক স্বপ্ন আর প্রচুর দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম।

পরদিন যথারীতি অপিসে গিয়েছিলাম। এবং বেলা দশটা নাগাদ শীলাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম।

: এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলে কি করে? এই তো গেলে পরশু সন্ধ্যেবেলা। দুটো রাত্রিই জীপে—কষ্ট হল খুব, না!

: কাজ চুকে গেল।—না কষ্ট তেমন হয় নি।

: কি খবর? খুব ড্যামেজ হয়েছে? কি রকম দেখলে?

: না না—ক্রেটিং-টাই গেছে। ভেতরে ঠিক আছে।

: একসাইটারের কাজ উস্কানি দেওয়া। উত্তেজনা জোগানো। এই দলের লোকদের নিজেদের ঠিক থাকতে হয়। নিজেরা ভেঙে পড়লে চলে না। তাই বোধহয় ভাঙে নি।

: কি রকম, কি রকম। গভীর গভীর মনে হচ্ছে কথার ভাব—

বললুম : গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তোরে সাহস নাহি পাই।—তারপর বলো, কি নিয়ে গিয়েছিলে, ক্রিওজোট না ছোরা—?

: সময় মতো প্রকাশ্য। কিছুই নিয়ে যাই নি। দুটো চোখের তূণ না কি বলে যেন, তাইতে করে কিছু কাঁড। কাঁড় মানে জানো তো। বিষমাখা তীর। কথাটা জানতুম না, এখেনে এসে শিখেছি।

: রাত্রির অন্ধকারে চলন্ত জীপে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে যে সব তীর! একটাও তো গায়ে লাগবে না—

: কথা জিনিসটা তো শোনা যায় অন্ধকারেও। তা হলেই হোলো। মুখের কথা। তার শক্তি কি কম? রাত্রির অন্ধকারে ওটা বিভীষিকা ছড়ায় আরো বেশী, জানো না! আচ্ছা আচ্ছা সে সব হবেখন। সত্যি, বেশী দূর এগোতে পারে নি। শুধু পথশ্রম কমাতে কিছু ওষুধ খেলো। আমাকে অফার করেছিল। আমি বললুম—অকেশানে না-খাই তা নয়। কোন উৎসবের

সম্মানে অবশ্যই খাই। এখন খাবো না। সাধাসাধি করল একটু, থেমে গেল তারপর। জানো,—

: তুমি ড্রিংক করো না কি ?

: ড্রিংক করি না তো। কোন অকেশানের খাতিরে ঠোঁটে ঠেকালে সতীত্ব যায় না আমার। জাতও যায় না। জাতটা আমার যায়ই না। জানো, ওকথা কবুল না করলে উদ্ধার পেতুম না। আমার জাত যাওয়াবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে যেতো মূর্তি সাহেব। ঠিক তেমনি। রাত ভারী হলে ঢুলুনি এলো মূর্তির চোখে। আমিই অফার করলুম, কোলে মাথা দিয়ে শুন। কেন বললুম, জানো ?

: পেছনের সিটে শোবার জায়গা নেই বলে।

: তোমার খুব বুদ্ধি তো—বলে হাসল শীলা : ফলটাও আন্দাজ করতে পারছ নিশ্চয়ই—

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল অজানতে। না, ওটার গৌরব আর করি নে। পরশুদিন মনোরমার কাছে যে লাঞ্ছনা, আমার বুদ্ধির ভুলই তো দায়ী তার জন্যে। সর্বাঙ্গে জ্বালা মেখে এলুম আর ঘেঁষলুম না ছ দিন। গেলুম তো গেলুম দুপুরবেলা। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে প্রেম করার সময়ই নয় ওটা।

: হুঁ—তুমি সামনের সিটে চলে গেলে ড্রাইভারের পাশে। আর এই ব্যবস্থাই ফেরার পথেও বজায় রইল।—আচ্ছা যদি হতো স্টেশান ওআগন।

হাসল শীলা : একটা কিছু বুদ্ধি বের হতই। সব চেয়ে কাজ হয়েছে কিসে জানো ? ঐ যে বললুম ড্রিংক করি না বটে অকেশান হলে খেতে আপত্তি নেই। আর ঐ যে কোলে মাথা রেখে শুতে বললুম। ঐতেই কাজ হল। সব জায়গায় একই দাওয়াই চলে না জানো তো।...মেয়েদের কাছে সাহস দেখাতে বলল কেউ। সর্ব্ব-ক্ষেত্রে সেই একই নীতি চালাতে গেলে চলবে না নিশ্চয়ই। অপমান হতেও তো পারো। ঝোপ বুঝে কোপ। মশা মারতে কামান দাগবে না। আবার বাঘ শিকারে নিয়ে যেও না এআর গান—

আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। শীলা পড়তে পারে নাকি মুখ-চোখের লেখা! মনোরমার পরশু দিনের ব্যবহার জেনে ফেলেছে মনে হচ্ছে। প্রত্যেক কথাই ঐ দিকে ফিরিয়ে তোপ দাগছে। তা ছাড়া ভীরু কাপুরুষ বলে ঠেস দিয়ে গেছে। সাহস সঞ্চয় করছিলুম মনে মনে। যা থাকে অদেষ্টে। সবাই আর এমন কিছু মনোরমা নয়। সে সাহসও লোপ পাইয়ে দিল।

: আচ্ছা সারা রাস্তায় একবারও তোমার দরখাস্তর কথা তোলে নি? জিজ্ঞেস করে নি—য়্যাডভান্স কপি পাঠালে কেন? আর হেড অপিসকেই বা দরখাস্ত করলে কেন? ওটার কি হয়েছে জানো তো!

: না তো—

: মূর্তি সাহেব মন্তব্যে লিখেছে, ফরওয়ার্ডেড উইদাউট কমেণ্টস।

হেড অপিসও মন্তব্য করল না মুখে। হয়তো করল। কাজে।

শীলার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করল না ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার জন্যে! শীলার দরখাস্ত—অবিমিশ্র খারাপ জিনিষ তো নয়! একটা গুরুতর ত্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শীলা। যে ত্রুটি একদিন সর্বনাশের কারণ হতে পারত। এ ফাটল সম্বন্ধে অন্য লোকে বলে নি কেন? চোখে না পড়ার কথা নয়। কৃষ্ণমূর্তি আছেন। চন্দ্রশেখর চৌধুরী আছেন। গুণে গুণে বত্রিশ জন য়্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিআর আছেন আরো। সিভিল, স্ট্রাকচারাল, মেকানিকাল, ইরিগেশান, ইলেকট্রিক মিলিয়ে।

তাদের মনোভাবও হয়েছিল মিশ্র। মিক্স্ড আর কি। ডাইরেক্ট বা সরাসরি লেখার জন্য বিরক্ত হয়েছিলেন অবশ্যই। কিন্তু ব্যক্তিগত কোনো সুবিধে আদায়ের ব্যাপার তো নয়। কোন বিতর্কমূলক ব্যাপার নয়। চাকরীর কোন সুযোগ সুবিধে বা প্রোমোশান চাওয়ার ব্যাপার নয়। যা কৃষ্ণমূর্তি করে দেন নি বলে ওপরে লিখেছে শীলা। তাই সেনসার হয় নি শীলার কাজ।

সরাসরি দরখাস্ত করলে কৃষ্ণমূর্তির সততায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। ত্রুটি সংশোধনে অনিচ্ছা বা অক্ষমতার কথা উঠে পড়ে। কটাক্ষ করা হয় তাকে। এ কথা তো ঠিক—।

দিন পনেরো কুড়ির মধ্যে একসপার্ট এলো একদল। আগে না জানিয়ে। হঠাৎ। বিদেশী একসপার্ট।

এসে উঠলো ইনসপেকশান বাংলোয়। কৃষ্ণমূর্তি ব্যবস্থা করে দিলেন, জায়গাও আর নেই কিনা!

প্রথম প্রথম জানাই গেল না এরা কারা। কেনই বা এসেছে! শৌখীন টুরিস্ট, অপরাপর দেশের বেসরকারী গণ্যমান্যের দল, না এরা কারা! কেনই

বা এসেছে! চিঠি নিয়ে এলো কৃষ্ণমূর্তির কাছে। বিদেশী এরা, আদর আপ্যায়নের ত্রুটি না হয়।

বিব্রতর দৌড়োদৌড়ি যথেষ্ট নয় ভেবে কৃষ্ণমূর্তি দৌড়লেন। দৌড় করালেন আমাকেও। ডিজেল চালিয়ে, টেম্পোরারি হলেও, গোটা কতো বাতি পাখা দিতে হবে—ইনসপেকশান বাংলোয়।

শীলা ছিল দুখানা ঘর জুড়ে। দি, কতোর জন্যে আরো গুটিয়ে নিল নিজেকে। একখানা ঘর ছেড়ে দিল! যেখানা ওর বসবার ঘর, সোফা সেটি আছে, আরশি আছে দেয়ালে—ছেড়ে দিল সেই ঘরখানা।

জিনিষগুলো রয়ে গেল—ওদের ব্যবহারের জন্য।

ইনসপেকশন বাংলোয় শীলার মতো মেয়েকে পেয়ে বেঁচে গেলেন মূর্তি। বিলেত ফেরৎ। বিলেতের আদব-কায়দা জানা লোক, কোথায় পেতেন তিনি। তা ছাড়া শীলা মেয়ে। আদর আপ্যায়নে যাদের জন্মগত প্রবণতা। শিক্ষার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু যখন জানা গেল ফাটল দেখতে এসেছেন এঁরা, কথা উঠল তখন। পাঁচ কথা উঠল। তার একটিই মাত্র উল্লেখের যোগ্য। আরও আছে। সে সব নোংরা কথা। ঋষ্যশৃঙ্গদের পুরে দেওয়া হয়েছে ঠিক জায়গাতেই।

উল্লেখ যোগ্য কথাটা এই। ড্রেসিং রুম কাম পারলার ছেড়ে দিয়েছে শীলা, বিদেশী অভ্যাগতদের জন্যে। শীলা নিজেও ঐ রুম ব্যবহার করছে। কাজেই উঠতে বসতে দেখা হচ্ছে, কথাবার্তা হচ্ছে। শীলা ওদের বোঝাচ্ছে। তাই শীলার মত-ই ওদের মতও হবে। মেয়ে ইঞ্জিনিআর—ওদের চোখেও বিস্ময়ের ঘোর। ওরা শীলার রায়ই দিয়ে বসবে।

কথাটা উঠেছিল নাকি চন্দ্রশেখর চৌধুরীর তরফ থেকে। আমার বিশ্বাস হয় নি! চৌধুরী ঐ রকম লোকই নন। তিনি তো বলছেনই—ক্র্যাক ইজ এ ক্র্যাক। নো-বডি ক্যান ফোর-সী। বেশ তো! এই যদি সাব্যস্ত হয় যে ক্র্যাক ডেঞ্জারাস, তিনি তো পে-মেণ্ট চান নি। নতুন গড়ে দেবেন। তবে হ্যাঁ, টাইম ফ্যাক্টর। সেটা কি করবেন তিনি! হয়ে গেছে ক্র্যাক—তার তো আর চারা নেই।

মনোরমা নাকি বলেছে—ইতি বিব্রত বদতি—সবটাই একটা আকচা-আকচির ব্যাপার। কোনো কারণে নাকি মনোরমার হাতে যথেষ্ট অপমান হয়েছি আমি। শীলা তো কিছুই নয়—সাইফার, শিখণ্ডি। ওর সব

মতলবই তো আমার। ওর বা ওর অফিসের সব চিঠিও ড্রাফট করি আমিই। ফাটলের ব্যাপারটা একটা ছুঁতো ছাড়া কিছুই নয়। আসলে সেই অপমানের প্রতিশোধ তুলছি আমি শীলার ঘাড়ে বন্দুক রেখে। মনোরমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে হেনস্থা করে। সেই সঙ্গে মনোরমাকে।

তিনদিন বাদে এক্‌সপার্টরা চলে গেলেন। ক্র্যাকটা তাঁরা দেখেছিলেন ছুঁতো করেই। সব কিছু দেখতে দেখতেই যেন হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলে-ছিলেন। তাঁরাও যেচে বললেন না, এঁরাও জিজ্ঞাসা করলেন না।

আমরা সবাই তটস্থ হয়ে রইলাম। কখন কি হয়, কখন কি হয়! মুখ চেয়ে রইলাম ডাক আর তার পিওনের। স্পেকটাকুলার একটা কিছু, চমকপ্রদ একটা কিছু হবেই।

দিন গেল প্রতিদিনের মতোই। কোন চমকই বয়ে আনল না ডাক-হরকরা। বয়ে যা আনত—সাধারণ রুটিন ম্যাটার। দৈনন্দিন। আমরা একটা কিছু বিধান আশা করে রইলাম। ফেটে যাওয়া ভিতের ওপরই অলটারনেটার বসাবো কিনা, সেটাও তো জানা দরকার।

তার করলেন কৃষ্ণমূর্তি। আপনাদের বিচারে কি হল জানাবার জন্যে। অলটারনেটার বসানোর কাজ চলবে কিনা। না বন্ধ থাকবে।

এইবারে উত্তর পাওয়া গেল। তা শীলার চিঠির পর মাসখানেক হয়ে গেছে।

ও ক্র্যাক সুপারফিশাল—ওপরের। ভেতরে পৌঁছয় নি বেশী। নজর রাখা দরকার। কিছু না হলেও নীল ছাপের পুরিয়া মুড়ে প্রতিকার পাঠিয়েছে তারাও।

হাতী ঘোড়া এমন কিছু নয় সে প্রতিকার। স্টিল রডের বাঁধন আছে তলায়। আর-সি তো! রিইনফোর্সড কংক্রীট। ছেনি হাতুড়ি দিয়ে খুঁড়ে ফেলতে হবে। দুপাশ থেকে ফাটলের গভীর অবধি। তারপর ভ্যালামযেড জাতীয় কোন জিনিষও দিতে পারা যায়। নতুন করে সিমেণ্টও ঢেলে দেওয়া যায়। সিমেণ্ট টিঁকতেও পারে। যাই হোক টেল-টেল পিস দেওয়া হয় যেন।

ওটা নিয়ে দুশ্চিন্তিত হবার কারণ নেই। তবে সমস্ত ফাটল সম্পর্কেই অবহিত হওয়া দরকার। সময় থাকতে। সে হিসেবে রিপোর্ট ও অনুসন্ধানের কাজ চালিয়ে ভালোই হল।

কাজ এগোতে লাগল। দেখা গেল সত্যিই অগভীর ফাটল। ইঞ্চি-খানেকও গভীর নয়। তবে লম্বায় অনেকটা।

আমার মনটায় খুঁতখুতি লেগে রইল। শীলার মতনই। এর ওপর অলটারনেটার বসবে। দুশো বত্রিশ ফুট ওপরের জল এসে পড়বে। তার নিজের স্বাভাবিক চাপ আছে। সে জলধারাটি বারো চৌদ্দ ইঞ্চি ব্যাসের বাটি-আকার ভেনসের ওপর পড়বে। স্পিণ্ডল ঘিরে বিশ ফুটের বেড়। পর পর বাটি সাজানো বেড়ের ব্যাসে। জল এসে পাশ থেকে চাপ দেবে। বাটির পর বাটি চাপ খাবার জন্য সামনে এসে দাঁড়াবে। চাপ খাবে সরে যাবে। পরের বাটিকে দুশমন জলের ঘুষির তলায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাবে। কতক্ষণ, মিনিটে দুশো পাক। জীবনের মতো চঞ্চল, নলিনীদলগত জলমতি তরলমের মত চপল। স্পিণ্ডলকে ঐ স্পীডে ঘুরিয়ে দিয়ে যাবে।

এই ঘোরার স্বাভাবিক কম্পন আছে একটা নিশ্চয়!

সব মিলে চাপ ও কাঁপের ওজন কিছু উপেক্ষার ব্যাপার নয়। অন্তত আমার তো মনে হল।

সিমেণ্টের বণ্ডেজই দেওয়া হল। টেল টেল পিস রাখা হল গোটা কয়েক। ফাটল বাড়লে টেল টেল পিস বলে দেবে। তার গায়ে লেখা রইল মেরামতের তারিখ।

সুরু হল অলটারনেটার বসানো। নির্মান কার্যের সর্বশেষ কাজ।

খুব বেশী দিন লাগল না। দিন পনেরোর মধ্যে বসানো শেষ। একসাইটার এসে পৌঁছল। সত্যি কিছু যান্ত্রিক ক্ষতি হয় নি তাদের। একটু তোবড়া-গাল। ভেতরের অংশ যেমন সক্রিয় ছিল তেমন বলিষ্ঠ।

অলটারনেটারের গায়ে বসাতে সে আর কতোদিন। দিন সাতেকে সব খতম।

চন্দ্রশেখর চৌধুরীর কাজও শেষ হয়ে এসেছিল। তাঁকে আজকাল এ শহরে দেখাই যায় না। বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন। হিল্লী দিল্লী বম্বে ট্রমবে।

ইতিমধ্যে একদিন বিব্রত এলো। এক অবাঞ্ছিত নিমন্ত্রণ নিয়ে।

মনোরমার কাছ থেকে এসেছে নিমন্ত্রণ।

বিব্রতকে বললুম: আজ সন্ধ্যেবেলা যাবার সুবিধে হবে না তো আমার। মিস চৌধুরীকে একটু বুঝিয়ে বলো তুমি।

ঃ কবে সুবিধে হবে তা হলে আপনার ?—স্মিত হাসিতে শুধোল বিব্রত ঃ গিয়ে বলতে তো হবে মনোরমাকে—

মুখের দিকে তাকালাম। এর আগে বিব্রতর মুখে মনোরমার নামটা শুনি নি। শুনেছি মিস চৌধুরী।

ঃ তাহলে বোলো, ও একেবারেই বোলো, তার নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ তাকে। তার সঙ্গে দেখা করার সুবিধে কোনদিনই হবে না আমার।

বিব্রতও খানিক মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এ সব কথা হয়েছিল অপিসে বসে।

সন্ধ্যেবেলা বিব্রত না এলেও বনোয়ারী এলো। একজন কেউ আসবে আমি জানতুম। মন বলেছিল আমার।

চিঠি দিল বনোয়ারী। প্রেম পত্র। প্রেম পত্র মানে কি ? আমার তো মনে হয় বাঁকা হাতের লেখাওলা পত্রই প্রেম পত্র। পত্রে কতোটুকু বলা যায়। যাহা হোলো না বলা যেন তারি বেদনাই শিউলি ঝরা প্রাত-কে বিমনা করে রেখে দেয়। যতোটুকু বলা হয়, না-বলা কথার আভাসের পরিমাণ তার শতগুণ থাকে। পত্রের না-লেখা সাদা জায়গাটায় বোঝাই হয়ে।

সে প্রেমপত্র আমি আজো রেখে দিয়েছি।

লেখা ছিল—ভয় পাবেন না। কথা দিচ্ছি, এর আগের দিনের ঘটনার পুনরুক্তি হবে না। একটু বিশেষ কথা আছে। এলে খুশী হই। ওপরে পাঠের জায়গায় কি লিখে হিজিবিজি করে কাটা। নতুন করে লেখা—মিঃ রয়। তলায় লেখা—আপনাদের নরমা।

মিঃ রয় ! ভেবে চিন্তে পাঠ লেখার আগে মনের প্রথম উচ্ছ্বাসে আমি কি ছিলাম ? পাঠোদ্ধার করতে পারি নি আজো তার। সেইটেই মনোরমার চোখে আসল আমি। হিজিবিজি কাটাটুকু যুক্তি তর্কজালের বিস্তার। প্রথমটা মনের আবেগ, পরেরটা উচিত বোধের সৃষ্টি।

গিয়ে অপরাধ না হলেও অপমানের কুণ্ঠায় পা জড়িয়ে ধরেছিল।

যেতেই মনোরমা বলছিল ঃ বসুন।

ভোলা রাগ আর অভিমান দাঁড় করিয়ে রেখেছিল আমাকে। দাঁড়িয়েই ছিলুম। আবার বলেছিল ঃ বসুন।

আমি উত্তরে বলেছিলাম ঃ বসতে পারছি না, অসুবিধা আছে একটু। একটা ফোড়া উঠেছে।

একটু হেসেছিল মনোরমা। বলেছিল: আমার দেওয়া অপমানগুলো এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। জমে ঠেলে উঠে ফোড়ার আকার ধারণ করেছে। মিষ্টি ব্যবহারের পুলটিশ দিয়ে গতি না করা পর্যন্ত ওটা টনটন করবেই। ততোক্ষণ আর বসতে বলছি না।

এইবার বসতেই হয়।—টেবিল ক্লথটা কি সুন্দর। মিষ্টি গন্ধ আসছে কোথেকে? ও, বোধহয় মনোরমার প্রসাধনের গন্ধ। ইস। কি ঝাঁঝালো গন্ধটা। সেই জন্যেই ঝাঁঝালো। মাঝে মাঝে কোন বাতাসে চেনা দিনের গন্ধ আসছিল। এসে চমক লাগাচ্ছিল বুকে! ক বছর? দু বছর মাস দুয়েক হবে! তাই না? প্রথম যে গন্ধটা পাচ্ছিলাম—সেটা কি মিষ্টি! সেইটেই দুবছরের আগেকার পুরোনো গন্ধ! পরে সেইটেই ঝাঁঝালো হয়ে গেল। মিষ্টত্ব হারালো না। পুরোনো হয়ে গিয়ে ঝাঁঝালো হয়ে গেছে মাত্র। চড়া উগ্রগন্ধ সেণ্টের মতো।

নীরবতাই অনেক সময় সত্যিকারের বাগ্মিতা। কিন্তু এ সেই ক্ষণ নয়। এখন নীরবতা মানে অনিচ্ছা। আর এক তরফে বোধহয় কবরে ফুল দিতে যাওয়ার বাক্যহীনতা।

পাড়ের কোণটা পাকিয়ে গোল করার কাজে মন দিয়েছিল মনোরমা। সেটা মনোযোগের অভাব বা অন্যমনস্কতা নয়। আসল মনোযোগ। গাম্ভীর্যের মেঘে মুখ প্রায় ঢাকা। অবনতমুখী। সিঁথির দুপাশে স্থির তরঙ্গের স্তর।

নীরবতা ভাঙল যে কথা দিয়ে তা প্রায় মর্মন্তুদ। একেবারেই আশঙ্কা করি নি এমন কথা শুনব।

একটু মুখ তুলে, হাসবার চেষ্টা করে মনোরমা বলল: আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি, মিষ্টার রয়!

ছোট্ট কথা। ভেবে দেখলে চমকাবার ছিল না। হঠাৎ লাগা ইলেকট্রিক শকের মতো তবু চমকে গেলাম, বুকের কোনখানটায় ঝিন্‌ঝিন্ করে উঠল যেন। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: তাই নাকি? কেন? কোথায়?

বিষণ্ণ হাসল মনোরমা: বেশ বলেছেন। যাবো না বুঝি! বাবা কাজ করবেন চণ্ডীগড় ভাকরা-নাঙ্গলে—আমরা এখেনে থাকবো কি করে? থাকবো কেন?

খানিক চুপ করে থেকে আবার বলল: রেখে তো দিলেন না! থাকবো কি করে?

আমার অন্যমনস্কতার জগতে গিয়ে চাবুক মেরে এলো যেন কথাটা :
য়্যাঁ?—কি বললেন কথাটা?

নিশ্চয় পুরোপুরি বস্তুতান্ত্রিক জগতে পৌঁছই নি। তাই আবার বলে ফেলেছিলাম : তা বেশ তো—থাকুন না। থেকে যাও। কোথায় যাবে। ওদিকে ভীষণ গরম, ভয়ঙ্কর শীত। জানো না?

মনোরমা হাসছিল। হাসি নয় কান্নাই হয়তো সেটা। : ও এক্‌স্ট্রীম ক্লাইমেটে অসুবিধে হয় না আমার। আমার অসুবিধে হয় টেম্পারেট ক্লাইমেটে। যে আবহাওয়া তাততে জানে না। যে মাততে, মাতাতেও জানে না। যেমন, যে অতিমাত্রায় শীত নয় সে হাড়ে কাঁপন ধরাতে পারে না। জানিয়ে দিতে পারে না নিজের তাপহীনতার প্রতাপ। তাকে ভুলে থাকা যায়। ভুলে অন্য কাজে মন দিতে পারা যায়।

চট করে মনে হয়ে গেল—মনোরমার মা দিশী মেয়ে নয়। শীতের দেশের মেয়ে। কিন্তু তাদের পেশোয়ারী শীত সহ্য হলেও কালাহারির গরম সহ্য হওয়ার কথা নয়। যাই হোক। কথাটা হয়তো রূপক। আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যবিত্ত মেজাজের লোক। টেম্পারেট ক্লাইমেট আমিই।

বললাম : না গেলেই নয়? কবে যাবে?

এইবার সত্যি হাসল মনোরমা। বলল : কোন দেশের একটা গল্প শুনেছিলাম। হয়তো তোমারও জানা। বেয়াই মশাই এসেছিলেন। থাকা কালে যতোরকমে পারা যায়, কাজে আর ব্যবহারে তাড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাওয়ার ভোজ্যে-ও বটে আয়োজনে আপ্যায়নেও। বেয়াই মশাই তো একবেলাতেই অতিষ্ঠ। দু বেলা থাকবার মনের অবস্থা খুঁজে পাচ্ছেন না। চলে যাচ্ছেন। নৌকোয় করে যেতে হয়। নৌকোয় চেপেছেন বেয়াই মশাই। যার বাড়ী এসেছিলেন তিনি তো আচ্ছা করে নৌকোর গলুই ধরে ঠেলা মেরেছেন। অর্থাৎ বিদেয় হও আপদ। সেই এক ঠেলায় নৌকো মাঝ নদীতে। পাড় থেকে চেঁচিয়ে বলছেন—আর কটা দিন থেকে গেলে হত না, বেইমশাই।—আপনারও হল সেই ব্যাপার।

সত্যিকারের হেসে লুটোতে লাগল মনোরমা।

মানুষ অনেক সময় হাসার জন্যে হাসে না, কান্না চাপতেও হাসে। মনোরমা হাসছে কেন, তা অবশ্য জানি না। হাসির ধমকেও জল এসে পড়ে চোখে—বিচিত্র নয়।

বললাম : উপমাটা একটুও মানালো না যাই বলো। আমি তো তোমাকে তাড়িয়ে দিই নি! তুমিই তাড়িয়ে দিয়েছ দু দুদিন। চৌধুরী মশাই কোথায় আজকাল—অনেক দিন দেখি নি মনে হয়।

: দিল্লী থেকে এসে দিন দুই ছিলেন। তারপরই তো পাঞ্জাব চলে গেছেন। তাও আজ তেরো দিন হয়ে গেল।

: দিল্লী? দিল্লী কেন?

: ডেকে পাঠিয়েছিল যে। তা ছাড়াও মাঝে মাঝে যেতেন। কতো কাজ থাকে—

ডেকে পাঠিয়েছিল? শুধুই কি চণ্ডীগড় ভাকরা-নাঙ্গলের কনট্রাক্ট করতে। না, ফাইলের বিস্তৃতি পৌঁছেছিল অতোদূর। কে জানে?

বললাম : যাবার তারিখ ঠিক হয়েছে নাকি?

: না। তবে—প্রায় ঠিক। বাবার টেলিগ্রামের অপেক্ষায় আছি। দু একদিনের মধ্যে এসে পড়বে মনে হয়।

ক্লিষ্ট হয়েছিলাম, সন্দেহ নেই। বলেছিলাম : এতো তাড়াতাড়ি!

মনোরমাও খুশী হয় নি, এটা ঠিক। বলল : বাঁচলেন, না?

বললাম : একটা কথা বলি, মনে কোরো না কিছু। একটা জিনিস চাই তোমার কাছে।

খুশীতে ঝিকমিকিয়ে উঠেছিল মনোরমার মুখ চোখ। হয়তো কিছুর প্রত্যাশায়।—কি চাই আমি! কি দিতে পেরে খুশী হতে পারবে নিজে! তখন লক্ষ্য করি নি। বাড়ী ফেরার পথে মনে পড়েছিল।

বলেছিল : কি? বলুন।

বলেছিলাম : আশমানের চাঁদ নয় কিছু। সামান্য জিনিষ।

আশা লেগে ছিল তখনও মনোরমার মনের আনাচে কানাচে। বলেছিল : আপনার কাছে যা সামান্য, আমার কাছে অসামান্যও হতে পারে তা। জানলেন কি করে? জিনিষটা কি?

: আপনার বনোয়ারীকে।

কেমন পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছিল মনোরমার মুখ। মুখের সমস্ত রক্ত লাল কণিকাগুলো লুকিয়ে ফেলেছিল যেন কোথায়। কথা বলে নি। বলে নি নয়, বলতে পারে নি, বুঝতে পারি নি তখন।

বলে গিয়েছিলাম : ওর বৌকে কথা দিয়েছি, ঘর বাঁধার সাহায্য করবো।

বনোয়ারী বৌকে ছেড়ে দিয়েছে কিনা। মেয়েটার নাম বেহুলা। বড়ো ভালো মেয়েটা। দেখতে শুনতেও চমৎকার। ঐ মেয়েকে ছেড়ে বনোয়ারী নাকি অন্য দিকে ঘুরে বেড়ায়! আর মেয়েটা ভাঙা ঘর আবার বাঁধতে পাগল! আমার জীপে উঠে দেওগাঁও গিয়েছিল। পাগলী মেয়ে। পুরোনো ঘরের এক ঝুড়ি মাটি নিয়ে এল জীপে করে। কাছে রেখে দিয়েছে। নতুন ঘর বাঁধবে ঐ পুরোনো মাটি দিয়েই। তার দু তিনদিনের মধ্যেই অস্তিত্বের মানচিত্র থেকে মুছে গেল দেওগাঁও বুল ডোজারের নাকের গুঁতোয়। ওদের বাড়ীখানা আগেই গিয়েছিল। মেয়েটার ঘর ভাঙল দুবার। কমপেন-সেশানের টাকা পেয়ে বনোয়ারী ছেড়ে দিল ওকে—সেই একবার, আর এখন।

হঠাৎ কৌতূহল জ্বলে উঠল মনোরমার চোখে: ও, যে মেয়েটাকে আপনার জীপে করে নিয়ে গিয়ে আবার ফিরিয়ে এনেছিলেন, সেই বেহুলা। সে-ই বনোয়ারীর বৌ! আর সেই ঘটনা নিয়েই যা তা বলেছে লোকে। আশ্চর্য তো! লোকের কথার মাথামুণ্ডু নেই দেখছি।

নিঃশ্বাস পড়েছিল আমার, মনে আছে। বলেছিলাম: যা বটে তার অর্ধেক তো বটে। মেয়েটাকে ভালোবাসি আমি। তবে সব ভালোবাসাই তো এক নয়। একরকম নয়। এটা মানো নিশ্চয়! ভালোবাসা মহাসাগর। একই ভালোবাসা কোথাও অতলান্ত, কোথাও প্রশান্ত। যার কথা ভাবতে ভালো লাগে, অথচ ভেবে বেদনা পাই, তাই তো ভালো লাগা। আমার তো তাই মনে হয়, তুমি কি বলো?

মনোরমা বলল: দেওগাঁও ছিল যেখানে তা হলে এখন সেখানটায় লেক—জল থই থই করছে, না! কোনখানটা বরাবর দেওগাঁও ছিল বলুন তো।

: ঐ যেখানটায় তুমি আমাদের গালে মুখে লঞ্চের ঢেউ এর চড় মেরে গেলে গোটা কতো। তুমি তো বুঝলে না কী সর্বনাশ হতে বসেছিল সেদিন! শীলা এমনি করে এসে এতো জোর চেপে ধরেছিল—একদিকে এতো নিচু হয়ে গিয়েছিল নৌকো যে, জলই উঠে গেল খানিক। অল্পের জন্যে ডোবে নি। অনায়াসে ডুবে যেতে পারত। বকব কি শীলাকে? দেখি মড়ার মুখ হয়ে আছে। এতো ভয় পেয়েছিল শীলা! বহুক্ষণ পর্যন্ত মনে হয়েছিল আমার, মিস মজুমদার অজ্ঞান হয়ে যাবে বোধহয়! বিবর্ণ। সমস্ত মুখখানা কাগজের মতো শাদা, চোখের তারা স্থির। ঠিক যেন মৃতদেহটাকে বসিয়ে রেখেছে কেউ!

মনোরমার মুখেও কৌতূহল অচঞ্চল ছায়া ফেলেছে: এত ভয় পাবার কারণ?

বললাম: শীলা খুব ভালো সাঁতার জানে যে! একেবারে পাথর বাটি। অথচ, মচকাবে না। নৌকোয় ওঠাব আগে বলে নি আমাকে। ঘাটে গিয়ে জেনে এলাম মোটর লঞ্চ আগেই বুক করে গেছে কেউ। সে কেউ যে তুমি —জানি নি তখন। অথচ সেই দিনই আমাদের ফুলডহর যাওয়া চাই। আর কিছু না পেয়ে সাধারণ নৌকোই ভাড়া করে এলাম। শীলাকে বলি নি, প্রয়োজন মনে করি নি বলেই। সময়মতো ঘাটে পৌঁছলাম। ঘাটে এসে শীলার মুখ কেমন হয়ে গেল। তখন বুঝি নি সাধারণ নৌকোয় গেলে ডুবে যাবার ভয় ওটা! তখুনি বললেই মিটে যায় কিন্তু। শীলাকে নিয়ে যাবারও দুঃসাহস করি নে। যে শুধু ডুবতে আর ডোবাতে জানে তাকে নিয়ে ভাসা যায় না। ভরাডুবি হতে হয়। জানো তো যে ডুবছে সে, যে তাকে বাঁচাতে যায় তাকে ভীষণ জোরে আঁকড়ে ধরে। জড়াজড়ি করে তাকেও অর্থাৎ ত্রাতাকেও ডুবিয়ে মারে—। ওঃ সেদিন কি বাঁচাই বেঁচেছি! কি বলব তোমাকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমারও যেন আর সাড়া ছিল না।

বিস্ময়ে গোল হয়ে এসেছিল মনোরমার নিস্পলক চোখ দুটো। বলল: সেদিন বাঁচো নি। বাঁচলে আজকে।—একটুও সাঁতার জানেন না মজুমদার! অবাক তো!

: চালাতে জানেন দুটো—মোটর আর বন্দুক। চড়তে জানেন তিনটে—ঘোড়া, হাতী, গাছ! মেরামত করতে জানেন সব কিছু। চালানো একটা বাদ পড়েছে। ওর সঙ্গে যোগ হবে হাতুড়ি। এ রকমের মদ্দা মেয়ে—সে জানে না সাঁতার। ভাবতে কি কম অবাক লাগে? সত্যি আশ্চর্যের কথা।

: অথচ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এলো। নৌকোয় উঠতে ভয় পায়, পার হয়ে এলো জাহাজে!

আমি বললাম: আচ্ছা, তুমি ও-কথা বললে কেন নরমা—সেদিন বাঁচোনি, বাঁচলে আজকে—

ছলছল করে এলো মনোরমার চোখ: বুঝেছ তুমি রয়, ঠিকই। যাচাই করে নিতে চাও, না। এতোদিন দুর্নামের পাঁকের সাত হাত তলায় ডুবে ছিলে তুমি। ভেসে উঠলে আজ সুনামের সূর্য্যালোকে।—অনুপম, অনুপম, এতো দেরী করলে কেন? বড়ো দেরী করে ফেললে যে! টেলিগ্রাম এসে

গেল। আর তো দেরী নেই। টেলিগ্রাম তো রোখা যায় না আর।—সেই ভুল আমার ভাঙল। বড্ডো দেরীতে। সব ভুলই ভাঙল। অনুপম আগে বলো নি কেন?

ঃ কি করে জানবো ভুল ভাঙাবার আগ্রহ ছিল তোমার—ভুল ভাঙলে খুশী হও তুমি। আমার জ্ঞানও যে এলো দেরী করে নরমা!

বর্ষার বন্যায় ভেঙে পড়ল মনোরমার চোখের তট। ঃ অনুপম, এতো জিনিষ থাকতে তুমি চাইলে কিনা বনোয়ারীকে। এতোখানি অপমান করতে পারলে! তুমি কি কিছু পাও নি আমার কাছে যে ঐ তুচ্ছ জিনিষটা চাইলে! এ শুধু আমাকে অপমান করার ছল ছাড়া কিছু নয়। আমি অপমান করেছি তোমাকে—এ তার শোধ দেওয়া। আমি কি বুঝি না কিছু!

আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিচার বিবেচনা লোপ পেয়ে গেল সব। কিসে অপমান, কিসে সম্মান, আমি যে আজ তাও ভুলে যেতে বসেছি। এতে অপমানের কি হল, সত্যি ভেবে পাচ্ছিলুম না। এর আগে অসময়ে দেখা করার চেষ্টা করেই তো যথেষ্ট অপমান করে গেছি। আজ কি চাইলে সম্মান দিতে পারতুম, বুঝতে পারছিলুম না। হায়রে, মান অপমানের সংজ্ঞাই ভুলে গেলুম শেষে!

টেবিলের ওপর হাতে মাথা রেখে কাঁদছিল মনোরমা। কটকী ছাপার ব্লাউজ ছাড়া পিঠে কিছু নেই। পিঠের আঁচল লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। কাজেই বুকেরও।

আমি কি বলব, কিছু করব কিনা—পিঠে সান্ত্বনা বুলোব কিনা, হাত রাখব কিনা মাথায়, ভাবছিলাম। শরীরে কতোটুকু পর্যন্ত সম্মানের বেড়া, কোনখানে অপমানের শুরু—কেউ জানে না আমি জানব কি করে।

হঠাৎ দেখি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে গেল মনোরমা। মাটিতে লুটিয়ে পড়া আঁচল টেনে নিয়ে বুক পিঠে চড়াতে চড়াতে চৌকাঠ পার হয়ে গেল। চোখের জলে গালে লেপ্টে রয়েছে চুল। কলঙ্ক না হলে চাঁদকে মানাতো কি!

তখনই বুঝলাম—ঘরের নয়, মনোরমা পার হয়ে গেল জীবনের চৌকাঠ। পার হল আমার জীবনের চৌহদ্দি।

সেদিনের চেয়ে আশ্চর্য আমার জীবনে বড়ো বেশী হই নি। পৃথিবীতে এককালে সাতটা আশ্চর্য ছিল। মনের পৃথিবীতে কতো আশ্চর্য আছে, কয় শো—কে তার হিসেব রাখে! নিত্য নতুন মুহূর্তের দুয়ার ধরে কতো বিস্ময়, কতো আশ্চর্য!

ট্রেনের কামরার দুয়ার ধরে সত্যিই চলে গেল একদিন মনোরমা। আগের ঘটনার পাঁচদিন পর। হাসতে হাসতেই গেল। মুখ-ব্যাদান মাত্রই যদি হাসি হয় তবে সে হাসিই। আর না হাসবেই বা কেন?

বিব্রত উঠিয়ে দিতে এসেছিল। ক'উকে ট্রেনে সী অফ করতে এলে হাসতে শিখি নি আমি। ব্যাজার মনের ছাপ পড়ে মুখে, ছায়া পড়ে চোখে। এ আমার পড়েই। হাসি তো অনেক দূর—

তুলে দিতে এলেও—বিব্রত কিন্তু হাসছিল। শুধু তাই নয়। কেমন একটা গৌরবের ভাবও ছিল সেই সঙ্গে।

জিনিষ-পত্র বেশী ছিল না। জিনিষ-পত্র নিয়ে যাচ্ছে না। গোটা দুই হোল্ডঅলে যা ধরে তার বেশী নেই। দু তিনটে চামড়ার কেস। টুকিটাকি এটা ওটা। খুব কমই। দুটো আডাইটে টিফিন কেরিয়ার এআর ট্র্যাভেল ব্যাগ—

ট্রেনে চলতে বড়লোকেরা বেশী জিনিষ নেয় না সঙ্গে। পথের প্রয়োজন-টুকুই নেয় মাত্র। লগেজ ভ্যান, গার্ডের হেপাজত আছে—তাদের লট বহরের জন্যে।

বিব্রত মাল তুলল গাড়ীর কামরায়। কাঁকরওলা প্ল্যাটফরম থেকে উঠে গেল মনোরমা ফার্স্টক্লাসের নরম গদীতে। সত্যি প্ল্যাটফরমে বড়ো কাঁকর! প্ল্যাটফরম তো ঠিকানা নয়। ঠিক ঠিকানার নিমন্ত্রণ মাত্র। চলতি পথের ধারে সাময়িক স্থিতি। ট্রেণের আসার প্রতীক্ষায় পাতা কুশাসন।

বিব্রত মাল তুলল। মনোরমা উঠল। আয়ীমা ইতস্ততঃ করছিলেন। মনোরমা বলল: এখন এখানেই উঠুন।

আয়ীমাকে তুলে দিল বিব্রত। সর্বশেষ তুলল নিজেকে। মালপত্রের স্থিতি আর অবস্থানের তদ্বির করতে।

প্ল্যাটফরমেই আমার স্থান। আসা যাওয়ার পথের ধারে। আমার স্থিতি ওএটিংরুমে।

প্লাটফরমেই ছিলাম। মনোরমার মনের নয়, গাড়ীর বাতায়নের মুখোমুখি।

গার্ড বলল, গাড়ী ছাড়ো। গার্ডেরা মুখে বলে না, বলে বাঁশীতে। অনেক

গার্ড আবার আছে, না বাজায় বাঁশী না ওড়ায় নিশান। গাড়ী ছেড়ে দেয়। তাদের আপনারা দেখতে পান না।

ড্রাইভার প্রকাণ্ড বড়ো হাতলটা অল্প টেনে দিল। নড়ে উঠল গাড়ীটা। বিব্রত নামছে না দেখে চেঁচিয়ে উঠলুম: বিব্রত করছ কি? নেমে এসো তাড়াতাড়ি! এখুনি গ্যাকসিলারেট করবে যে!

বিব্রত নামল না। আমি বললেই বিব্রত নামবে? কেন। আমি কি উঠিয়েছি। সিংহাসনের উপর থেকে হাসতে লাগল। সিংহাসন সুদ্ধ ছেড়ে দিল গাড়ী। তাকিয়ে দেখি সিংহাসন একটা নয়, দুটো। দরজায় একটা রাজপুত্রের, জানলায় একটা রাজকন্যার।

গায়ে না হলেও কোথায় যেন বেদনা টের পেলুম। চলতি পথের ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে যেন কেউ—লাল কাঁকরের প্লাটফরমে। সিংহাসন থেকে।

আমার জন্য তুলে রাখা সিংহাসন। নিজের বুদ্ধির ভুলে, না কারো ষড়যন্ত্রে জানি না। তাতে চড়ে গিয়ে বসল কোটালপুত্র।

রাজকন্যা বলল: চলি অনুপম। কে জানে দেখা হবে কিনা আর? দোষ করেছি অনেক। ভুলে যেও—

রাজকন্যার মুখে হাসি—ঠোঁট লাল। কার যেন মর্মের রক্ত লেগে।

চেঁচিয়ে বললুম: চণ্ডীগড় যাচ্ছো আগে—না মুসৌরী।

একশো চাকার লক্ষ আওয়াজের ছুরি আমার কথাটা চিরে চিরে ফেলল। আস্ত অখণ্ড রূপটা পৌছতে দিল না ওদের কাছ পর্যন্ত—। আমার মুখে এসে লাগল ওদের চলার বেগে পিছনে উৎক্ষিপ্ত ধুলো।

হাতের মুঠোয় চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে পারলেই খুশী হতুম বোধহয়। প্লাটফরমে দাঁড়িয়েই হয়েছিল এ ভাবনাটা। অনিমন্ত্রিত কেন গিয়েছিলুম 'সী-অফ' করতে! নিজেকে ধিক দিচ্ছি বার বার। ওরা তো ডাকে নি। বিব্রতর কাছে খবর নিয়ে নিজেই গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম চমক নিয়ে যাচ্ছি মনোরমার জন্যে। দেখা হলে না ডাকার জন্যে লজ্জা দেবো।

সেন্ট্রাল ওআর্কশপে আজকাল আর রাত্রে কাজ হয় না। দরকার হয়না তাই কিছু কিছু পাওআর পাচ্ছি আমরা। পরিমাণে সীমিত, সময়ের সীমানা টানা। এগারোটা বাজলে নিভিয়ে দেয় আলো—

ইলেকট্রিক আলোতে বসে বসে পড়ছিলাম। পড়ছিলাম চোখের জলে।

অনুপম, বিব্রতর কাছে শুনেছি, আমার যাওয়ার তারিখের খবর রাখছ তুমি। কেন? একেবারে বিদায় করে স্বস্তি পাচ্ছ না বুঝি। চলেই তো যাচ্ছি, তবু এতো তাড়া।

কি জানি, যদি স্টেশনে আসো। আমাকে তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হতে আসতেও তো পারো। তাই এই চিঠিখানা লিখলাম।

সে ভুল আমার ভাঙল অনুপম। বড়ো দেরী করে ভাঙল। না ভাঙলে এই অস্বস্তির সৃষ্টি হত না। যে অস্বস্তি নিয়ে আজ চললাম। মানুষ নিরঙ্কুশ স্বস্তি পায় এ ব্যবস্থা তো করেন নি ভগবান। আমিই বা আশা করি কেন?

বাবার কাজে সাহায্য করার বিব্রত, স্থির হয়ে গেছে। আমার কোন কাজে লাগবে কিনা বুঝে উঠতে পারি নি। যাচাই করতে চাই। ও চলুক আমারই সঙ্গে। এখানে লম্বা ছুটি নিয়েছে।

ভুল হয়তো এটাও। কোনটা বড়ো ভুল কে জানে। তার বিচার তো আমার হাতে নেই। তার বিচার কালের হাতে। ভুল ভুলই। সংশোধনের উপায় না রেখেই সময় ফেরারী হয়। কি আর করি। ভুলকে ডেকে এনে শুধরে নেবার সুযোগ দেয় না সময়। তা যদি হোত তো কোন দুঃখই থাকত না পৃথিবীতে।

একটা কথা। বিব্রত ছেলে হিসেবে বড়ো ভালো। কথা শোনে খুব। তুমি তো দেখেছ। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। ভালোবাসতে বললে হয়তো ভালোবাসতেও পারবে। এই একটা ভরসা। ধোপে টিঁকলে তাই না হয় বলবো।—

তুমি তো ভাবছো, আপদ গেল। বাঁচলে।

নিরাপদে থেকো দুজনে এবার।

চলি—

এগারোটা বাজল ঠিক এই সময়েই। স্মৃতির আলো জ্বালিয়ে দিয়ে নিভে গেল ঘরের বাতি। সেই মশালের আগুনে আমার রাত্রির ঘুম দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

এখানে এসে গোড়ার দিকে মনোরমাকে ভালো লেগেছিল। মুগ্ধ বিস্মিত ভীত ভালোলাগা। রূপে মুগ্ধ, উল্টোপাল্টা ব্যবহারে টাকাকড়ির ঐশ্বর্যে বিস্মিত, উগ্র সৌন্দর্যের ঔজ্জ্বল্যে ভীত। পতঙ্গের আগুনকে ভালোলাগা। কতো মৃতদেহ আগুনের বুকে দেখেও তবু আর একটি পতঙ্গ ঝাঁপ দেয় না? দেয়। আমি ভয় পাচ্ছিলাম আনন্দময় হলেও ঐ মৃত্যুতে।

চেষ্টা করে দূরে সরে গেছি মনোরমার আওতা থেকে। চলে গিয়েছি ছায়ার প্রভাব থেকে। আমি ক্ষুদ্র। উদ্বাহু বামনের লজ্জা পেতে চাই নি।

তার মাস কয়েক পর এলো শীলা। খাপ খোলা তলোয়ার, লোহার তৈরী। আগুনে তৈরী চাবুক নয়। এ আর এক বিস্ময়। অনমনীয় দৃঢ়তা। অদ্ভুত এর জীবন যৌবন বিবাহ সমাজ সম্পর্কে ধারণা। বিবাহ যে মেয়ে করবে না, কি করবো তাকে নিয়ে বিবাহের চেয়ে বড়ো নৌকোয় ভেসে। বিবাহ যার কাছে বাহুল্য, প্রেম যার কাছে আবর্জনা অতএব বর্জনীয়, তার আওতায় নিরাপদে চাকরী করা যায়। বিবাহের কথা ভাবা যায় না। যে মেয়ে এক ছাদের তলায় অটো গ্রুবার্টকে নিয়ে থেকেছে। কলেজ জীবনে ক্যাম্পের রাত্রিতে কুড়ি বাইশটি সিংহের হিংসাকে বশ মানিয়ে এসেছে। চোখে তার ইলেকট্রিক হুইপ্ আছে নিশ্চয়। কৃষ্ণমূর্তির মতো জ্যান্ত জানোয়ারকে কৌশলে পোষ মানিয়ে কাটিয়ে এসেছে দুটো চলন্ত রাত্রি, সে কি মেয়ে?

বিলেতে ডাক্তারকে দিয়ে শরীর থেকে স্ত্রী চিহ্নগুলি উঠিয়ে নিতে চেয়েছে। ফুটিয়ে দিতে বলেছে পুরুষের বলিষ্ঠ পুরুষালি। মন তো তার আগেই পুরুষ হয়ে গিয়েছে। তাকে না করা যায় বন্ধু, না বাঁধা যায় বন্ধনে।

শীলার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছি। শীলার কথা বলা—কাজ করেছে বশীকরণের। তবু সযত্নে চলে গিয়েছি দূর থেকে দূরে। এই মেয়েকে ভালোবাসা যায় না।

ছেলেমানুষী প্রেমের বয়স নেই আমার। পাশ করেছি চাকরী পেয়েছি। স্থিতি হতে চাই জীবনে। সেই বাস্তবের কষ্টি পাথরে দাগ ফেলে যাচাই করে নিতে হবে আমাকেও।

মাঝখানে কয়েকটা দিন গেছে, মনস্থির করতে পারি নি আমার মন। মনের দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের কাঁটা নিরন্তর ছটফট করেছে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর

পরিবর্তী আকর্ষণে। স্থির হতে দেয় নি, স্থির থাকতে দেয় নি। মনোরমার নীচতা যদি বিকর্ষণে দূরে ঠেলেছে, শীলার জীবন দর্শন উদ্ভট হয়েও টেনেছে প্রাণের মধ্যে। তারপর যেই মনে হয়েছে মনোরমার নীচতার ভিত্তিমূলে আছে হয়তো আমাকে পাওয়ার চেষ্টা—তখুনি শীলাকে মনে হয়েছে অদ্ভুত অবাস্তব। যাকে প্রশংসা করা যায়, ভালবাসা যায় না।

মনোরমা যদি সুদূর চাঁদ—শীলা কুয়াশা, কুয়াশায় ঢাকা দিগন্ত।

আমার জীবন থেকে বিদায় নেবার পর প্রথম বুঝলাম মনোরমাকে কতো-খানি ভালোবেসেছিলাম। কতো অপমান করেছে মনোরমা। অপমান কাকে করা যায়? মনের মধ্যে সম্মানের আসন পাতা আছে যার জন্যে, তাকেই লোকে অপমান করে। মনোরমার মনে আমার জন্য কোন দুর্বলতা না থাকলে তার একমাত্র পথ হোতো—ঔদাসীন্য। উদাসীন হলে যদি কাজ মিটে যায়, অপমান করার কষ্ট করে না কেউ।

জড়িয়ে ধরতে চাওয়ার [illegible] অপমান কান্নাকাটি। তা নইলে এড়িয়ে যাওয়ার রাজপথ তো আছেই। পরিচিতির জন্য এই পথ, প্রিয়র জন্য নয়।

বেশীদিন নয়, পরদিনই।

মনোরমার চলে যাওয়ার পরদিনই আপিসে বসে শীলা বলেছিল : সত্যি, কেন গেলে না তুমি মুসৌরী। আমি তো ছুটি দিতে চেয়েছি, আপত্তি করি নি তো। তোমার মুখখানার দিকে চাওয়া যাচ্ছে না আর অনুপম।

লুকোই নি। অকপটে স্বীকার করেছিলাম : আই হ্যাভ মিস্‌ড দি বাস, শীলা।

: কেন যে তুমি সেদিন নৌকো করে বেড়াতে নিয়ে গেলে না।

: তুমি নিষেধ গেলে বলে। এক সঙ্গে দু নৌকোয় যাই কি করে?

এরপর শীলা বোধহয় বলেছিল : তুমি মিস চৌধুরীর নৌকোয় গেলে না বলেই আমি কাজে নিয়ে বেরোলাম।

সে সব কথা কানে যায় নি আমার।

বাংলোটা একতলা।

বেতের সোফা সেটি পাতা বারান্দায়। সবুজ রং করা। ঘোরানো বারান্দা—গোল! সামনের ঘরখানা অর্ধবৃত্তাকার। তারি কোলে কোলে বারান্দাও অর্ধবৃত্ত।

মুখ নিচু করে কিছু বুনছিলেন এক ভদ্রমহিলা। পিঠে চুল ফেলে।

লোহার গেটে লোহার আগড়টার শব্দ হল আমার হাতে। আমার যাওয়ার ধাতব ঘোষণা।

মহিলা মুখ তুলে দেখলেন না, চোখ তুলে দেখলেন বলেও মনে হল না। হয়তো ভ্রূ তুলেছিলেন বারেক। জানি না।

গেট থেকে পথটুকুর দুধারে কোণা-উঁচু ইটের খাদরি। পথটুকুও কিছু কম না।

আমি আগন্তুক। তা সত্ত্বেও মহিলা কোনরকম নজর বা খেয়াল দেবার দরকার মনে করলেন না। আশ্চর্য! আমি চোর গুণ্ডা বদমাইসও তো হতে পারি। মহিলা নির্ভীক তো খুব!

অস্বস্তি বোধ করতে করতে বারান্দা অবধি পৌঁছে গেলাম। এতোই তুচ্ছ আমি—নজর তুলবার সম্মানটুকুও পেতে পারি না।

ঃ মিস মজুমদার বাড়ী আছেন? ডেকে দেবেন একটু!

মুখ উঠল না তবু। চোখ দুটো উঠল একটু, ভ্রূ দুটোকে ঈষৎ উঁচুতে তুলে।

ঃ বোসো রয়! কবে এলে?

সেলাইটা তুলে দাঁতে একটা সুতো কাটতে মন দিল শীলা। সুতোকাটা শেষ হলে মুখ তুলল এবার। এই যে দুবছর পর দেখা আগ্রহ-অনাগ্রহ, আনন্দ-আনন্দহীনতা কোনোটাই নেই শীলার মুখে চোখে। আশ্চর্য! আশ্চর্য ঠাণ্ডা উত্তাপহীন মেয়ে। মেয়ে নয়, পাথরের মেয়ে-পুতুল!

আবার বলল শীলা ঃ বোসো—। বলল পরের সিলেবলটায় লম্বা টান দিয়ে। বসলাম। কি বলে আরম্ভ করব বুঝতে পারছিলাম না। কোথায় শুরু করব কোথায় শেষ! সুস্থির কিছু চিন্তা করে বের করার আগেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঃ এ তো মেয়েলি কাজ শীলা! তুমি করছ মেয়েলি কাজ?

পাথরের চোখের উপর থেকে সরে গেল পাথরের চোখের-পাতা। ঐ একটা জায়গায় জীবনের না থাকলেও জীবিতের চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য ভুল বললাম—চিহ্ন, লক্ষণ।

: একা একা থাকতে পারি না আর। ভূতে ধরে!—অল্প হাসবার প্রাণপণ চেষ্টা করল শীলা।

: ভূত! ভূত মানে?—ভয় পাই নি নিশ্চয়ই। ইঙ্গিতটা কিসের জানা দরকার।

এইবার মুখটার ব্যাদান হল একটু। চেষ্টা করলে এটাকে হাসি বলা যায় তবু!

: ভূত মানে জানো না? পেত্নীর পুংস্করণ। এসে ঘাড় মটকে দেয়!

হেসে ফেললাম। বললাম: আমি একা থাকলে আমাকে তা হলে ধরবে পেত্নীতে। তাই তো! চালাকি রাখো। কি বলছিলে, খুলে বলো—

এইবার সীরিয়স মনে হলো শীলাকে। সীরিয়স নয় শুধু, ক্লান্তও।

বলল: ভূতের যে অর্থে অতীত; সেই ভূত গো! বুঝতে পারছ না!

বললাম: তাই যদি হয়, হাতের এই সেলাইটা কি? যার সাহায্যে ঠেকিয়ে রাখছ ভূতকে। সেলাইটা কি রোজা?

আবার হাসির চেষ্টা: বাংলা রোজা নয়, ইংরেজি রোজা।

আমি হাসলাম: 'রোজ' তো দেখতেই পাচ্ছি। ডি-এম-সি তৈরী গোলাপের পাপড়িতে গন্ধ থাকে না শীলা! রং যা থাকে তা অনুকৃতি মাত্র। আর স্পর্শে তো সে নরম নেই-ই।

শীলা বলল: গন্ধ তো কবেই গেছে।—ফুলই ফুটল না জীবনে। ফোটাচ্ছি কাপড়ের ওপর। পারবো কিনা জানি না, চেষ্টা করে যাই। দেখছ না, কাপড়ের টুকরোটা শাদা—কোন রং নেই তাতে। ভবিষ্যতের মতো বিবর্ণ—

অতঃ কিম। এবার কি বলি!

বললাম: আরো কি ফুল ফোটাতে চাও ভবিষ্যতের ডাঁটিতে! চাকরীতে তো অনেক দূর উঠেছো। বাকি আছে য়্যামবাসাডর হওয়া। সেটাও না হয়ে ছাড়বে না দেখছি!

শীলা মনোযোগ সরিয়ে আনল হাতের সেলাই থেকে: য়্যামবাসাডর! রাজদূত! তার দূত করে কোন দেশের রাজা পাঠাবে আমায় বলো?

থামল একটু যেন। হাসল। পরে বললো: রাজদূত হয়ে কি হবে? রাজপুত্রদূত হতে পারলে হোত!—যাকগে! তারপর বল, কবে এলে? কেন এসেছো? কাজে, না বেড়াতে?

: আচ্ছা শীলা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি—আমায় দেখে চমকালে না

তো একটুও। এতোদিন পর দেখলে, তাও হঠাৎ! সাধারণ মেয়ে হলে নিশ্চয় চমকাতো। তুমি বলেই চমকালে না। গলার স্বরে না ফুটলো বিস্ময়, চোখের দৃষ্টিতে না এলো আনন্দ। তোমার নামটা ঈ দিয়ে বানান না করে হ্রস্ব ই দিয়ে বানান করলে কি হয়?

চোখে বুদ্ধির বিদ্যুৎ আজো খেলে যায় শীলার। মানুষের বহিরঙ্গের অনেক কিছু বদলাতে পারে, বদলায়ও। বদলায় না বোধহয় চোখের দৃষ্টি আর হাসির ধরণ।

শীলা বলল : দীর্ঘ-ই তো ছিলাম, হ্রস্ব করেছ তোমরাই। বানানো সম্পূর্ণ করে, বানান বদলাতে চাও এখন।—অনেক অনেক দীর্ঘ ছিলাম, কেমন যেন হ্রস্ব হয়ে গেছি, খাটো হয়ে গেছি। তোমাদের ওজন কি কম? দাবিয়ে দিয়েছ আমার বাড় বাড়ন্ত দীর্ঘতা।

: ওজন। আমার? বলো কি। আশ্চর্য হবার পালা পড়েছে আমার আজ।—তুমি হ্রস্ব হয়েছ কিনা জানি না, তোমার চুল দীর্ঘ হয়েছে কিন্তু—। দৈর্ঘ্যের দিকে অভিযান তোমার স্পষ্ট। দৈর্ঘ্যের দিকে, রঞ্জনের দিকে। মনে তোমার রং লেগেছে মনে হয়। আভাস পড়েছে নখে, আভা লেগেছে গালে। রং লেগেছে আবহাওয়ায়। পাউডারের প্রলেপ লেগেছে। এ কি পরিবর্তন তোমার?

: পরিবর্তন। তাই নাকি?—হো হো করে হাসল শীলা। কণ্ঠ সেই বলিষ্ঠ আর পুরুষালি। কিন্তু নিস্তেজ।

: পাউডার। পাউডার কোথায় দেখলে তুমি? হা ঈশ্বর। বিভূতি। নীলকণ্ঠ হয়েছি যে আমি। বিভূতি মাখবো না।

: নীলকণ্ঠ! কেন? কি গরল ধারণ করে নীল হলো কণ্ঠ তোমার? গরল তোমার কাছাকাছি কোথায়? সুখ ঐশ্বর্য উচ্চপদ মর্যাদা। তুমি ইউনিক। অদ্বিতীয় তুমি, তুমি অসাধারণ। গরল কোথায় তোমার পারিপার্শ্বিকে?

অত্যন্ত সীরিয়স দেখাল শীলাকে। হাতের সেলাইটা নামিয়ে রাখল টেবিলে। বলল : কণ্ঠে কি-গরল ধারণ করেছি শুনবে? স্বর গরল। স্বর গরল নয় স্মরণ গরল। ঐ যে, অদ্বিতীয় আমি, অদ্বিতীয় থাকতে হবে আমাকে—পিতৃ উপদেশের সেই স্বর গরল। আচ্ছা অনুপম তোমরা ধরে বেঁধে সাধারণ করে দিতে পারো আমায়! পারো না? আমি যে অদ্বিতীয়-তার সিংহাসন থেকে নামতে পারলে বাঁচি এখন। আর চাই না আমি,

আর পারছি না আমি! তোমরা টেনে নামাও আমাকে অনুপম! অদ্বিতীয়-তার একাকিত্বে আমি যে পাগল হয়ে যাচ্ছি!

: টেনে নামাবো কি করে? তুমি নেমে এলেই পারো। কেউ কি কারোকে নামাতে পারে, না, নামানো উচিত!—হেসে বললুম: মেয়ে হলে না হয় কথা ছিল! বিলেত ঘুরে ইঞ্জিনিআর হয়ে এসে দ্বিতীয় হতুম তোমার। টেনে নামাতে হোতো না।

শীলা আমার আগেকার কথার খেই ধরে বলল: নেমে আসতে পারছি কই? একে তো আপনা থেকে নামা যায় না, কারোর হাত ধরে নামতে হয়। তা ছাড়া নামতে চাইলেও কেউ বিশ্বাস করে না। মুখের দিকে শ্রদ্ধা নিয়ে তাকায়! কি করি বলো তো! এ এক জ্বালা হয়েছে আমার!

আধা বয়সী একটি পশ্চিমী সুইচ টেনে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। চায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই শীলা বলল: সাহাব কা খানা ভি বনাও।

থেমে থেমে বললাম: আমার খানা?—রাত্রের?

শীলা বলল: কেন? অসুবিধে আছে? উঠেছ কোথায়? অসুবিধে হলে থাক।

আমি বললাম: না না, অসুবিধে আর কি!—আমাকে হঠাৎ দেখেও চমকালে না কেন, তা তো বললে না!

শীলা বলল: আর তো চমকাই না। চমকাবো? তোমাকে দেখে। কেন? আমি তো জানতুমই তুমি আসবে! যাকে আশা করা যাচ্ছে সে এলে চমকে ওঠে নাকি কেউ?

: আনন্দ তো হয়! তাই বা হোলো কৈ?—আমি আসবো তুমি জানতে? কি করে জানতে? আমি নিজেই যে জানতুম না একদিন আগে!

: আমি জানতুম। আমার মন জানত, কাজেই আমিও জানতুম। —আর আনন্দ হলে কি করতে হয় শিখিয়ে দাও, তাই করব ভবিষ্যতে। লাফিয়ে উঠব?

হেসে ফেললুম: ওটা কি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে! লাফিয়ে উঠবে, হাত বাড়িয়ে বলবে হ্যাল্-লো—

: আবার সেই হ্যাল্-লো, অনেক শুনেছি জীবনে। ওই হৃদয়হীন সম্ভাষণ শুনতে শোনাতে চাই না আর!—তারপর, ইনচার্জগিরি কি রকম লাগছে? আমি যাওয়াতে আমার ওপর কি-রেগেই গিয়েছিলে! তোমার পোস্ট

কেড়ে নিলুম। তোমার উন্নতির রাস্তা রইল না আর। কতো কি!—আরে বাপ্ বরাত কারো কেড়ে নিতে পারে কেউ?

হাস্য পরিহাসের সুরে তারল্য নিয়ে এলুম ভারী আবহাওয়ায় : এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে রঘুরাজ!—ভূতের মুখে রামনাম! বিলেত ফেরৎ মেয়ে, তায় বিদ্যুৎ-বিদ্যা বিশারদ। অর্থাৎ পুরোপুরি বাস্তববাদী। তার মুখে বরাত। হোলো কি?

: বরাত মানি না আবার! খুব মানি। আগে মানতুম কিনা জিজ্ঞাসা কোরো না—মুশকিলে পড়ব। এখন কিন্তু খুব মানি। বরাত না হলে আমার আজ এই অবস্থা!—আচ্ছা বরাত আর বরাদ্দ কথা দুটো কি একই ওরিজিনের? আমার যেন তাই মনে হয়। এই আমার বাঁধা বরাদ্দ—এতোটুকু সুখ আর এই য়্যাতোখানিটা দুঃখ। একে যেন আর কিছুতেই উল্টে ফেলা চলে না। আর এ জিনিষটাব নামই বরাত! যাক গে, ওখানকার খবর বলো, শুনে নি আগে। দু-বছরে অনেক খবর হয়েছে নিশ্চয—

: কি খবর, কোন খবর, কাব খবর—আজ্ঞা করুন দেবী, নিবেদন করে কৃতার্থ হই।—হেসে জুড়ে দিলাম : আজ তোমায় দেবী বলা যায়, কি বলো! লম্বা চুল, নখে গালে ঠোঁটে কামনার রক্ত—

অদ্ভুত হাসল শীলা : জানো তো মেয়েমানুষ ভীষণ হিংসুটে!

: জানি বৈ কি! তা আর জানি না! খুব জানি। কিন্তু সে তো মেয়েরা! ইঞ্জিনিআররা নয়।

কৃত্রিম শাসনের সুর শীলার কণ্ঠে, গ্রীবায তারই বঙ্কিমা : গ্যাখো আবাব যদি ইঞ্জিনিআর ইঞ্জিনিআর করো তো সত্যি কিন্তু মার লাগাবো।

: আঘাত সে যে পরশ তব সেই তো পুরস্কার। আপত্তি নেই তাতেও। বলো, কার খবর চাই—

চোখের কোণে তাকাতে শীলাও জানে তা হলে : মনোরমা দিয়ে শুরু করো।

: ও কাহিনীর শুরু কোথায়? অন্ত তো তুমিই দেখে এলে! চণ্ডীগড় চলে গেল ওরা।

: কেন, তারপর আর আসে নি? খবরও রাখো না? সত্যি? আমায় বিশ্বাস করতে বলো—

: হ্যাঁ—। অকপটে বিশ্বাস করতে পারো! খবর রাখি নি বটে, এসে পৌঁছেছে কিছু কানে। হয়তো খবর, হয়তো গুজব।

: তাই বলো : শীলার দু-চোখের পাতা কৌতূহলে বিস্ফারিত।

: বিব্রত সঙ্গে গিয়েছিল, মনে আছে তো ?

: হ্যাঁ হ্যাঁ—বলো বলো তাড়াতাড়ি বলো। সিঁদুরের বসুধারা আঁকা হলদে চিঠি করে পেলে ?—সবুর সইছে না শীলার।

: পাই নি। আর পাবো না বলেই মনে হয়। অর্ধেক না হলেও খানিকটা রাজত্ব পেয়েছে বিব্রত, ঐ কম্পানীরই ম্যানেজার হয়ে। জমিদার না হলেও তালুকদার হয়েছে ঠিকই। রাজকন্যে জোটে নি কিন্তু—

: কেন কেন, কেন কেন—আগ্রহ ফেটে পড়তে চাইছে শীলা—

: নরমা তো বিলেত চলে গেছে। এতোকাল জানি নি আমরা। মরলি সাহেবের চিঠি যা পেতাম, বাঁ কোণে টাইপিস্টের ইনিশিয়াল থাকে যার সেই তো ডরোথি। নরমার মা। মরলি সাহেব বিলেতে পি এ-র জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে ডরোথিও অ্যাপ্লাই করে। ডরোথির ইণ্ডিয়ার একসপিরিএন্স আট দশ বছরের। সেইটে স্পেশাল কোআলিফিকেশান হয়ে দাঁড়ায়। চাকরীটা পায় ডরোথি। তারপর মরলি ইণ্ডিয়ায় এলো। সেনো কতো ভালো হতে পারে সিসিকোর চন্দ্রশেখর চৌধুরীকে সেই গল্প করছিল মরলি। করতে করতে ডরোথির আইডেনটিটি বেরিয়ে পড়ল। ভূতপূর্ব স্বামী স্ত্রীকে চিঠি লিখলেন না। মেয়ে মাকে লিখল। তারপর মা মেয়েকে। এমনি হতে হতে একদিন এরোপ্লেনে চাপল নরমা। কে জানে সাত সাগরের জলে অতৃপ্তির জ্বালা জুড়োতে কি না—হেথা নয় হোথা নয় অন্য কোনখানে—

লক্ষ্য করি নি, খুব ম্লান দেখাচ্ছিল শীলাকে। মুখে বলল বটে : কতোদিন হল গেছে ?—কিন্তু উত্তর চায় নি। নিজের চিন্তার গভীরে ডুবে গেল যেন।

চা দিয়ে গিয়েছিল। খালি পেয়ালায় পিরিচ চামচেটা ঠুকে ঠুকে জলতরঙ্গ বাজাতে লাগল।

সেইদিকে তাকিয়েই বলে চলল : পেয়ালাটা খালি কিনা, দ্যাখো ধ্বনির তরঙ্গ কতোদূর পাড়ি দিয়েছে। আর কি জোর। আর এইটেতে দ্যাখো, ভরা কিনা। আওয়াজ নেইই প্রায়।—বলে আমার পেয়ালায় ঘা দিতে লাগল। সে কাপটা ছিল আমার দু নম্বর, একেবারে ভরতি।—সেদিন যদি আজকের মতো রিক্ত নিঃস্ব হতাম, জোর আওয়াজ তুলতাম চামচের ঠোকায়। বলতাম—আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করো গো দান। তখনও ভরা ছিলাম কাণায় কাণায়। ভরা ছিলাম সোনালী তারল্যে। ভবিষ্যতের

স্বপ্ন চিরকালই সোনালী হয়। আমার তোমার সকলেরই। আমার যা বয়স ছিল তখন, তারল্য তখন স্বাভাবিক। তখনও ভবিষ্যৎ ছিল, সেই স্বপ্নে বোঝাই ছিল জীবনের পেয়ালা। চেঁচাতে পারি নি তাই। আজ ছাখো না শূন্য, বাজছি খন খন করে—। কতো কিছু বলে ফেললুম তোমাকে। আচ্ছা এই যদি ওঁর মনে ছিল, মুসৌরী যাবার কথা বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলেন কেন তা হলে। গোরুর জাবনার গামলায় শুয়ে রইল কুকুর।—ছাখো কনটেষ্ট থেকে সরে দাঁড়াতুম না আমি কিছুতেই। মাথা টিপে দিলুম আমি সেই রাত্রেই। পরদিন স্থির করলুম—ঐ নৌকোনে বেড়াতেই যাবো। গেলুম। ঘাটে গিয়ে দেখি একে ডিঙি নৌকো, তাতে নেই মাঝি। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। কিন্তু মরণ পণ, নৌকোয় যেতেই হবে। সেইদিনই। ছিনিয়ে নিতে হবে তোমাকে মনোরমার অপরূপ সৌন্দর্যের আগুন থেকে। আমি কালো কুচ্ছিত। অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়। মনোরমা অদ্বিতীয় সুন্দরী। তার চলার পথ স্বাচ্ছন্দ্যে পিছন তার অভাব নেই, অভাব হবে না কোনদিন। আমি কেন ছেড়ে দিই আমার পাওনা। কিন্তু তোমার দিকে তাকিয়ে দেখি তুমি পড়ে আছ ওখানেই। তোমার শরীরকে কয়েদ করে রাখতুম রাত নটা দশটা অবধি নাচের চার দেয়ালে। কিন্তু তোমার মন? তাকে রুখি কি দিয়ে? সে তো ওবাড়ী থেকে আসে না। আরও বুঝেছি তোমার মন—যেদিন তুমি আমার ঘর থেকে মাথাধরা নিয়ে পালিয়ে এসেছিলে। অতো রাত্রে! আমি যেন বাঘ কি ভালুক। এসেছিলে কেন জানো? মনোরমার ভয়ে। সে জানতে পেলে রক্ষে থাকত না তোমার। তাই—

শীলার এই অপরূপ মর্ম উদ্ঘাটনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম আমি। থেমে থেমে, দম নিয়ে, যতির বিরতি দিয়ে বলে গেল শীলা। সময় লাগছে অনেকক্ষণ। নিঃশ্বাস ফেলছে মাঝে মাঝেই।

এতোক্ষণে আমি বলার মতো কিছু খুঁজে পেলুম: বিশ্বাস করো আমি শীলা মজুমদার নই। মেয়ে হয়ে ছেলের বা ছেলেদের সঙ্গে একসাথে রাত কাটাবার শিক্ষা নেই আমার। সেদিন আমি পালিয়ে এসেছিলুম নিজেকে হারাবার ভয়ে, মনোরমার ভয়ে নয়। বরং সেই রাত্রিটা মনোরমার হীন ব্যবহারে মর্মে মর্মে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল আমার!

শীলা বলল: একটা রাত্রি না হয় নীতির ঝোলাঝুলিটা ঘরের বাইরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে আসতে নীতিবাগীশ!

উপলব্ধি আর অনুভবে দম বন্ধ হয়ে আসছে তখন আমার : বড়ো ভুল হয়ে গেল শীলা। তোমার সঙ্গে দেখা করতে না এলে ভুলটা ভাঙত না আমার কোন দিনই। তুমিই বা বলো নি কেন ? তুমি তো বলতে পারতে ?

টেবিলের দিকে তাকিয়ে ছিল শীলা তখনও : অনেক অনে—ক কারণ। এক, বাবার উপদেশ, বা নির্দেশও বলতে পারো। দুই, তখনও তোমার মন মনোরমা-স্বপ্নে বোঝাই। অপেক্ষা করে ছিলাম, তোমাদের সম্পর্কের শেষ দেখে নিই। তিন, মেয়েদের সেই স্বাভাবিক লজ্জা। তোমার মনোরমা-ময় জগতে নাক গলাতে গিয়ে ঠাস করে চড় খাই যদি। মেয়েরা কি তাই পারে ? তোমার বউ কি রকম হল অনুপম ?

: আমি—আমি—বিয়ে করেছি, তুমি জানলে কি করে ? আমি তো বলি নি।

: এর চেয়ে বেশী খুলে বলা যায় না অনুপম, আমি এতোক্ষণ যা বললাম। বিয়ে যদি না করতে এতোক্ষণে বলে ফেলতে তাহলে। নিশ্চয় সাড়া দিতে আমার ডাকে। তা যখন করলে না—ওদিকে মনোরমা নেই, মনোরমার প্রভাবও নেই। তবে নিশ্চয়ই বিয়েই করেছ, এইটেই ন্যাচারাল কনক্লুশান। এইটুকু বুদ্ধি আমার আছে।—এখানে এনেছ নাকি সঙ্গে করে ? আর তাই বুঝি খেতে চাইছিলে না! পালিয়ে আসো নি তো ? না, বলে এসেছো—এখানে আসছ !

: সে যাই হোক, আমি খাওয়া দাওয়া সেরেই যাবো।

: তুমি খাও এটা খুব আনন্দের সন্দেহ নেই। আমি চেয়েছিলাম—তুমি খেতে গিয়ে রাত খানিকটা হবেই। কোন কারণে না-ও যদি খাও, অন্ততঃ দেরী করে বেরোও এ বাড়ী থেকে। আমার এখান থেকে অধিক রাতে বেরোলে আর কিছু না পাই কলঙ্ক খানিকটা পাবো-ই। আর কিছু তো দিলে না, দেবার মত কিছু, বা মনও তোমার হয়তো নেই। না দিলে ভিক্ষে চাইতে যাবো না। এইটুকুই দিয়ে যাও—একটু কলঙ্ক। ঐ কলঙ্কটুকুই আমার চাই। তাতে সাধারণ হয়ে যাবার তবু একটু সুবিধে হতে পারে অনুপম। লোকে যে বিশ্বাসই করতে চায় না আমি সাধারণ একটা মেয়ে—

॥ **শেষ** ॥